সাইমুম-৩৭

গুলাগ থেকে টুইনটাওয়ার

আবুল আসাদ

ইবুক সম্পর্কে কিছু কথা

সম্মানিত পাঠক,

আসসালামু আলাইকুম

সাইমুম সিরিজকে অনলাইনে টেক্সট আকারে আনার লক্ষ্য নিয়ে ২০১২ সালের ১৭ই আগস্ট গঠন করা হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট (SSUP) গ্রুপ। তারপর বিভিন্ন ব্লগে ও ফেসবুকে প্রোজেক্টের জন্য স্বেচ্ছাসেবক আহ্বান করা হয়। সেই আহ্বানে সাড়া দিয়ে এগিয়ে আসেন একঝাক স্বেচ্ছাসেবক এবং এই স্বেচ্ছাসেবকদের নিয়ে গঠিত হয় সাইমুম সিরিজ-ইউনিকোড প্রোজেক্ট টীম। টীম মেম্বারদের কঠোর পরিশ্রমে প্রায় ৮ মাসে সবগুলো সাইমুম অনলাইনে আসে। মহান আল্লাহ সবাইকে উত্তম প্রতিদান দিন।

ওয়েবসাইটঃ www.saimumseries.blogspot.com

ফেসবুক পেজঃ www.facebook.com/SaimumSeriesPDF

ফেসবুক গ্রুপঃ www.facebook.com/groups/saimumseries

১

কাঁদছে মিসেস জোনস।

অঝোর ধারায় ঝরছে তার চোখ থেকে অশ্রু।

ঠোঁট কামড়ে কান্না চাপার চেষ্টা করছে পলা জোনস।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের বিব্রত চেহারায় বেদনার একটা মলিন আস্তরণ নেমে এল।

'স্যরি, এই মর্মান্তিক ঘটনা রোধ করার কোন উপায় আমাদের ছিল না।' বলল সে নরম ও বেদনা জড়িত কণ্ঠে।

ধীরে ধীরে চোখ খুলে মিসেস জোনস বলল, 'বাছা তোমাদের কোন দোষ নেই। তোমরা আত্মরক্ষার জন্যে যা করার তাই করেছ। তা না করলে হয়তো তোমাদেরই মরতে হতো। এরা যে কতবড় খুনি বর্বর, তা আবারও প্রমাণিত হয়েছে। আমার দু:খ................।'

কথা শেষ করতে পারলো না মিসেস জোনস। কান্নায় ভেঙে পড়ল সে আবার।

সান্তনার কোন ভাষা খুঁজে পেল না আহমদ মুসা। বুক ভাঙা কান্না যাকে বলে সেই কান্না শুনে যাওয়া ছাড়া তাদের কোন উপায় ছিল না।

অস্বস্তিকর একটা অবস্থা।

চরম বিব্রতকর অবস্থা আহমদ মুসাদের।

অসহনীয় নিরবতাটা এবার ভাঙল পলা জোনস। মুখ থেকে রুমাল সরিয়ে নিয়ে চোখ মুছে বলল, 'আপনারা না বললে ভাইয়া খুন হয়েছে বা মরে গেছে সেটাও আমরা জানতে পারতাম না। ওরা আমাদের জানাত না। বেশি পীড়াপীড়ি করলে আমাদেরই ওরা খুন করতো।

আহমদ মুসা মুহূর্তের জন্যে পলা জোনসের দিকে তাকাল। বলল, 'স্যরি, আমি বুঝতে পারছি না, আপনি আজোরস-এর মানে পর্তুগালের গোয়েন্দা বিভাগের কর্মী হয়েও ওদের ভয় করেন কেন? আপনি গোয়েন্দা বিভাগকে বলে তো এদের শায়েস্তা করতে পারেন।

ম্লান হাসর পলা জোনস। হাসিটা কান্নার চেয়েও করুণ। বলল, 'বলে কোন লাভ হতো না। আমি খোঁজ নিয়ে জেনেছি, এরা WFA এর ভাড়া করা লোক। আর আমাদের দেশের গোয়েন্দা প্রধান WFA এর চীফ আজর ওয়াইজম্যানের অন্ধ বন্ধু। আর আমি মাত্র কয়েকদিন আগে কাজে যোগদান করা একজন সামান্য গোয়েন্দা অফিসার।'

'অন্ধ বন্ধু বলছেন কেন?' বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

'আমাদের গোয়েন্দা প্রধান সকল নীতি-নিয়ম ভংক করে আজোরস-এর পানি সীমায় WFA-এর মিনি সাব ও অন্যান্য জলযানের অবাধ বিচরণের অনুমতি পাইয়ে দিয়েছেন এবং দূরের বিচ্ছিন্ন একটা দ্বীপ ওদের নামে লীজ করিয়ে দিয়েছেন।' বলল পলা জোনস।

'নাম কি দ্বীপটার?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'দ্বীপের একটা নাম আছে, আমি শুনেছি। কিন্তু ভুলে গেছি নামটা।' বলল পলা জোনস।

'ম্যাপে নাম পাওয়া যাবে না?' আহমদ মুসা বলল।

'ফরমালি দ্বীপটার আলাদা নামকরণ হয়নি। মানচিত্রে পার্শ্ববর্তী দ্বীপের নামেই তাকে হয়তো ডাকা হয়। তবে লোক মুখে দ্বীপটার আলাদা একটা নাম আছে, তা আমি ভুলে গেছি।' বলল পলা জোনস।

‘সাও তোরাহ কি?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

হাসল পলা জোনস। বলল, ‘এ নামটা কি করে জানলেন? বেন্টো সসাদের কাছে শুনেছেন?’

‘এ নাম আমরা আগে থেকেই জানি। এ দ্বীপেই আমাদের লোকেরা বন্দী আছে বলে মনে হয়।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ নাম আমি বেন্টো-সসাদের কথা থেকে জানি। কিন্তু দ্বীপটা চিনি না। এ নামের কোন দ্বীপ আজোরস দ্বীপপুঞ্জে নেই। হতে পারে এটা কোন দ্বীপের নতুন নাম।’ পলা জোনস বলল।

কথা শেষ করে একটা দম নিয়েই আবার বলে উঠল পলা জোনস, ‘ও দ্বীপে শুধু আপনাদের লোকরাই নেই। অন্য লোকরাও আছে আমাদের এ দ্বীপের রুটেও তো অনেক বন্দী সেখানে যায়।’

‘আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগ এ বিষয়টা জানে না? কিছু করে না কেন?’ চট করে প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘আজোরস দ্বীপপুঞ্জ অনেকটা মুক্ত দেশ। পর্তুগাল কিংবা ইউরোপীয় কোন দেশের ভিসা থাকলে সে আজোরাসে প্রবেশ করতে পারে। তাছাড়া ওরা বন্দীদের নিয়ে আসে কোনও বিশেষ ব্যবস্থায় জলপথে। এ বিস্তীর্ণ জলপথ পাহারা দেবার কোন ব্যবস্থা আজোরস-এর নেই। এরপরও গোয়েন্দা বিভাগ এবং কোন পর্যায়ে পুলিশরাও এ বিষয়টা জানে বলে আমার মনে হয়েছে। আমি একদিন কথায় কথায় আমার উর্ধতন অফিসারকে এ বিষয়ে বললে তিনি মন্তব্য করছিলেন, WFA এর লোকরা এ দ্বীপপুঞ্জের ভিআইপি। এদের নিয়ে মাথা ঘামিও না। একদিন হারতার পুলিশ ইনচার্জের গাড়িতে আমি বেন্টো-সসাদের দেখেছি।’ বলল পলা জোনস।

‘যে দ্বীপ ওদের লীজ দেয়া হয়েছে, সে দ্বীপে তাহলে আজোরস সরকারের কোনই উপস্থিতি নেই?’ প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

‘সেটাই স্বাভাবিক।’ পলা জোনস বলল।

‘আপনি গোয়েন্দা বিভাগের লোক এ কথা কি বেন্টো-সসারা জানে?‘ প্রশ্ন আহমদ মুসা।

‘জানে না। জানলে আমার উপর ওদের আরও অধিকার বর্তাবে বলে আমি ভয় করি।’ বলল পলা জোনস।

‘আজোরস-এর একজন গোয়েন্দা এতটা অসহায়? তার সামান্য আত্মরক্ষার অধিকারও সে আদায় করতে পারবে না ডিপার্টমেন্ট থেকে?’ আহমদ মুসা হাসল। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

ম্লান হাসল পলা জোনস। বলল, ‘মেয়ে হওয়ার অনেক অসুবিধা আছে। আমার দূর্বলতা টের পেলে অফিসের যাদের কাছে আশ্রয় চাইব, তারাও এই সুযোগ ব্যবহার করতে পারে। তাছাড়া ভিআইপিদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করলে চাকুরীর অসুবিধা হওয়ার ভয়তো আমার আছেই।’

আহমদ মুসা একটু হাসল। তার পরেই গম্ভীর হয়ে উঠল তার মুখ। বলল, ‘মুক্ত সোসাইটিতে’ মেয়েরা সমানাধিকার পাওয়ার পরেও মেয়েদের এই অসহায়ত্ব গেল না?’

‘আরও বেড়েছে। আগে মেয়েরা পারিবারিক প্রটেকশনে থাকত। কিন্তু এখন পথে-ঘাটে, অফিসে-রেস্তোরায় পুরুষদের মত নিজেদের প্রটেকশন তাদের নিজেদেরই করতে হয়। কিন্তু সমানাধিকার পেলেও প্রাকৃতিকভাবে অসম নারীরা সে প্রটেকশন দেয়ার ক্ষমতা রাখে না। ফলে পথে-ঘাটে, অফিস-আদালতে অবাধ বিচরণের আজাদী তাদেরকে চারপাশের যথেচ্ছাচারের জিঞ্জীরে বেঁধে ফেলেছে। সমানাধিকারের ব্যাপারটা একটা গাঁজাখুরি, তা এখন আর বুঝার বাকি নেই। সমানাধিকার পেয়েও নারীরা লাঞ্ছিত হবার অভিযোগ অবিরাম তুলছে, কিন্তু একজন পুরুষ কখনও এই অভিযোগ তোলে না। উভয়ের মধ্যেকার প্রাকৃতিক অসমতাই এর কারণ।’ বলল পলা জোনস।

সে থামতেই মিসেস জোনস বলল, ‘তোমরা কথা বল বাছা। আমি একটু ওপর থেকে আসি।’

বলে মিসেস জোনস কাপড় দিয়ে ভালো করে চোখ মুছে উঠে দাঁড়াল।

‘ধন্যবাদ মিস পলা জোনস। আজকের ঘটনাকে আপনার অফিস কিভাবে দেখবে?’ আহমদ মুসা বলল।

'আমি এতে ইনভলভ আছি, এ কথা আমি কিছুতেই প্রকাশ করব না। প্রমাণ হয়েছে বেন্টো, সসা, 'এক বিশ্ব-এক দেশে-এক জাতি' এনজিও এর এমানুয়েলরা সবাই WFA-এর লোক। এই ঘটনার জন্যে গোয়েন্দা বিভাগ উল্টো আমাকে দায়ী করতে পারে। তার চেয়ে বড় কথা হলো, একথা প্রকাশ হলে আমি WFA-এর টার্গেটে পরিণত হবো। ভাইয়াকে ওরা মেরেছে, আমাকেও মারবে।' বলল শুষ্ক কণ্ঠে পলা জোনস, তার চোখে-মুখে ভয়ের চিহ্ন।

'কিন্তু আমার বিশ্বাস, আপনাদের গোয়েন্দা বিভাগ এবং WFA সম্মিলিতভাবেই বের করতে চেষ্টা করবে কারা এ ঘটনার সাথে জড়িত। বেন্টো ও সসারা এ বাড়িতে থাকতো এ খবর তাদের জানা থাকতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'তাহলে..........?' কথা শেষ না করেই থেমে গেল পলা জোনস। তার কণ্ঠে উদ্বেগ ঝরে পড়ল।

'উদ্বিগ্ন হওয়ার কিছু নেই মিস পলা জোনস। ওদের কাজ ওরা শুরু করুক। আমাদেরও কিছু করতেহবে।' আহমদ মুসা বলল।

'WFA আপনাদের লোকদের কেন বন্দী করে রেখেছে, তা কিন্তু বলেননি।' বলল পলা জোনস।

'আপনি কিছু কি আন্দাজ করেন?' মুখে একটু হাসি টেনে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'আপনাদের যারা বন্দী আছে, তারা কি মুসলমান?' প্রশ্ন পলা জোনসের।

'হ্যাঁ মুসলমান।' আহমদ মুসা বলল।

'তাহলে বন্দীটা রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রসূত। কারণ, আমি জানি WFA-এর চীফই শুধু ইহুদী তা নয়, গোটা WFA টাই ইহুদী। গত রাতের ঘটনায় 'এক বিশ্ব এক জাতি' এনজিওর যে ইমানুয়েল মারা গেল সেও ইহুদী। সুতরাং ইহুদীরা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যেই আপনাদের লোকদের আটক করেছে। এটা আরও বেশি পরিষ্কার হবে, যদি জানা যায় ওরা কি করতেন।' বলল পলা জোনস।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আপনি................।'

আহমদ মুসাকে থামিয়ে দিয়ে কথা বলে উঠল পলা জোনস, 'আমাকে 'আপনি' সম্বোধনের কি প্রয়োজন আছে? গত রাতে আমাকে উদ্ধারের কঠিন মুহূর্তে আপনি আমাকে 'তুমি' সম্বোধন করেছিলেন, আমার খুব ভালো লেগেছিল। আমি আপনাদের ছোট বোনের মত হতে পারি না!'

থামল পলা জোনস।

'ধন্যবাদ পলা। তুমি আমাদের ছোট বোনের মত নও, ছোট বোনই তুমি আমাদের।' বলে আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তাই কিনা হাসান তারিক?'

'অবশ্যই ভাইয়া।' বলল হাসান তারিক আনন্দে মুখ উজ্জ্বল করে।

বলেই হাসান তারিক পলা জোনসের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'আজোরস-এর হারতায় এসে আমরা আরেকটা বোন পেয়েছি, এ কথা শুনলে তোমার ভাবীরা খুব খুশি হবে।'

'আমার কি তাহলে এখন দুই ভাবী?' হেসে বলল পলা জোনস।

'অবশ্যই।' হাসান তারিক বলল।

'ও! গুড গড! যেখানে একটিও ছিল না, সেখানে দুই ভাবী পেলাম, ওরা থাকেন কোথায়?' বলল পলা জোনস।

'আমার স্ত্রী থাকেন ফিলিস্তিনে আর ভাইয়ার মোহতারামা থাকেন সৌদি আরবের মদিনা শরীফে।' হাসান তারিক বলল।

'আপনারা আরব? তাহলে তো WFA-এর সাথে লড়াই লাগার কথাই। যাঁরা আজর ওয়াইজম্যানের হাতে আটক আছেন, ওঁরা কোন দেশের?' জিজ্ঞেস করল পলা জোনস।

'ওরা ৭ জন ছয় দেশের। দুজন তুরস্কের, ইরান মিসর লিবিয়া ইন্দোনেশিয়া ও স্পেনের একজন করে।' বলল আহমদ মুসা।

'বোধ হয় একই সাথে ধরেছে, কিন্তু এক সাথে পেল কি করে?' পলা জোনস বলল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়।

‘ওরা ৭ জন ফ্রান্সের ষ্টার্সবার্গে একটা গোয়েন্দা ফার্ম খুলেছিল। সে গোয়েন্দা ফার্মটিকেও ধ্বংস করেছে, তাদেরকেও কিডন্যাপ করেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ওরা কি ইহুদীদের বিরুদ্ধে কিংবা WFA-এর বিরুদ্ধে কোন কেস নিয়ে কাজ করছিল?‘ প্রশ্ন করল পলা জোনস।

‘তোমার এ কথা মনে হলো কি করে?’ আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

‘গোয়েন্দা ফার্মটাও যখন ধ্বংস করেছে, তখন বলতে হবে ফার্মটি খুব বড় ব্যাপার নিয়ে সামনে এগুচ্ছিল।’ বলল পলা জোনস।

‘ধন্যবাদ পলা। ঠিক বলেছ তুমি। গোয়েন্দা ফার্মটি ধ্বংস করার পর সেই কাজ সম্পর্কে তথ্য নেয়ার জন্যেই ওদের কিডন্যাপ করেছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ভাইয়া আপনারা কে?’ প্রশ্ন পলা জোনসের।

‘কেন এ প্রশ্ন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘কারণ বন্দী গোয়েন্দাদের যারা উদ্ধার করতে আসেন, তারা আরও বড় কেউ। আর এর প্রমাণও গত রাতে আমি পেয়েছি। দেখে মনে হয়েছিল, পৃথিবীর বেষ্ট কমান্ডোদের আমি দেখছি। আবার মানুষ হিসাবেও আপনারা অসাধারণ। সুতরাং আপনারা অসাধারণ কেউ হবেন নিশ্চয়।’ পলা জোনস বলল।

আহমদ মুসা হেসে কিছু বলতে যাচ্ছিল, এ সময় বাইরের গেটে নক হলো।

আহমদ মুসা থেমে গেল।

পলা জোনস একবার দরজার দিকে তাকিয়ে বলল। ‘আপনারা বসুন, আমি দেখি কে?’

বলে পলা জোনস তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে দরজার লুকিং হোল দিয়ে বাইরে তাকিয়ে দেখেই দ্রুত ফিরে এসে বলল, ‘একজন গোয়েন্দা কর্মকর্তা এবং আরও একজন লোক।’ পলা জোনসের চোখে-মুখে একটা ভীত ভাব।

‘আমরা ভেতরে যাচ্ছি। ওদের এনে বসাও। আমরা পরে প্রয়োজনে আসব। তোমার কোন ভয় নেই।’ দ্রুত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

বলেই আহমদ মুসা উঠে ছুটল তার ঘরের দিকে। হাসান তারিকও।

পলা জোনস ফিরে গিয়ে গেট খুলে দিল এবং গোয়েন্দা কর্মকর্তাকে স্বাগত জানিয়ে বলল, 'গুড মর্নিং স্যার। আপনি কষ্ট করে আমাদের বাসাায়! আমাকে খবর দিলেই তো হতো।'

গোয়েন্দা কর্মকর্তার নাম ভিক্টর রাইয়া। হারতার গোয়েন্দা প্রধান সে।

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলে উঠল পলা জোনস, 'স্যার, আসুন স্যার, ভেতরে আসুন।'

ভেতরে ঢুকতে ঢুকতে বলল, 'ব্যাপারটা খুব জরুরী তো। তাড়াতাড়ি তোমার এখানে আসতেই হতো। তাই চলে এলাম।

ভেতরে ঢুকে একটু থমকে দাঁড়াল। পেছন ফিরে তার পেছনে আসা সাথের লোকটির দিকে ইংগিত করে গোয়েন্দা প্রধান ভিক্টর রাইয়া বলল, 'ইনি 'এক বিশ্ব' এনজিও'র ভাইস চেয়ারম্যান। নাম কেলভিন কেনেইরো। এই সকালে তিনি হারতা এসে পৌছেছেন। ওঁদের একটা কাজ আমাদেরকে এখানে নিয়ে এসেছে।'

বলে আবার হাঁটতে লাগল ভিক্টর সোফা লক্ষ্য করে।

পলা জোনস ও কেলভিন কেনেইরো সম্ভাষণ বিনিময়ের পর তারাও হাঁটতে লাগল সোফার দিকে।

পলা জোনসের মুখটা মলিন। ওদের দেখেই বুঝতে পেরেছে পলা জোনস যে, এরা গতকালের ঘটনা তদন্ত করার জন্যে এখানে এসেছে। সে যে জড়িত এই বিশাল হত্যাকান্ডের সাথে, এরা কি তা জানতে পেরেছে?'

আশংকা ও অস্বস্তিতে ভরে গেল তার মন।

ওদেরকে বসিয়ে তাদের সামনের এক সোফায় গিয়ে বসল পলা জোনস।

পলা জোনস বসতেই গোয়েন্দা কর্মকর্তা ভিক্টর রাইয়া বলে উঠল, 'বেন্টো ও সসা নামের দুজন লোক এবারও তো তোমার এখানেই উঠেছে?'

ভেতরে ভেতরে আৎকে উঠল পলা জোনস। কিন্তু স্বাভাবিক কণ্ঠে বলল, 'জি স্যার।'

’রাতে তো ওরা বাড়ি আসেনি। খোঁজ নিয়ে কিছু জেনেছ?’ বলল ভিক্টর রাইয়া।

‘হ্যাঁ, ওরা বাড়ি আসেনি। কিন্তু আপনি জানলেন কি করে স্যার?’ পলা জোনস বলল।

‘বলছি। আমার প্রশ্নের দ্বিতীয় অংশের উত্তর দাও।’ বলল ভিক্টর।

এক টুকরো বিব্রত হওয়ার মত হাসি। বলল, খোঁজ নেয়ার প্রয়োজন হয় না। ওরা এ রকম প্রায়ই করেন। এমন কি একবার বাড়ি থেকে কোন কাজে বেরুবার পর চলে গিয়েছিলেন। তিন মাস পর ফিরেছিলেন।’

‘ওরা খুন হয়েছে।’ ঠান্ডা গলায় বলল ভিক্টর।

‘খুন? কখন, কোথায়?’ চোখে মুখে উদ্বেগ ও বেদনার চিহ্ন মেখে বলল পলা জোনস।

‘শুধু তারা নয়, আরও কয়েকজন খুন হয়েছে তাদের সাথে।’ ভিক্টর বলল।

‘কোথায়?’ বলল পলা জোনস।

‘এক বিশ্ব এক দেশ‘ এনজিও‘র মি. এমানুয়েলের বাড়ি চেন?’ ভিক্টর বলল।

‘চিনি না, তবে লোকেশনটা জানি।’ বলল পলা জোনস।

‘ঐ বাড়িতেই তারাসহ এমানুয়েল ও অন্যান্যরা খুন হয়েছে।’ ভিক্টর বলল।

রাজ্যের উদ্বেগ আতংক টেনে আনল পলা জোনস তার চোখে-মুখে। তার মুখ হ্যাঁ হয়ে গেছে। কথা সরছেনা যেন মুখে।

‘মিস পলা জোনস গতকাল ওরা কখন বেরিয়েছিলেন?’ জিজ্ঞাসা কেলভিন কেনেইরার। তার চোখেও সন্ধানী দৃষ্টি।

‘গতকাল সন্ধ্যার পর ওঁরা বেরিয়ে যান।’ বলল পলা জোনস।

‘তাদের সাথে কি আর কেউ ছিল?’ কেলভিন কেনেইরা বলল।

বুকটা কেঁপে উঠল পলা জোনসের। ওরা কি জানতে পেরেছে যে, পলা ওদের সাথে ছিল! পলা স্মরণ করে খুশি হলো যে, সে যখন ওদের সাথে গাড়িতে

উঠেছিল, তখন আশে-পাশে কেউ ছিল না। সন্ধ্যার আলো-ছায়ায় দূর থেকে সব দেখা ও বুঝাও কারও পক্ষে সম্ভব ছিল না। জিজ্ঞাসার উত্তরে পলা জোনস বলল, ‘স্যরি। ওদের যাওয়াটা আমি দেখিনি।’

‘পাড়ার বা শহরের কোন মেয়ে বা মেয়েদের সাথে ওদের উঠাবসা ছিল?’ বলল কেলভিন কেনেইরা।

‘ওদের সাথে কোন মেয়ে কখনও আমাদের বাড়িতে আসেনি, বাইরে কিছু ঘটে থাকলে আমি কিছু বলতে পারবো না।’ পলা জোনস বলল। তার কথা স্বাভাবিক রাখার চেষ্টা করছে। কিন্তু উদ্বেগটাতার চোখে-মুখে ঠিকরে পড়ছে।

কেলভিন কেনেইরা কথা বলল, ‘দেখুন গত রাতে এমানুয়েলের বাড়িতে যে গণহত্যার ঘটনা ঘটেছে, সেখানে একজন মেয়ের উপস্থিতি ছিল। সেখানকার পুরো ঘটনাটা অন্তত সেই মেয়েকে কেন্দ্র করেই সংঘটিত হয়েছে। তার সার্ট ও ব্লাউজের ছেড়া অংশ পাওয়া গেছে। পাওয়া গেছে চেন-ছেঁড়া একটি লেডিজ হাত ঘড়ি। হাত ঘড়ির ছেঁড়া চেনে রক্তের দাগ আছে। এর অর্থ একজন মেয়ে সেখানে নির্যাতিত হয়েছে। অবস্থা বলছে নির্যাতন করেছে এমানুয়েলরা। তারা সকলেই মরেছে। কিন্তু মেয়েটির লাশ কোথাও নেই। তার মানে মেয়েটাকে উদ্ধার কর হয়েছে। যারা উদ্ধার করেছে তারাই হত্যা করেছে এমানুয়েলদেরকে। মেয়েটাকে খুঁজে পেলে হত্যাকারীদেরকেও পাওয়া যাবে। আমাদের বিশ্বাস যাদের মাধ্যমে সেখানে মেয়ে নেয়া হতে পারে, তাদের মধ্যে বেন্টোদের কথাই প্রথম আসে। এজন্যেই প্রথমে এসেছি। বেন্টোদের কথা জানতে।’

ভেতরটা কাঁপছিল পলা জোনসের। কেলভিন কেনেইরার প্রত্যেকটা কথাই সত্য। ওরা কি আরও কিছু জানে? মনের দিক দিয়ে মুষড়ে পড়ল পলা জোনস। কিন্তু পরক্ষণেই আবার ভাবল, পরিস্থিতির মোকাবিলা তাকে করতে হবে। কেলভিন কেনেইরার দিকে মুখ তুলল পলা জোনস। বলল, ‘আর কি জানতে চান? ওরা মাঝে মাঝে এখানে এসে থাকতেন। এর বাইরে কোন প্রকার সম্পর্ক তাদের সাথে আমাদের ছিল না।’

কেলভিনের হঠাৎ নজর পড়ল পলা জোনসের ডান হাতের কব্জির উপর। কব্জির একটু উপরে চামড়া ছিড়ে যাওয়া। তাছাড়া হাতের ছোট্ট ব্যান্ডেজের

পাশেও আঁচড়ের চিহ্ন। ভ্রু কুঁচকে উঠল কেলভিনের। বলে উঠল, ‘আপনার হাতে কি হয়েছে মিস জোনস? এ্যাকসিডেন্ট করেছিলেন বলে মনে হচ্ছে। কবে?’

‘চমকে উঠেছিল পলা জোনস। নিজের ভেতরটাকে আড়াল করার জন্যে পলা জোনস তার মুখ নামিয়ে নিল এবং হাতটাকে নিজের কোলের মধ্যে টেনে নিয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, একটু ছিড়ে গেছে।’

‘আপনি ঘড়ি নিশ্চয় ডান হাতে পরেন?‘ বলল কেলভিন কেনেইরা। তার চোখে-মুখে প্রবল চাঞ্চল্য ঠিকরে পড়ছে।

চকিতে মুখ তুলে একবার চেয়ে বলল, ‘হ্যাঁ, কেন বলছেন এ কথা?’ কণ্ঠের কম্পন পলা জোনস আড়াল করতে পারলো না।

‘মাফ করবেন মিস জোনস।’ বলে কেলভিন কেনেইরা ভিক্টর রাইয়ার সাথে একটুক্ষণ কানে কানে কথা বলল এবং পকেট থেকে একটা লেডিজ ঘড়ি বের করে ভিক্টর রাইয়া‘র হাতে দিল।

ভিক্টর রাইয়া ঘড়ির দিকে একবার তাকিয়েই বলে উঠল, ‘মিস পলা, আমার যতটা মনে পড়ে তোমার ঘড়িটাও এই রকমই। নিয়ে এসতো তোমার ঘড়িটা।’

ভয়ে ফ্যাকাসে হয়ে গেল পলা জোনসের মুখ। কেঁপে উঠল তার বুক। বুঝল সব ওরা জেনে ফেলেছে। তার মুখ থেকে কোন কথা বের হলো না।

ভ্রু কুঞ্চিত হলো গোয়েন্দা কর্মকর্তা ভিক্টর রাইয়ার। একরাশ প্রশ্ন জেগে উঠেছে তার চোখে। সে বলে উঠল, ‘মিস পলা, তাহলে তোমাকেই ধরে নিয়ে গিয়েছিল ওরা?’

দুহাতে মুখ ঢেকে কেঁদে উঠল মিস পলা।

কেলভিন কেনেইরা আবার ভিক্টর রাইয়ার কানে কানে কথা বলল। ভিক্টর কেনেইরা বলল, ‘মিস পলা আমরা দু:খিত, তোমার উপর জুলুম হয়েছে। কিন্তু শেষ পর্যন্ত বেঁচে গেছ। তোমাকে কে বা কারা উদ্ধঅর করল মিস পলা?’

‘আমি জানি না। আমাকে উদ্ধার করে এনে পার্কের সামনে নামিয়ে দিয়েছে।’ কান্না জড়িত কণ্ঠ পলা জোনসের।

‘তারা কয়জন ছিল?’ জিজ্ঞেস করল কেলভিন কেনেইরা।

‘তারা কয়েকজন ছিল। খেয়াল করে দেখিনি কয়জন।’ ভয় ও দ্বিধাজড়িত কণ্ঠে বলল পলা জোনস।

কেলভিন তাকাল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। কেলভিনের চোখে সন্দেহ। পরক্ষণেই সে মুখ ঘুরাল পলা জোন্সের দিকে। বলল, ‘উদ্ধারকারীদের তো আপনি দেখেছেন।’

‘হ্যাঁ।’ বলল পলা জোনস।

‘দেখলে তো নিশ্চয় চিনতে পারবেন।’ কেলভিন বলল।

‘আলো আঁধারীর মধ্যে দেখেছি তো!’ বলল পলা জোনস। আবার দ্বিধাজড়িত কণ্ঠ তার।

কেলভিন কেনেইরা তাকাল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। তার চোখে বিরক্তির ভাব সুস্পষ্ট। বলল, ‘মি. রাইয়া চলুন একে আমাদের অফিসে নিয়ে যাই। ফাইলে আমাদের প্রচুর ফটো আছে। ক্রিমিনাল থেকে অস্ত্রবাজ কেউ বাদ নেই। ফাইল দেখে পলা জোনস আমাদের মূল্যবান সহযোগিতা করতে পারবেন।’

‘সেটাই ভাল। তাই চলুন।’ বলল ভিক্টর রাইয়া।

মুখ শুকিয়ে এতটুকুন হয়ে গেল পলা জোনসের। ভয় ও উদ্বেগে আচ্ছন্ন হয়ে গেল তার চোখ-মুখ। মুখ থেকে কোন কথা সরল না তার।

ভিক্টর রাইয়াই কথা বলে উঠল আবার, ‘তৈরী হয়ে নিন মিস পলা।’

ভিক্টর রাইয়ার কথা শেষ হবার আগেই ড্রইং রুমে প্রবেশ করল মিসেস জোনস।

‘পলা, কোথাও যাচ্ছিস নাকি?’ বলে মিসেস জোনস ভিক্টর রাইয়া ও কেলভিন কেনেইরার দিকে বিস্ময়ের চোখে তাকাল।

পলা জোনস কম্পিত গলায় ভিক্টর রাইয়াকে দেখিয়ে বলল, ‘ইনি হারতার গোয়েন্দা বিভাগের ডিজি।’ আর কেলভিন কেনেইরাকে দেখিয়ে বলল, ‘ইনি গত রাতে যিনি মারা গেছেন সেই এমানুয়েলের দলের একজন বড় কর্মকর্তা। এঁরা গতরাতের ঘটনার তদন্তে এসেছেন।’

‘ওয়েলকাম আপনাদেরকে। কিন্তু পলা কোথাও যাবে যেন বলছিলেন।’ বলল মিসেস জোনস ভিক্টর রাইয়াকে লক্ষ্য করে।

'মি. কেলভিনের অফিসে। মিস পলাকে উদ্ধার করতে গিয়ে কারা হত্যাকান্ড ঘটায়, নানা কারণে এটা আমাদের জানা দরকার। তাদেরকে চিহ্নিত করার ব্যাপারে আমরা মিস পলার সাহায্য চাই। কিছু জানতে চাই তাঁর কাছ থেকে।' ভিক্টর রাইয়া বলল।

শুনে উদ্বেগ ফুটে উঠল মিসেস জোনসের চোখে-মুখে। একটু ভেবে বলল, 'পলার যাওয়ার দরকার কেন? এখানেই তাকে জিজ্ঞাসাবাদ করুন। আমার মনে হয় সে তেমন কিছু বলতে পারবে না। সে তো মহাআতংকগ্রস্ত হয়ে নিজেকে নিয়েই ব্যস্ত ছিল। কোন দিকে নজর দেয়ার তার সুযোগ ছিল কোথায়?'

'তবু একমাত্র উনিই সেই লোকদেরকে দেখেছেন। ওদের খুঁজে পাওয়ার ব্যাপারে একমাত্র উনিই সাহায্য করতে পারেন।' বলল কেলভিন কেনেইরা দৃঢ় কণ্ঠে।

'কিন্তু কালকের ঘটনার পর তাকে আমি এভাবে ছাড়তে পারি না। গতকালের বুকের কাঁপুনি আমার আজও শেষ হয়নি।' মিসেস জোনস বলল।

'কিন্তু ম্যাডাম জোনস, তাকে তো যেতেই হবে। গতকালকের ঘটনা ছোট কিছু নয়। বলতে গেলে গণহত্যা সংঘটিত হয়েছে। যারা এটা ঘটিয়েছে তারা মিস পলাকে উদ্ধার করেছে বটে, কিন্তু উদ্ধার করতেই শুধু তারা গিয়েছিল বলে আমাদের মনে হয় না। মিস পলার উদ্ধার একটা আনুসঙ্গিক ঘটনা, আসল লক্ষ্য তাদের কি তা আমাদের জানা দরকার। সুতরাং মিস পলাকে আমাদের সাথে যেতেই হবে।' বলল কেলভিন কেনেইরা। তার কণ্ঠ কঠোর শুনাল।

'মিসেস জোনস, মি. কেলভিন যা................।' বলতে শুরু করেছিল ভিক্টর রাইয়া।

এ সময় আকস্মিক বাজ পড়ার মত প্রচন্ড শব্দে ড্রইংরুমের বাইরের দরজা খুলে গেল।

দরজা দিয়ে ঝড়ের বেগে প্রবেশ করল দুইজন মুখোশধারী। দুজনেরই শরীর ঢাকা বিশেষ এক ইউনিফরমে। দুজনের হাতেই উদ্যত রিভলবার।

'কে আপনারা?' বলে চিৎকার করে উঠে দাঁড়াচ্ছিল মিসেস জোনস। মুখোশধারীদের একজন অস্বাভাবিক ভারী কণ্ঠে পর্তুগীজ ভাষায় চিৎকার করে

উঠল, 'যে যেভাবে আছেন, সেভাবে থাকুন। এক ইঞ্চি নড়লেই মাথার খুলি উড়ে............।'

মুখোশধারীর কথা শেষ হওয়ার আগেই চোখের পলকে কেলভিন কেনেইরা পকেট থেকে রিভলবার বের করে মুখোশধারীদের লক্ষ্যে তুলছিল। কিন্তু তার আগেই মুখোশধারীর কথা থেমে গেল এবং সংগে সংগেই তার রিভলবার অগ্নিবৃষ্টি করল। গুলী গিয়ে কেলভিনের হাতের কব্জীতে লাগতেই রিভলবার পড়ে গেল তার হাত থেকে।

গুলী করেই মুখোশধারীটি পাশের সাথীর উদ্দেশ্যে বলল, 'কেলভিনকে ঘুম পাড়িয়ে গাড়িতে তুলে নাও।'

সংগে সংগেই দ্বিতীয় মুখোশধারীটি দ্রুত এগোল কেলভিনের দিকে এবং পকেট থেকে ক্ষুদ্র স্প্রেয়ার বের করে কেলভিনের নাকে স্প্রে করল। মুহূর্তেই তার দেহ সোফায় ঢলে পড়ল।

দ্বিতীয় মুখোশধারীটি কেলভিনের সংজ্ঞাহীন দেহ পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে পেছন ফিরে দরজার দিকে হাঁটতে লাগল। তার আগেই প্রথম মুখোশধারী দ্বিতীয় মুখোশধারীর হাত থেকে স্প্রেয়ার নিয়ে নিয়েছে।

কেলভিনকে নিয়ে দ্বিতীয় মুখোশধারী বেরিয়ে গেলে প্রথম মুখোশধারী বাম হাতে স্প্রেটা রেখে ডান হাতে রিভলবার তাক করল ভিক্টর রাইয়া, মিসেস জোনস ও পলা জোনসের দিকে।

বিমূঢ় ভিক্টর রাইয়া অনেকটা মরিয়া হয়েই বলল, 'আপনারা কে? এসব কিন্তু ভাল হচ্ছে না। আমরা সরকারী লোক।'

প্রথম মুখোশধারীর অস্বাভাবিক ভারী কণ্ঠটা সিংহের মত গর্জন করে উঠল, 'হ্যাঁ, আপনি ও পলা জোনস সরকারী লোক। কিন্তু নির্লজ্জের মত বিদেশী ষড়যন্ত্রকারী কেলভিনদের ভাড়া খাটছেন। তাদের হাতে আজোরস দ্বীপপুঞ্জকে ইজারা দিয়ে বসে আছেন। আজোরসবাসী আপনাদেরও বিচার করবে।' বলে মুখোশধারীটি তার হাতের স্প্রেটার বোতাম টিপে ভিক্টর রাইয়া, পলা জোনস ও মিসেস জোনসের উপর ঘুরিয়ে নিল।'

মুহূর্তের মধ্যে তারা সংজ্ঞাহীন হয়ে ঢলে পড়ল সোফার উপরে।

প্রথম মুখোশধারী গিয়ে গাড়িতে উঠতেই গাড়িটা ছেড়ে দিল।

দ্বিতীয় মুখোশধারী আগেই গিয়ে ড্রাইভিং সিটে বসেছিল। আর প্রথম মুখোশধারী পেছনের সিটে গিয়ে বসেছে। তার সামনে গাড়ির মেঝের উপর কেলভিনের সংজ্ঞাহীন দেহ।

গাড়িটা ছুটছে।

প্রথম মুখোশধারী দ্বিতীয় মুখোশধারীকে লক্ষ্য করে বলল, 'হাসান তারিক, গাড়ির নাম্বার প্লেট বদলেছ তো?'

'জি ভাইয়া।' বলল হাসান তারিক।

ওদিকে প্রথম ঘুম ভাঙল ভিক্টর রাইয়ার। সে লাফ দিয়ে উঠে বসেই ছুটল বাইরে। দেখল তার গাড়ি নেই। দ্রুত পকেট থেকে বের করল তার মোবাইল। প্রথমেই টেলিফোন করল হেড কোয়ার্টারে। তার গাড়ির নাম্বার জানিয়ে দিয়ে বলল, 'যেখানে পাও গাড়িটাকে আটকাও এবং গাড়ির সবাইকে গ্রেফতার করো। আহত কেলভিনকে তাড়াতাড়ি ক্লিনিকে নেবে।' এরপর ভিক্টর রাইয়া দ্বিতীয় টেলিফোনটি করল আজর ওয়াইজম্যানকে। তাকে জানাল সব কথা।

টেলিফোনের ওপ্রান্ত থেকে উত্তেজিত আজর ওয়াইজম্যান বলল, 'ওরা কি গনজালোদের লোক, না ভেতরের অন্যকোন জাতীয়তাবাদী গ্রুপ? কোন সন্দেহ নেই, এরাই গতরাতে এমানুয়েলের বাড়িতে গণহত্যা সংঘটিত করেছে। যাই হোক যে কোনভাবে ওদের পাকড়াও করা চাই। আমি দ্বিতীয় কলের অপেক্ষা করছি।'

ভিক্টর রাইয়া মোবাইল বন্ধ করে পলা জোনসদের ড্রইংরুমে প্রবেশ করল। তখনও পলা জোনস ও মিসেস জোনসের জ্ঞান ফেরেনি।

ভিক্টর রাইয়া ঠান্ডা পানি এনে ওদের চোখে-মুখে ছিটিয়ে ওদের জ্ঞান ফিরিয়ে আনল।

মিসেস জোনস উঠে বসেই পলা জোনসকে জড়িয়ে ধরে বলল, 'এসব কি সর্বনেশে কান্ড ঘটছে।' বলেই মিসেস জোনস ভিক্টর রাইয়ার দিকে ফিরে বলল, 'দোহাই আমার মেয়ের কোন দোষ নেই। তাকে ওরা ধরে নিয়ে গিয়েছিল। প্রাণে বেঁচে এসেছে। তাকে আর কোথাও নেবেন না দয়া করে।'

'না, মিসেস জোনস মিস পলাকে এখন কোথাও নিচ্ছি না। মি. কেলভিন ফিরে এলে দেখা যাবে কি করা যায়। আমার মনে হচ্ছে, মিস পলা ওদের নিশ্চয় চেনে না এবং তাদের সাথে কোনও সম্পর্কও নেই। এখন যারা হামলা করেছিল, তারাই সম্ভবত গতরাতে এমানুয়েলের বাড়িতে ঘটনা ঘটিয়েছিল। এরা আমাদের সবার জন্যেই বিপজ্জনক।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

বিস্ময় ফুটে উঠল মিসেস জোনসের চোখে-মুখে। কিছু বলতে যাচ্ছিল। কিন্তু তার আগেই ভিক্টর রাইয়া উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'আমি চলি। মিস পলা, ম্যাডাম জোনস আপনারা একটু সাবধানে থাকবেন।'

বলে বাইরে বেরুবার জন্যে দরজার দিকে এগুলো ভিক্টর রাইয়া।

সংজ্ঞা ফেরার পর একটি কথাও বলেনি পলা জোনস। আগেই সেই উদ্বেগ, আতংক চোখে-মুখে নেই, বরং চোখে-মুখে স্বস্তি ও আনন্দ।

মিসেস জোনস উঠে দাঁড়াল। বলল, 'যাই বাছাদের ডাকি, ঝামেলা তো গেছে। ওদের দেখতে পেলে ঝামেলা আরও বাড়ত। বুদ্ধিমানের কাজ করেছে না বেরিয়ে।'

মিসেস জোনস হাঁটা শুরু করেছিল আহমদ মুসাদের ঘরের দিকে। পলা জোনস হাসল। বলল, 'আম্মা ওরা ঘরে নেই। আমরা সংজ্ঞাহীন থাকার সময় ওরা কোথাও গেছে।'

'কিন্তু তুমি দেখলে কি করে? আর তারা আমাদের ওভাবে ফেলে যেতে পারে না।' বলে মিসেস জোনস আবার হাঁটা শুরু করল।

'ওরা নেই আম্মা।' হেসে আবার বলল পলা জোনস।

কিন্তু মিসেস জোনস পলার কথা এবার গ্রাহ্য না করে গেল আহমদ মুসাদের ঘরে। পরক্ষণেই আবার ফিরে এল। তার চোখে-মুখে বিস্ময়। বলল, 'বাছারা এভাবে তো বাইরে যেতে পারে না। কিন্তু ঘটনা কি? কোথায় ওরা?'

'ভেব না আম্মা। ওরা ফিরে আসবেন।' বলল পলা এবার গম্ভীর কণ্ঠে।

'তুমি তাহলে জান, বলছ না কেন?' বলল মিসেস জোনস অধৈর্য্যরে সাথে।

‘দুজন মুখোশধারী ওরাই আম্মা। মহাবিপদ থেকে ওঁরা আবার আমাকে বাঁচিয়েছেন।’ বলল পলা জোনস। তার কণ্ঠ ভারী।

বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে গেছে মিসেস জোনসের চোখ। তার স্বগত কণ্ঠে উচ্চারিত হলো, ‘ওরা বাছারা ছিল?কিন্তু এভাবে একাজ ওরা করল কেন? তাদের বিপদ তো আরও বাড়ল?’

বলে ধপ করে সোফায় বসে পড়ল মিসেস জোনস। তার চোখে রাজ্যের বিস্ময় আর দুর্ভাবনা।

ধীরে ধীরে চোখ খুলল কেলভিন কেনেইরা। তাকাল সে সোনালী দাড়ি চুলওয়ালা পর্যটকবেশী আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের দিকে। তারপর চারদিকে তাকাল সে। তার চোখের ভয় ও উৎকণ্ঠাটা আরও গভীর হলো। বলল, ‘তোমরা আমাকে কোথায় এনেছ। কে তোমরা? কি চাও?’

কেলভিন ঘাসের উপর শোয়া অবস্থায় ছিল। আহমদ মুসা কোন কথা না বলে তাকে তুলে বসাল। উঠতে গিয়ে গুলীবিদ্ধ ডান হাতে একটু চাপ লাগায় কঁকিয়ে উঠল সে। তাকাল কেলভিন তার গুলীবিদ্ধ ডান হাতের দিকে।

‘চিন্তা নেই মি. কেলভিন। গুলী ভেতরে নেই। ভালো করে ব্যান্ডেজ করে দিয়েছি। আপনি বেঁচে থাকলে ঘা শুকাতে বেশি সময় নেবে না।’ বলল আহমদ মুসা।

আবার চারদিকে তাকাল কেলভিন।

জায়গাটা তিন দিক থেকে পাহাড় ঘেরা। সামনে শুধু সাগরের দিকটাই উন্মুখ। জায়গাটা একটা বিশাল সমতল উপত্যকা। পাথুরে ভুমির উপর ঘাসের আস্তরণ। দেখলে মনে হবে বিশাল এক ঘোড় দৌড়ের মাঠ। সবচেয়ে লক্ষণীয় দিক হলো, মাঠটার উত্তর প্রান্ত হঠাৎ খাড়াভাবে নিচে নেমে গেছে ২০ গজের মত। তারপর তা নেমে গেছে সাগরে। এর ফলে পাহাড়ের প্রাচীর ঘেরা মাঠটা যেন এক বিরাট মঞ্চে পরিণত হয়েছে। মঞ্চের পরের নিচের অঞ্চলটা গাছপালায় ঠাসা যেন

এক সবুজ কার্পেট। মাঠে দাঁড়িয়ে এই সবুজের উপর দিয়ে দেখা যায় প্রশান্ত এক নীল সাগর। সত্যিই অপরূপ এখানকার দৃশ্য।

কেলভিনকে আবার চারদিকে তাকাতে দেখে আহমদ মুসা বলল, 'কি দেখছেন মি. কেলভিন? চেনার চেষ্টা করছেন জায়গাটা, হারতা থেকে খুব বেশি দূরে নয় জায়গাটা। মাত্র...........।'

আহমদ মুসাকে বাধা দিয়ে বলে উঠল কেলভিন, 'আমাকে আর জায়গা চিনিও না। এটা পিকনিক স্পট 'সান্তাসিমা'। এটা আমাদেরই জায়গা। 'এক বিশ্ব এক দেশ এক জাতি' এনজিও এই 'সান্তাসিমা' লীজ নিয়েছে ৫০ বছরের জন্যে।'

থামল কেলভিন।

বিস্ময় ফুটে উঠল আহমদ মুসার চোখে-মুখে। 'এক বিশ্ব এক দেশ এক জাতি' এনজিও মানে তো WFA (ওয়ার্ল্ড ফ্রিডোম আর্মি)। আজর ওয়াইজম্যানের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডোম আর্মি এটা লীজহ নিয়েছে! কেন? এই প্রশ্নটাই আহমদ মুসা করল কেলভিনকে। বলল, 'এই জায়গাটা আপনারা লীজ নিয়েছেন কেন?'

'এর সাথে তোমাদের কোন সম্পর্ক নেই। এখন বল তোমরা কে? কেন আমাকে ধরে এনেছ? তোমরাই কি গতরাতে পলা জোনসকে উদ্ধার করতে গিয়ে খুন করেছ অতগুলো লোককে? কিন্তু মনে রেখ.........।'

'থাক থাক, আপনার প্রশ্নের জবাব দেবার জন্যে আপনাকে নিয়ে আসিনি। আমাদের প্রশ্নের জবাব দেবেন আপনি।' বলল আহমদ মুসা।

'তোমরা কে জানি না। তবে তোমরা আমাদের চেন না বলেই মনে হচ্ছে। তুমি যে স্বরে কথা বলছ, সেই স্বরে ইউরোপের কোন সরকারও আমাদের সাথে কথা বলতে পারে না। যাক। আমি একটা সিগারেট খেতে পারি?' কেলভিন বলল।

'না, এখন নয়। জিজ্ঞাসাবাদের পর খাবেন।' বলল আহমদ মুসা।

'জিজ্ঞাসাবাদ! কি জিজ্ঞাসাবাদ?' কেলভিন বলল।

'আজোরস দ্বীপপুঞ্জ দখলের আপনাদের ষড়যন্ত্রে সাহায্য করছে কে বা কারা?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আমরা আজোরস দখল করেছি! না, একথা ঠিক নয়।' বলল কেলভিন।

‘আপনারা ইতিমধ্যেই একটা দ্বীপ দখল করে নিয়েছেন। প্রত্যেক দ্বীপেই আপনারা ঘাঁটি গড়েছেন এবং আপনাদের লোক সংখ্যা বাড়াচ্ছেন। এই যে ৫০ বছরের জন্যে লীজ নিয়েছেন। এটাই ঔপনিবেশিকদের দেশ দখল করার প্রধান কৌশল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কোন দ্বীপ আমরা দখল করেছি? সাও তোরাহ? ওটা তো আমরা লীজ নিয়েছি। এ ধরনের লীজ দেয়া-নেয়া হচ্ছে বিভিন্ন দেশ ও দ্বীপপুঞ্জে। কেউ একে দেশ দখল বলে না।’ বলল কেলভিন।

‘অন্যরা যাই করুক, আপনারা দেশ দখল করছেন? আপনারা সরকারের চোখকে ফাঁকি দিয়ে গোপন কম্যুনিকেশন ব্যবস্থা গড়ে তুলেছেন। এমনকি তার মধ্যে ‘মিনি সাবমেরিন’ ব্যবস্থাও চালু করেছেন।’

বিস্ময়ে চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল কেলভিনের। তীক্ষè দৃষ্টিতে তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। বলল, ‘কে তোমরা? বিদ্রোহী গনজালো গ্রুপের লোক? যদি তাই হয়ে থাক শোন, আজোরস দ্বীপপুঞ্জ স্বাধীনতার পক্ষ-বিপক্ষ কারো সাথেই আমাদের কোন সম্পর্ক নেই।’

থামলো কেলভিন।

‘কারণ আপনরা তৃতীয়পক্ষ। আপনারাই দ্বীপপুঞ্জকে গ্রাস করতে চান। আপনারা ‘সাও তোরাহ’ দ্বীপে কাউকে যেতে দেন না। কারণ ওখানে সামরিক ঘাঁটি গড়েছেন।’ বলল আহমদ মুসা।

‘এ অভিযোগ সত্য নয়। এমন অভিযোগ সরকারের কাছেও সম্ভবত গেছে। পরশু সরকারী একটা সার্ভে বিমান দ্বীপটার উপর দিয়ে ফ্লাই করেছে। আমরা শুনেছি পাহাড়, ঘাস ও জংগলের উপত্যকা ছাড়া আর কিছুই দেখেনি। ঘাঁটি বলছ, ওখানে একটা বাড়িরও সন্ধান পাবে না। আসল কথা হলো, আমরা দ্বীপটাকে পৃথিবীর সকল বৃক্ষ-প্রজাতির অভয়ারণ্য বানাচ্ছি।’

‘একটা বাড়িও যদি না থাকে, তাহলে যারা অভয়ারণ্য বানাচ্ছে তারা থাকে কোথায়?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

থতমত খেয়ে গেল কেলভিন কেনেইরা। কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। নিজেকে সামলে নিয়ে সে দ্রুত বলল, 'কেন প্ল্যান্টেশন কর্মীদের জন্যে অস্থায়ী তাঁবুই কি যথেষ্ট নয়?'

আহমদ মুসা হাসল। ভাবছিল সে। সংগে সংগে কোন কথা বলল না। কিন্তু কথা বলে উঠল হাসান তারিক। বলল, 'কিন্তু এই যে বললেন সরকারী বিমান সেখানে পাহাড়, ঘাস ও জংগলের উপত্যকা ছাড়া কিছুই দেখেনি!'

'বিমান থেকে জংগলের মধ্যে ছোট ছোট তাঁবু দেখবে কি করে?' বলল কেলভিন।

'আজোরসের বিরুদ্ধে তোমার বদমতলব না থাকলে মিনি সাব দিয়ে তোমরা কি কর?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

'মিনি সাব' এর কথা শুনে কেলভিন চমকে উঠে তাকাল আহমদ মুসার দিকে। চোর ধরা পড়ার মত মুখের চেহারা হলো তার। বলল, 'মিনি সাব? মিনি সাব আমরা কি করব?'

আহমদ মুসার মুখ কঠোর হয়ে উঠল। হাতের রিভলবারটা কেলভিনের দিকে তাক করে বলল, 'সত্য কথা বলতে যদি আর একটুও দেরী হয়, তাহলে এখনি তোমার ডান কানটা উড়ে যাবে।'

ভয়ের চিহ্ন ফুটে উঠল কেলভিনের চোখে-মুখে। মরিয়া হয়ে বলার চেষ্টা করল, 'না আমি ....।'

সংগে সংগেই আহমদ মুসার রিভলবারের নল সরে এসে স্থির হলো কেলভিনের ডান কান লক্ষ্যে। তার তর্জ্জনি চেপে বসতে যাচ্ছিল রিভলবারের ট্রিগারে।

ভয়ে বিস্ফোরিত হয়ে হয়ে উঠল কেলভিনের চোখ। কঁকিয়ে উঠল, 'বলছি আমি।'

বলে একটু থেমেই শুরু করল, 'নাম 'মিনি সাব' হলেও এটা সামরিক যান নয়। নিছক পরিবহন যান আমাদের মিনি সাব।'

'মিথ্যা কথা। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, বৃটেন, ফ্রান্স, রাশিয়ার মত দেশও পরিবহন যান হিসাবে সাবমেরিন বা মিনি সাবকে ব্যবহার করে না। আপনাদের

মত একটা এনজিও'র জন্যে এর কোনই প্রয়োজন হতে পারে না।' বলল আহমদ মুসা।

দ্বিধায় পড়ল কেলভিন। মনে হয় জবাব খুঁজছিল। অবশেষে বলল, 'এই পরিবহন সবচেয়ে নিরাপদ ও নিরিবিলি বলে আমরা ব্যবহার করছি।'

'আজোরস দ্বীপপুঞ্জের নৌপথকে কোন দিক দিয়েই কি অনিরাপদ ও অনিরিবিলি মনে হয়?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

আবার দ্বিধায় পড়ে গেল কেলভিন। উত্তর ঠিক করে নিয়ে বলল, 'নিরাপদ না হবার ও নিরিবিলি না হবার অবস্থা নেই।'

'তাহলে মিনি সাব পরিবহনের বিলাসিতা কেন? আসল কথা হলো, মিনি সাব সামরিক-যান। এই মিনি সাব ও সাও তোরাহ দ্বীপকে আজোরসের বিরুদ্ধে কোন সামরিক ষড়যন্ত্রের অংশ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে এবং নিশ্চয় এই ষড়যন্ত্রের পিছনে বাইরের কোন শক্তি কাজ করছে।'

বলে আহমদ মুসা একটু থেমেই আবার তীব্র কণ্ঠে বলে উঠল, 'বলুন আপনারা কার এজেন্ট হিসেবে কাজ করছেন?'

কথা শেষ হবার আগেই আহমদ মুসার রিভলবার কেলভিনের বুক বরাবরে এসে স্থির হলো।

ফ্যাকাশে হয়ে উঠল কেলভিনের মুখ। কম্পিত কণ্ঠে কেলভিন বলল, 'না না আমরা আজোরসের বিরুদ্ধে কোন ষড়যন্ত্র করছি না। এমন বিষয় আমাদের কল্পনাতেও নেই।'

'তাহলে কি করছেন আপনারা আজোরস?' কণ্ঠের স্বর কঠোর হয়ে উঠেছে আহমদ মুসার।

কেলভিন কোন উত্তর দিল না। তার চোখ-মুখ ভয় ও উদ্বেগে আরও চুপসে গেল।

আহমদ মুসা ভাবল, আসল কথা কেলভিন বলবে না, মরলেও না। সুতরাং এ পথে না গিয়ে বরং প্রয়োজনীয় তথ্য যা পাওয়া যায় এর কাছ থেকে উদ্ধার করা উচিত। বলল আহমদ মুসা, 'তোমাদের মিনি সাব দ্বীপপুঞ্জের কোথায় কোথায় ল্যান্ড করে? নিজস্ব জেটিতে, না কোন প্রাইভেট জেটিতে?'

'কোন জেটিতেই ল্যান্ড করে না। কোন দ্বীপে এলে মিনি সাব উপরে ভেসে ওঠে এবং এরপর বোটের মাধ্যমে তীরে যাতায়াত চলে।' বলল কেলভিন।

'মিনি সাব দ্বীপপুঞ্জের নৌপথের সব রুটেই চলে, না এর নিজস্ব রুট আছে?' আহমদ মুসা বলল।

'নিজস্ব রুট আছে।'

'এই রুটে কোন কোন দ্বীপ পড়ে?'

'রাজধানী পঁতা দেলগা বন্দর ও হারতা পড়ে। একটা মিনি সাব পঁতা দেলগা থেকে হারতা আসে এবং আবার পঁতা দেলগাতে ফিরে যায়। আরেকটা মিনি সাব সাও তোরাহ ও হারতা পর্যন্ত যাতায়াত করে।'

'সাও তোরার তো নিজস্ব জেটি আছে।' আহমদ মুসা বলল।

'না সাও তোরার কোন জেটি নেই কোন বন্দরও নেই।' কেলভিন বলল।

'তাহলে সাও তোরার বোট, জাহাজ ইত্যাদি কোথায় থাকে? মিনি সাবই বা কোথায় ভেড়ে?' জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা। তার ভ্রু কুঞ্চিত।

আহমদ মুসার কঠোর মুখভাবের দিকে একবার তাকিয়ে কেলভিন আমতা আমতা করে বলল, 'সাও তোরাহ'র সাথে শুধু মিনি সাবের মাধ্যমেই যোগাযোগ হয়। বোট বা লঞ্চে সাও তোরাহ গেলেও উপকূলে গিয়ে মিনি সাবেই উঠতে হয়।

'কেন?' আহমদ মুসার চোখে-মুখে অপার বিস্ময়।

নতুন ভয় ও উদ্বেগসহ একটা অসহায়ভাব ফুটে উঠল কেলভিনের চোখে-মুখে। বলল, 'একটা সিগারেট খেতে পারি।'

'খান।' আহমদ মুসা অনুমতি দিল।

কেলভিন কেনেইরা পকেট থেকে সিগারেটের প্যাকেট নয় সিগারেট বের করল।

সে সিগারেট বের করার সময় হঠাৎ আহমদ মুসার চোখে পড়ল সিগারেটের গোড়ার দিকে সিগারেটের গায়ে ফিল্টার রং ঠিকই আছে, কিন্তু ফিল্টার নেই, ফাঁকা। তার উপর সিগারেটটা মনে হলো স্বাভাবিকের চেয়ে একটু লম্বা।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো আহমদ মুসার। আহমদ মুসার রিভলবার কেলভিনের দিকে তাক করাই ছিল। তর্জ্জনিটাও তার চলে এল আবার ট্রিগারে। ভাবনাও তার সম্পূর্ণ হয়েছে। বলল আহমদ মুসা, 'আপনার সিগারেটটাতো খুবই সুন্দর। দেখি কি ব্রান্ডের ওটা।'

কিন্তু ততক্ষণে কেলভিন সিগারেরটা তার ঠোঁটে তুলে নিয়েছে দ্রুত।

'হাসান তারিক শুয়ে পড়' বলেই আহমদ মুসার তর্জনি রিভলবারের ট্রিগারে চেপে ধরে নিজেকে মাটির উপর ছুড়ে দিয়েছে।

পরপর দুটি গুলী ছুড়েছে আহমদ মুসা। একটি গুলী বিদ্ধ করেছে কেলভিনের বুক, অন্য গুলীটি বিদ্ধ করেছে তার বাম পাঁজরকে।

বসে থাকা কেলভিনের দেহটা পেছন দিকে ছিটকে পড়ে গেছে। সিগারেটটা তার মুখ থেকে খসে পড়েছে মাটিতে ঘাসের উপর।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই উঠে বসেছে।

'কি ঘটেছে ভাইয়া ওকে যে গুলী করলেন? সিগারেটটাকে আপনি সন্দেহ করেছেন?' বলল হাসান তারিক।

'হ্যাঁ হাসান তারিক। আমার চোখ যদি ঠিক দেখে থাকে, তাহলে ওটা একটা ভয়ংকর বন্দুক।'

বলে আহমদ মুসা উঠে গিয়ে সিগারেটটা হাতে তুলে নিল। সিগারেট টিউবের দুপ্রান্তে চোখ বুলিয়ে বলল, 'সন্দেহটা ঠিক হাসান তারিক। রীতিমত এটা একটা মেশিনগান। এর ফিল্টার টপের উপর ঠোঁটের চাপ পড়লেই টিগ্রার সক্রিয় হয়ে উঠে এবং সুচের অগ্রভাগের মত সূক্ষè ও তীক্ষè এক ঝাঁক বুলেট বেরিয়ে গিয়ে চারদিক ছড়িয়ে পড়ে আঘাত করে। সামনে দশ বারজন লোক থাকলেও তাদের সকলকে কভার করার জন্যে একবার ট্রিগারে চাপ দেয়াই যথেষ্ট।'

'নিশ্চয় কোন ভয়ংকর বিষ মেশানো আছে ঐ বুলেটগুলোতে। না হলে সুচাগ্র বুলেট কতটুকু আর ক্ষতি করবে?' বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ হাসান তারিক। চলত পরীক্ষা করি।'

বলে আহমদ মুসা একটু পিছিয়ে গিয়ে এক ধরনের গাছের বড় পুরু পাতায় একটা ফায়ার করল। কয়েকটা সুচাগ্র বুলেট গিয়ে বিদ্ধ করল পাতাটিকে।

মিনিটখানেক অপেক্ষা করতে হলো। এর মধ্যেই বড় পাতাটি নেতিয়ে গিয়ে তার কান্ডের উপর ঝুলে পড়ল।

বিস্ময় আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনের চোখে-মুখেই। হাসান তারিক বলল, 'আহমদ মুসা ভাই এটা ভয়ংকর ধরনের এক পয়জন যা জীবিত সবকিছুকেই মুহূর্তে ধ্বংস করতে পারে।'

'আল্লাহ আমাদের রক্ষা করেছেন হাসান তারিক।' বলে ঘুরে দাঁড়িয়ে সামনের দিকে হাঁটা শুরু করে বলল, 'চল হাসান তারিক, এলাকাটা একটু ঘুরে দেখা যাক।'

তারা এদিক ওদিক ঘুরে পাহাড় ঘেরা উপত্যকা করিডোরটির একদম উত্তর প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালো। এখান থেকে উপত্যকা প্রায় খাড়াভাবে বিশ গজ নেমে গেছে। তারপর ঘন গাছ-পালায় ঢাকা উপত্যকাটি আধা মাইলের মত এগিয়ে সাগরে মিশেছে।

হঠাৎ হাসান তারিক ভ্রু কুঞ্চিত করে সামনের দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, 'এখানে এক ধরনের তেলের গন্ধ পাচ্ছি আহমদ মুসা ভাই।'

শুনে আহমদ মুসাও সেটা অনুভবের চেষ্টা করল। মুহূর্ত কয়েক পরে আহমদ মুসাও বলে উঠল, 'সত্যি বলেছ, এক ধরনের তেলের গন্ধ পাওয়া যাচ্ছে।'

'গন্ধটা বেশ ভারী আহমদ মুসা ভাই। এর উৎস খুব দূরে হবে না।' বলল হাসান তারিক।

'সাগরের পানিতে তেল পড়তে পারে। সাগর তো খুব দুরে নয়।' আহমদ মুসা বলল।

ভাবছিল হাসান তারিক। বলল, 'ভাইয়া সাগরের পানিতে তেল মেশার পর তার গন্ধ এতটা ভারী হবার কথা নয়।'

'তাহলে?' বলল আহমদ মুসা।

‘আমার মনে হয় ভিন্ন কোন উৎস থেকে তেলের এই গন্ধ আসছে।’ হাসান তারিক বলল।

‘সে ভিন্ন উৎসটা কি হতে পারে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আমি বুঝতে পারছি না আহমদ মুসা ভাই।’ বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসারা হাঁটতে হাঁটতে কথা বলছিল। তারা এসে পড়েছে ঘাসে ঢাকা উন্মুক্ত উপত্যকাটার উত্তর-পূর্ব কোণের একদম প্রান্তে। সামনেই পাহাড়ের প্রাচীর।

হঠাৎ পাহাড়ের প্রাচীরের এক টুকরো নীল রংয়ের উপর চোখ আটকে গেল আহমদ মুসার।

এগিয়ে গেল আহমদ মুসা প্রাচীরের কাছে। দেখল, নীর রং দিয়ে একটা উর্ধমূখী তীর আঁকা। তীরের দন্ডটি জিগজ্যাগ। তীরের চারদিক ঘিরে বহুকৌণিক একটা সীমান্ত আঁকা সীমান্তের উপর চোখ বুলাতে গিয়ে চমকে উঠল আহমদ মুসা। বহুকৌণিক সীমান্তটিকে মনে হলো একটি হিব্রু অক্ষর যার উচ্চারণ ইংরেজী ‘প্রসিড’ এর সমার্থক।

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই এক প্রশ্ন এসে এই ঔজ্জ্বল্যকে আচ্ছন্ন করে দিল।

আহমদ মুসা পাহাড়ের দেয়ালের অংকনটির দিকে ইংগিত করে বলল, ‘হাসান তারিক দেখ তো কিছু বুঝতে পারো।’

আহমদ মুসার সাথে হাসান তারিকও অংকনটিকে দেখছিল। বলল, ‘তীরটি উপরের দিকে অর্থাৎ সামনের দিকে একটা পথের ইংগিত করছে।’

‘আর চারদিকের কৌণিক বৃত্তটি?’ জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘আমি বুঝতে পারছি না ভাইয়া।’

‘দেখ ওটা একটা হিব্রু অক্ষর।’

ভ্রু কুঞ্চিত হয়ে উঠল হাসান তারিকের। বলল, ‘ঠিক ভাইয়া।’

তারপরেই হাসান তারিক আবার উচ্ছসিত কণ্ঠে বলে উঠল, ‘কেউ যেন সামনে ‘প্রসিড’ মানে অগ্রসর হবার জন্যে নির্দেশ দিচ্ছে।’

‘নির্দেশ দাতা কে?’ প্রসন্ন মুখে জিজ্ঞেস করল আহমদ মুসা।

‘হিব্রু অক্ষরের উপস্থিতি প্রমাণ করছে সে নিদের্শদাতা ইহুদী কেউ।’ বলল হাসান তারিক।

‘ধন্যবাদ হাসান তারিক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু কোথায় অগ্রসর হতে নির্দেশ দিচ্ছে?’ জিজ্ঞাসা হাসান তারিকের।

‘সেটাই এখন প্রশ্ন।’ বলে একটু থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলে উঠল, ‘কেলভিনের কাছ থেকে আমরা জানলাম এই উপত্যকাটা ইহুদীরা মানে WFA (ওয়ার্ল্ড ফ্রিডোম আর্মি) লীজ নিয়েছে। লিজ নিয়েছে নিশ্চয় কোন কাজে লাগাবার জন্যে। সেই কাজটা কি? আমার মনে হয় এই ‘তীরটি’র সাথে এই জিজ্ঞাসার সম্পর্ক আছে।’

‘তার মানে তীরের নির্দেশ অনুসারে সামনে অগ্রসর হলে জিজ্ঞাসাটির জবাব পাওয়া যাবে।’ বলল হাসান তারিক।

‘তাই মনে হয়।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু অগ্রসর হবো কিভাবে?’ চারদিকে চোখ বুলাবার সাথে সাথে জিজ্ঞেস করল হাসান তারিক।

‘চারদিকে নয় হাসান তারিক। তীরের দিক-নির্দেশনার দিকে তাকাও। দেখ আমরা পাহাড়ের প্রাচীর বেয়ে যদি উপরে উঠি, তাহলে কিছুটা উপরে গিয়েই আমরা একটা ‘ষ্টেপ’ পাচ্ছি। ষ্টেপটা দুই পাহাড়ের টিলার মধ্য দিয়ে সামনে এগিয়ে গেছে সামনের আরেক পাহাড়ের দেয়ালের দিকে। ঐ দেয়ালে পৌছে কি করতে হবে, তার নির্দেশ বোধ হয় ওখানে গেলেই পাওয়া যাবে।’ বলল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকের চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। বলল, ‘চলুন ভাইয়া তাহলে অগ্রসর হই। জিজ্ঞাসাটির জবাব না নিয়ে আমরা ফিরছি না।’

‘আমারও তাই মত। চল হাসান তারিক।’ বলে আহমদ মুসা পাহাড়ের দেয়ালে ওঠার জন্যে সামনে অগ্রসর হলো।

দুজনেই পাহাড়ের ধাপে উঠে এল।

ধাপ বা ষ্টেপের মুখটা সরু। কিন্তু তারা দেখল, মুখের কয়েক গজ পরেই ধাপটা প্রশস্ত হয়েছে এবং তা এগিয়ে গেছে সামনের পাহাড়টার দেয়াল পর্যন্ত। তারপর তা সংকীর্ণ এক গিরিপথ আকারে এঁকে বেঁকে এগিয়ে গেছে উত্তর দিকে।

‘চল আমরা এগোই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কোথা?’ জিজ্ঞাসা হাসান তারিকের।

‘জানি না। তবে পথে এগুলে এই উপত্যকা কেন WFA লীজ নিয়েছে তার রহস্য জানা যাবে। এই পথে গুরুত্বপূর্ণ পাহাড়ের গায়ে তীর চিহ্ন তা প্রমাণ করে।’ বলল আহমদ মুসা।

গিরিপথ ধরে এগুলো তারা।

হঠাৎ এক সময় মাটি থেকে একটা জিনিস তুলে নিয়ে চিৎকার করে বলল, ‘এই যে আহমদ মুসা ভাই একটা সিগারেটের গোড়া পাওয়া গেছে। তার মানে গিরিপথ দিয়ে লোকজন যাতায়াত করেছে।’

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়িয়ে ফিরল। হাত বাড়িয়ে বলল, ‘দাও দেখি সিগারেটের গোড়াটা।’

সিগারেটের গোড়াটা হাতে নিয়ে একটু নাড়াচাড়া করে বলল, ‘গোড়াটা টাটকা নয় দেখছি। দুএকদিনের মধ্যে নয়, তবে এই পথে লোক যাতায়াত করেছে।’

আবার হাঁটা শুরু করল তারা।

পথে সিগারেটের টুকরো, ভাঙা চারাগাছ, চকলেটের মোড়ক, প্রভৃতি মানুষ চলাচলের আরও কিছু চিহ্ন তারা পেল। কিন্তু সবই বেশ পুরানো। এক জায়গায় পেল একখন্ড দলা পাকানো কাগজ।

আহমদ মুসা তাড়াতাড়ি তুলে নিল কাগজের দলাটি। কাগজের দলাটি তাড়াতাড়ি খুলল।

কাগজটা আয়তাকৃতির একটা স্লিপ পেপার। কাগজের এক পৃষ্ঠা সাদা। অন্য পৃষ্ঠায় একটা মোবাইল টেলিফোন নাম্বার লেখা। তার সাথে কয়েকটি তারিখ। এলোপাথাড়ী লেখা তারিখগুলো সবই সামনের।

মোবাইল নাম্বারটি চিনতে পারল আহমদ মুসা। কেলভিনের কাছ থেকে একটাই মোবাইল টেলিফোন নাম্বার পাওয়া গেছে। আর সেটা এই নাম্বার।

হাসান তারিকও কাগজটি দেখল। সেও টেলিফোন নাম্বারটি চিনতে পারল। কিন্তু তারিখ সম্পর্কে বলল, 'এগুলোর বোধ হয় কোন অর্থ নেই। কেউ এমনিই এলোপাথাড়ি লিখে থাকতে পারে।'

'হতে পারে, কিন্তু দেখ তারিখগুলোর একটা তারিখ কেটে দিয়ে সেটা আবার লেখা হয়েছে। অর্থহীন আঁচড় হলে একটা তারিখ কেটে দিয়ে তা আবার সংশোধন করার দরকার ছিল না।' বলে আহমদ মুসা কাগজের খন্ডটি পকেটে রেখে দিল।

গিরিপথ ধরে তারা একেবারে উপকূলে পৌছে গেল।

উপকূল দেখে তারা বিস্মিত হলো।

পাহাড় ঘেরা মাঠ থেকে যে উপত্যকা নেমে এসেছে তার শেষ প্রান্তটা, মানে উপকূল অংশটা পাহাড় ঘেরা ঘাসে ঢাকা মাঠটা যেমন খাড়া বিশ ফুট নেমে গিয়ে একটা সবুজ সমতল উপত্যকার সৃষ্টি করেছে, তেমনি নগ্ন পাথুরে উপকূলটি খাড়া সমুদ্রে নেমে গেছে। সবচেয়ে লক্ষণীয় হলো সাগর এখানে শান্ত।

বিস্মিত হাসান তারিক বলে উঠল, 'ভাইয়া এটা একটা ন্যাচারাল পোর্ট। পাথুরে উপকূলটা একটা ন্যাচারাল জেটিও এবং সাগর এখানে অত্যন্ত গভীর। সাবমেরিনসহ যে কোন জাহাজ এই পাথুরে জেটিতে ল্যান্ড করতে পারে। এমন ন্যাচারাল পোর্ট পৃথিবীতে আর আছে কি না সন্দেহ।'

আহমদ মুসা অপার বিস্ময় নিয়ে তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'সাগর এখানে অত্যন্ত গভীর কি করে বুঝলে?'

মেরিন ইঞ্জিনিয়ার হাসান তারিক জবাব দিল, উপকূল হওয়া সত্ত্বেও সাগর এখানে এতটা শান্ত হওয়াই তার প্রমাণ।'

'ও আল্লাহ! পাহাড় ঘেরা দুর্গম এই উপত্যকা ন্যাচারাল পোর্ট বলেই WFA এটা লীজ নিয়েছে।' বলেই আহমদ মুসা প্রবল উচ্ছাসে চিৎকার করে উঠল, 'এটাই তাহলে ওদের দুই মিনি-সাব লাইনের সংযোগ বন্দর। 'পঁতা

দেলগা’ থেকে আসা মিনি-সাব এখানে নোঙর করে, আবার এখান থেকেই মিনি-সাব সাও তোরাহ যায়।’

হাসান তারিকও উচ্ছসিত হয়ে উঠল। বলল, ‘ঠিক বলেছেন ভাইয়া, এটাই ওদের সংযোগ বন্দর।’

একটু থেমেই হাসান তারিক আবার বলে উঠল, ‘ভাইয়া তেলের যে গন্ধ পেয়েছিলাম সেটা এখান থেকেই। দেখুন এখানকার মাটি থেকেই এই গন্ধ আসছে। এটা সাবমেরিন ওয়েলের গন্ধ।’

আহমদ মুসার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘হ্যাঁ তেলের গন্ধ এখান থেকেই উঠেছে। এ থেকে আরও নিশ্চিত প্রমাণ হচ্ছে যে, ওদের মিনি সাবমেরিন এখানে নোঙর করে।’

‘কিন্তু আশ্চর্য ভাইয়া, ওরা এখানে কোন স্থাপনা গড়ে তোলেনি।’ বলল হাসান তারিক।

‘চল একটু ঘুরে দেখা যাক।’ আহমদ মুসা বলল।

‘চলুন।’ বলল হাসান তারিক।

হারতা গোয়েন্দা সদর দফতরের আন্ডার গ্রাউন্ড একটা কক্ষে বড় ধরনের একটা চেয়ারে আছড়ে বসালো পলা জোনসকে আজর ওয়াইজম্যানের দুর্ধর্ষ দক্ষিণ হস্ত ডেভিড ইয়ামিন।

ডেভিড ইয়ামিন ইস্পাতের মত শক্ত ও ঋজু দীর্ঘকায় লোক। নাকের নিচে একখন্ড হিটলারী গোফ। তার চোখ-মুখ থেকে ঠিকরে পড়ছে নৃশংসতা। পলা জোনসকে চেয়ারে আছড়ে ফেলেই ডেভিড ইয়ামিন বলে উঠল, 'মি. ভিক্টর রাইয়া আমি দু:খিত যে পলা জোনস আপনার একজন ষ্টাফ। আপনাদের অজান্তেই ভয়ংকর এক শত্রুর এজেন্ট সে। সুতরাং তার প্রতি কোন দয়া-মায়া আপনাদের অবশ্যই নেই। মি. কেলভিনসহ আমাদের যতলোক খুন হয়েছে তার জন্যে প্রধানত এই মহিলা দায়ী। আমার উপর নির্দেশ হলো কেলভিনকে কিডন্যাপকারী দুজনের পরিচয় পলার কাছ থেকে আদায় করতে হবে যে কোনভাবেই। আপনার মূল্যবান সহযোগিতা আমরা পেয়েছি। আমাদের জেনারেল (আজর ওয়াইজম্যান) আশা করেন এক্ষেত্রেও আপনি আমাদের সহযোগিতা করবেন।'

বলে ডেভিড ইয়ামিন একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'মি. ভিক্টর রাইয়া আপনি একটু দাঁড়ান। আমি উপর থেকে আসছি।'

ডেভিড ইয়ামিন দৌড়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেল উপরে।

ডেভিড ইয়ামিন উপরে উঠে যেতেই হারতার গোয়েন্দা প্রধান ভিক্টর রাইয়া পলা জোনসের কাছে ছুটে গেল। বলল, 'পলা আমি তোমাকে কোন সাহায্য করতে পারবো না। এদের সম্পর্ক ডেপুটি গভর্নর, দেশের প্রধানমন্ত্রী, গোয়েন্দা প্রধান সকলের সাথে। আমি শুধু তাদের হুকুমই তামিল করতে পারি, আর কিছু নয়। তুমি যা জান বলে দাও এদের। তুমি কারও এজেন্ট নও আমি জানি।'

‘স্যার ঠিক বলেছেন, আমি কারও এজেন্ট নই। ওদের সম্পর্কে খুব বেশি কিছু জানি না। সেদিন রাতে WFA-এর লোকদের হাতে ধর্ষিত ও নিহত হওয়া থেকে ওরা আমাকে রক্ষা করে ও উদ্ধার করে। আমি ওদের সম্পর্কে যেটুকু জানি, সেটুকুও আমি বলব না।’ বলল পলা জোনস।

‘কিন্তু তুমি জান আমি তোমাকে এদের হাত থেকে রক্ষা করতে পারবো না। এদের অফুরন্ত টাকা আছে, অশেষ প্রতাপ আছে। এরা ডেপুটি গভর্নর, গভর্নরসহ অনেককেই কিনে ফেলেছে। আমার অফিসে তোমার উপর যা ইচ্ছে তাই হবে, সেটাও আমার পক্ষে সহ্য করা মুশকিল। সবচেয়ে ভাল, তুমি যা জান সব এদের বলে দাও।’ নরম কণ্ঠে বলল ভিক্টর রাইয়া।

পলা জোনসের দুচোখ দিয়ে অশ্রু গড়াল। বলল সে, ‘আপনার সহানুভূতির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ স্যার। কিন্তু এই নির্দেশ আমি মানতে পারবো না। আমার জীবন গেলেও আমি এ শয়তানদের কোন সহযোগিতা করবো না।

ভিক্টর রাইয়া সংগে সংগে কথা বলল না। কিন্তু তার চোখে-মুখে একটা দৃঢ়তা ফিরে এসেছে। উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে তার চোখ দুটি। বলল, ‘তোমাকে ধন্যবাদ মা। আমরা প্রত্যেক আজোরসবাসী যদি তোমার মত হতাম ।’ তারও চোখের কোণ অশ্রুতে ভিজে উঠেছে।

একটু থেমেই আবার কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল। এ সময় ডেভিড ইয়ামিন ছুটে নেমে এল সিঁড়ি দিয়ে। তার চোখ-মুখ থেকে ক্রোধ ও উত্তেজনা ঠিকরে পড়ছে। ভিক্টর রাইয়ার কাছাকাছি এসেই সে বলল, ‘মি. ভিক্টর রাইয়া, এই হারামজাদি সবই জানে। এইমাত্র আমাদের লোকেরা খবর দিল, এর মা বুড়ি হারামজাদিকে আমাদের লোকেরা আচ্ছা করে পেটানোর পর স্বীকার করেছে সে পর্যটক দুজন লোককে তার বাড়ির দুটো কক্ষ ভাড়া দিয়েছিল। আমার সন্দেহ নেই, এ দুজন সব কাজের হোতা। আর তাদের সহযোগী ছিল এই হারামজাদী।’

বলেই ডেভিড ইয়ামিন ছুটে গেল পলা জোনসের চেয়ারের কাছে। তার হাত দুটো আটকানো ছিল চেয়ারের হাতলের হুকের সাথে। এবার পা দুটোকেও আটকে দিল পাটাতনের হুকের সাথে। আর চেয়ারের ব্যাকের সাথে বিশেষভাবে

তৈরী দুটো রাবারের হুক দুদিক থেকে এসে কপাল বেষ্টন করে পলা জোনসের মাথাটাকে চেয়ারের ব্যাকের সাথে সেঁটে দিল।

কথা বের করা ও শাস্তি দেয়ার এক মোক্ষম হাতিয়ার এই বৈদ্যুতিক চেয়ার।

পলা জোনসকে বেঁধে ফেলার পর ডেভিড ইয়ামিন চেয়ারের পেছনে হুকে ঝুলানো বৈদ্যুতিক সুইচ মিটার হাতে নিয়ে পলা জোনসকে লক্ষ্য করে বলল, 'শয়তানি, হাতের এই সুইচ টিপলেই তো বৈদ্যুতিক নাচন শুরু হয়ে যাবে। শেষ সুযোগ দিচ্ছি। বল, লোক দুটি কে, এখন কোথায় তারা? কেলভিনকে কোথায় নিয়ে গেছে।' চিৎকার করে কথাগুলো বলল ডেভিড ইয়ামিন।

পলা জোনস চোখ বন্ধ করে ছিল। চোখ খুলল না, কথাও বলল না।

আগুন জ্বলে উঠল ডেভিড ইয়ামিনের চোখে-মুখে। তার ডান হাতের অস্থির বুড়ো আঙুলটি চেপে বসল হাতের সুইচ মিটারের লাল বোতামটির উপর।

মুহূর্তেই চিৎকার করে উঠল পলা জোনস। বুক ফাটা সে চিৎকার। সেই সাথে অস্থির কম্পনের বাঁধন ছেঁড়া ঢেউ জেগে উঠল তার গোটা শরীরে। বেদনায় বিকৃত হয়ে গেল তার মুখ। ঠিকরে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছিল তার দুই চোখ।

মুহূর্তকাল বোতাম চেপে থেকেই সরে এল ডেভিড ইয়ামিনের বুড়ো আঙুল বোতামটি থেকে।

এরপর হাসি ফুটে উঠল ডেভিড ইয়ামিনের চোখে-মুখে। বলল, 'মিটারের কাঁটাতো কেবল সিকিতে উঠেছে, তাতেই এই অবস্থা। বুঝতেই পারছিসকাঁটাটা অর্ধেকে বা পুরোতে উঠলে কি হবে! বল, আমার প্রশ্নের জবাব দে? বল, ঐ দুজনের একজন আহমদ মুসা ছিল কিনা।'

পলা জোনসের মাথাটা ঝুলে গেছে দুদিক থেকে আসা হুকের সাথে। দেহটাও নেতিয়ে পড়েছে চেয়ারের উপর। তার চোখ দুটি বন্ধ। ডেভিড ইয়ামিনের হুংকার যেন কোন প্রতিক্রিয়াই সৃষ্টি করল না।

ক্রোধে বিকৃত হয়ে গেল ডেভিড ইয়ামিনের মুখ। হাতের বিদ্যুত মিটারের লাল বোতামটা চেপে ধরল সে।

অবারিত বিদ্যুত গিয়ে ছোবল হানল পলা জোনসের দেহে। চিৎকারে চৌবির হয়ে গেল যেন পলা জোনসের বুক। চিৎকারের সাথে সাথে বাঁধন ছেড়া তীব্রতায় খিঁচুনি দিয়ে উঠল তার দেহ। কপালের দুপাশ এবং হাত ও পা-এর বাঁধনে থেথলে যাওয়া অংশ থেকে লাল রক্তের প্রবাহ নেমে এল।

আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরের সিঁড়ির মুখে দাঁড়ানো দুজন ষ্টেনগানধারী অপলক চোখে গ্রাউন্ড ফ্লোরের এই দৃশ্যটা দেখছে। তাদের পেছনে এসে দাঁড়াল শার্প চেহারার ঋজু দেহের একজন তরুণী। গ্রাউন্ড ফ্লোরের দিকে তাকিয়েই তার চোখ ছানাবড়া হয়ে উঠল। পরমুহূর্তেই চিৎকার করে উঠল, 'আব্বা এসব কি হচ্ছে? পলা আমার ক্লাসমেট, বন্ধু। এরা কারা?'

বলেই তরুণীটি অপরিচিত প্রহরী দুজনকে ঠেলে সিড়ি দিয়ে নামছিল। প্রহরী দুজন তাকে বাধা দিতে যাচ্ছিল।

'সোফিয়া সুসান, তুমি দাঁড়াও আমি আসছি।'

কথা বলার সাথে সাথেই ভিক্টর সিঁড়ির দিকে হাঁটতে শুরু করেছে।

সোফিয়া সুসান হারতার গোয়েন্দা প্রধান ভিক্টর রাইয়ার মেয়ে। সেনাবাহিনীর ক্যাপ্টেন। অফিসে পিতার কাছে এসেছিল। অফিসে না পেয়ে এদিকে আছে শুনে চলে এসেছে।

প্রহরী দুজন সোফিয়া সুসানকে বাধা দিতে এসে মাঝ পথে থেমে গেছে। ডেভিড ইয়ামিন ইংগিতে তাদের থামিয়ে দিয়েছে।

পিতা সিঁড়িতে পৌছার আগেই সোফিয়া সুসান সিঁড়ি পেরিয়ে আন্ডার গ্রাউন্ড ফ্লোরে পৌছে গেল।

তার পিতা আসছিল।

সোফিয়া সুসান তার মুখোমুখি হলো। আগের প্রশ্নেরই পুনরাবৃত্তি করল সোফিয়া সুসান, 'এ সব কি হচ্ছে আব্বা? পলা আমার বন্ধু, তাকে আমি জানি। কি অপরাধ করেছে সে?'

মেয়ের প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে ভিক্টর রাইয়া বলল, 'সব বলব মা, তুমি এখান থেকে চলে যাও।'

‘এরা কারা আব্বা? এরা তোমার গোয়েন্দা বিভাগের লোক নয়?’ প্রশ্ন করল সোফিয়া সুসান।

‘সবই বলব। চল উপরে।’ বলল ভিক্টর রাইয়া।

‘না আব্বা সব শুনতে চাই। ওরা কেন পলাকে নির্যাতন করছে। কি দোষ পলার? ওরা নির্যাতন করবেন কেন?’

বিব্রত ভাব ফুটে উঠল ভিক্টর রাইয়ার চোখে-মুখে। মুখ ফিরিয়ে তাকাল সে ডেভিড ইয়ামিনের দিকে। তারপর বলল, ‘সে অনেক কথা মা, চল বলছি আমি।’

‘না আব্বা, পলা তোমার গোয়েন্দা কর্মী। বাইরের লোক তাকে নির্যাতন করছে। এর কারণ না বললে আমি পলাকে নিয়ে যাব।’ বলল সোফিয়া সুসান।

পলা জোনসের দেহটা নেতিয়ে পড়েছিল চেয়ারের উপর। তার চোখ বন্ধ।

ডেভিড ইয়ামিন তার হাতের বিদ্যুত মিটারটা মেঝের উপর ফেলে দিয়ে তাকাল সোফিয়া সুসানের দিকে। বলল, ‘মিস সুসান, মিস পলা জোনস মৌলবাদী সন্ত্রাসী আহমদ মুসাকে আশ্রয় দিয়েছে, সাহায্য করেছে এবং আমাদের কয়েকজন লোককে হত্যা করিয়েছে।’

বিস্ময় ফুটে উঠল সোফিয়া সুসানের চোখে-মুখে। গভীর দৃষ্টিতে তাকাল সে ডেভিড ইয়ামিনের দিকে। ভাবনার চিহ্ন ফুটে উঠল তার চোখে-মুখে। বলল, ‘ও! আপনি তাহলে আজর ওয়াইজম্যানের লোক!’

গম্ভীর কণ্ঠে এ কথাগুলো বলেই হেসে উঠল সোফিয়া সুসান। বলল ডেভিড ইয়ামিনকে হালকা কণ্ঠে, ‘মি. ডেভিড ইয়ামিন আপনার কথা ঠিক নয়। পলা জোনস আহমদ মুসাকে সাহায্য করতে পারে না, বরং আহমদ মুসা সাহায্য করতে পারে পলা জোনসকে। কারণ পলা জোনসের ভাইকে আপনারা হত্যা করেছেন। আর আপনাদের কয়েকজন লোককে পলা জোনস হত্যা করেনি, নিহত হয়ে থাকলে আহমদ মুসাই তাদের হত্যা করেছেন। আহমদ মুসার সাথে আপনাদের এটা পুরনো যুদ্ধ।’

বলে একটু থেমেই একটু হেসে সোফিয়া সুসান বলল, ‘আহমদ মুসাকে আপনি মৌলবাদী সন্ত্রাসী বলছেন, কিন্তু জানেন তো খোদ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ইহুদী সন্ত্রাস ও ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে আমেরিকার এক মুক্তিযোদ্ধা হিসেবে তাকে আখ্যায়িত করেছে।’

কিছু বলতে যাচ্ছিল ডেভিড ইয়ামিন। এমন সময় উপর থেকে কয়েকটা গুলীর শব্দ ভেসে এল।

ডেভিড ইয়ামিন থেমে গেল।

সবাই উৎকর্ণ হয়ে উপর দিকে তাকাল।

পর মুহূর্তেই সিঁড়ির মুখে দাঁড়ানো প্রহরী দুজনাকে তাদের ষ্টেনগান তুলতে দেখা গেল। তাদের চোখে-মুখে উত্তেজনা।

কিন্তু তাদের ষ্টেনগান টার্গেটে স্থির হবার আগেই দুটি গুলীর শব্দ হলো এবং প্রহরী দুজন গুলীবিদ্ধ হয়ে ঢলে পড়ল।

পকেট থেকে রিভলবার বের করল ডেভিড ইয়ামিন।

সিঁড়ির মুুখে এসে দাঁড়িয়েছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক।

রিভলবার তুলে গুলী করল ডেভিড ইয়ামিন।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক সিঁড়ি মুখে এসেই তাকিয়েছিল নিচে। দেখতে পেয়েছিল তাদের দিকে উঠে আসা রিভলবার। ঝাঁপিয়ে পড়েছিল তারা দুজনে সিঁড়ির উপর।

সিঁড়ি দিয়ে তারা গড়িয়ে আসতে লাগল। ডেভিড ইয়ামিন পর পর তিনটি গুলী ছুড়ল। কিন্তু সিঁড়ি দিয়ে গড়িয়ে পড়া দেহ দুটির একটিরও নাগাল পেল না।

আগে গড়িয়ে পড়েছিল আহমদ মুসা। রিভলবারের ট্রিগার থেকে তার তর্জনি মুহূর্তের জন্যে আলগা হয়নি। সিঁড়ি থেকে তার দেহ মেঝেয় ছিটকে পড়ে স্থির হবার আগেই আহমদ মুসার রিভলবারের গুলী ছুটে গেল ডেভিড ইয়ামিনের দিকে।

ডেভিড ইয়ামিনও তার রিভলবার তুলেছিল আহমদ মুসার লক্ষ্যে। সে অপেক্ষা করছিল আহমদ মুসার দেহ মেঝেয় পড়ে স্থির হবার জন্যে, যাতে তার শেষ দুটি গুলী লক্ষ্য ভ্রষ্ট না হয়।

কিন্তু গুলী করার আর সুযোগ হলো না ডেভিড ইয়ামিনের। তার আগেই গুলী বিদ্ধ হয়ে লুটিয়ে পড়ল তার দেহ।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

হাসান তারিকও গড়িয়ে চলে এসেছিল। সেও উঠে দাঁড়াল।

দ্রুত এগোল আহমদ মুসা পলা জোনসের দিকে। হাসান তারিকও।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই পলা জোনসের বাঁধন খুলতে লাগল।

গোলাগুলীর শব্দে পলা জোনস চোখ খুলেছিল। তার নেতিয়ে পড়া দেহ টেনে সোজা করার চেষ্টা করেছিল তারা। আহমদ মুসা তার বাঁধন খোলা শুরু করলে সে 'ভাইয়া' বলে কান্নায় ভেঙে পড়ল।

সোফিয়া সুসান দেখছিল আহমদ মুসাকে। মুহূর্তেই তার মনে হয়েছে, ইনিই আহমদ মুসা হবেন। তার চোখে-মুখে ফুটে উঠেছিল সপ্রশংস বিস্ময়। সে চোখ ফেরাতে পারেনি আহমদ মুসার দিক থেকে। অনেকটাই সে আনমনা হয়ে পড়েছিল। কিন্তু হঠাৎ তার পিতাকে আকস্মিক দ্রুততায় সিঁড়ি মুখের দিকে ফিরে তাকাতে দেখে সোফিয়া সুসানও সেদিকে চোখ তুলল।

সোফিয়া সুসানের আব্বা দাঁড়িয়েছিল সোফিয়া সুসানের পরেই। তার পরেই কিছু দূরে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দ্রুত পলা জোনসের বাঁধন খুলে দিচ্ছিল। সুতরাং সুসানের পিতার দৃষ্টি সিঁড়ি মুখের দিকে ঘুরে যেতেই সোফিয়া তাকে অনুসরণ করেছিল।

সোফিয়া সুসান দেখল, সিঁড়ি মুখে দুজন লোক এসে দাঁড়িয়েছে। তাদের দুজনের চোখ নিহত ডেভিড ইয়ামিনের লাশের দিকে। বিস্ময় বিস্ফোরিত দৃষ্টি তাদের চোখে-মুখে।

পরমুহূর্তেই তাদের চোখ ঘুরে গেল আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের দিকে। লোক দুজনের হাতে রিভলবার। আহমদ মুসাদের একবার দেখে নিয়েই লোক দুজন তাদের রিভলবার তুলছিল।

তাদের মতলব বুঝতে পেরেছিল সোফিয়া সুসান। আহমদ মুসা ও তার সাথীই তাদের টার্গেট। উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল সোফিয়া সুসানের মন। বিপরীত

দিকে ঘুরে আহমদ মুসারা পলা জোনসের বাঁধন খুলছিল। নির্ঘাত মারা পড়বে তারা। এই কুচিন্তাটা সোফিয়া সুসানের মনকে আচ্ছন্ন করার সাথে সাথেই চোখের পলকে তার হাতের রিভলবারটা উঠে এল এবং তার দক্ষ হাত ফায়ার করল লোক দুজনকে।

আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে লোক দুজনের রিভলবার তোলার মধ্যে ছিল দ্বিধাগ্রস্তভাব। সম্ভবত তারা নিশ্চিত হতে পারছিল না, কে ডেভিড ইয়ামিনকে হত্যা করেছে, আহমদ মুসারা না ভিক্টর রাইয়ারা। সোফিয়া সুসানের হাতে রিভলবার দেখেই সম্ভবত এই জিজ্ঞাসা তাদের মনে জেগেছিল।

এর ফলেই সুযোগ পেয়ে গেল সোফিয়া সুসান। তার রিভলবারের পর পর দুটি গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল লোক দুজনের বক্ষ।

গুলীর শব্দ শুনেই আহমদ মুসা ও হাসান তারিক তড়াক করে ফিরে তাকাল। দেখল ভিক্টর রাইয়ার পাশে দাঁড়ানো তরুণীর রিভলবার সিঁড়ি মুখের দিকে উদ্যত। ধোঁয়ার রেশ তখনও তার রিভলবারের নলে। আর সিঁড়ি মুখের দুজন লোক গুলী খেয়ে পড়ে যাচ্ছে। তরুণীটির বয়স বিশ-বাইশের বেশি হবে না। ডীপ ব্লু ট্রাউজারের উপর ডীপ ব্লু সার্ট। গাড় নীলের আবরণে যেন নিখুঁত একটি সাদ গোলাপ। যেমন ঋজু স্পোর্টি দেহ, তেমনি অসাধারণ বুদ্ধিদীপ্ত চেহারা।

'থ্যাংকস মিস.....।'

সোফিয়া সুসানের দিকে তাকিয়ে বলল আহমদ মুসা।

'আমি সোফিয়া সুসান।' আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলল সোফিয়া সুসান।

পলা জোনসের বাঁধন খোলা হয়ে গিয়েছিল। আহমদ মুসা ও হাসান তারিক তাকে তুলে দাঁড় করাচ্ছিল। সোফিয়া সুসানের কথার উত্তরে আহমদ মুসা বলল, 'আপনি ভিক্টর রাইয়ার মেয়ে নিশ্চয়?'

পলা জোনস উঠে দাঁড়িয়েছিল। দূর্বল কণ্ঠে টেনে টেনে বলল সে 'হ্যাঁ ভাইয়া। সে আমার বন্ধুও।'

‘হ্যাঁ, তোমার বন্ধু বলেই আমাদের জীবনও উনি রক্ষা করেছেন। কিন্তু এরা দুজন এল কোত্থেকে? আমি আসার সময় এরা বাধা দেয়নি কেন?’ বলল আহমদ মুসা।

‘আমি দেখেছি। ওরা সমানে মদ গিলছিল। সম্ভবত গুলীর শব্দে ওদের নেশা কেটে যায়।’ বলল সোফিয়া সুসান।

‘তাই হবে।’ বলে আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, ‘তুমি মৃত কয়েকজনকে সার্চ করে দেখ ওদের কোন ঠিকানা বা মিনি-সাব সম্পর্কে কোন তথ্য পাও কিনা।’

কথা শেষ করেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, ‘মি. ভিক্টর রাইয়া আমি জানি আপনি পলা জোনসকে ¯েœহ করেন। কিন্তু আশ্চর্য হচ্ছি WFA এর আজর ওয়াইজম্যান আজোরস সরকারের উপর এতটাই প্রভাব রাখে যে, আপনাকে নিরবে তাদের জঘন্য আবদার মেনে নিতে হলো!’

বিব্রত দেখালো ভিক্টর রাইয়াকে। বলল সে, ‘পলা জোনস তাদের শত্রু নয়। আপনার জন্যেই তার এই দূর্দশা।’

‘আপনি ঠিকই বলেছেন। কিন্তু তাই বলে আপনার এক অধঃস্তন ষ্টাফকে আপনি ঠেলে দেবেন জানোয়ারের হাতে?’ বলল আহমদ মুসা।

‘পলার উচিত ছিল আপনার কথা ওদের বলে দেয়া। আপনাকে সে আড়াল করবে কেন?’ ভিক্টর রাইয়া বলল।

‘আপনার একথাও ঠিক। কিন্তু তাই বলে আপনার একজন ষ্টাফকে আজর ওয়াইজম্যানের লোকদের হাতে ছেড়ে দেবেন? আজর ওয়াইজম্যানদের কাছে মনে হচ্ছে আপনার সরকার অসহায়। কেন?’

কিছুটা বিরক্তি কিছুটা ক্রোধ প্রকাশ পেল ভিক্টর রাইয়ার চোখে-মুখে। কিছু বলতে যাচ্ছিল কিন্তু তাকে বাধা দিয়ে সোফিয়া সুসান আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলে উঠল, ‘মাফ করবেন। আপনি নিশ্চয় আহমদ মুসা। আমার পিতার জবাবটা আমিই দিচ্ছি। দেখুন, আজোরস কোন রাষ্ট্র নয়, একটা রাষ্ট্রের অংশ মাত্র। আমার আব্বা এই অংশের একজন অফিসার মাত্র। তাঁর পছন্দ অপছন্দের

সীমা খুবই সীমিত। আর এ বিষয়টা আপনার চেয়ে ভাল কেউ জানার কথা নয়। সুতরাং আপনার প্রশ্ন অবান্তর।'

'আপনার কথা ঠিক। কিন্তু কেন্দ্র কিংবা প্রাদেশিক WFA কে এ ধরনের সহযোগিতা দেয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে আমার মনে হয় না।' বলল আহমদ মুসা।

'সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রয়োজন হয় না। যখন কেন্দ্রীয় কিংবা প্রাদেশিক কর্তৃপক্ষ অসম্ভব সব সুযোগ-সুবিধা WFA-কে দিচ্ছে, তখন অধস্তন কর্মকর্তাদের বুঝতে বাকি থাকে না তাদের কি করতে হবে। এর বাইরে লোভ-লালসার প্রশ্ন তো আছেই। একটা অভিজ্ঞতার কথা বলি। নৌবাহিনীর অনুসন্ধানী বিমান কল করল যে, সাও তোরাহ দ্বীপ থেকে তারা মাঝে মাঝেই দুর্বোধ্য ইলেক্ট্রনিক সিগন্যাল মনিটর করছে যার ডিকোড ও সন্ধান পাওয়া প্রয়োজন। কমান্ড অফিস থেকে আমিই রিপোর্ট সুপারিশসহ প্রদেশ ও কেন্দ্রে পাঠিয়েছিলাম। দুদিন পরেই উত্তর এসেছিল, 'দ্বীপটা বোটানিক্যাল গবেষণার জন্যে লীজ দেয়া হয়েছে। দ্বীপের ব্যাপারগুলো তোমরা ইগনোর কর।' অথচ জাতীয় নিরাপত্তার সুস্পষ্ট বিধান হলো, রাষ্ট্রীয় সীমানার ভেতর থেকে কেউই এ ধরনের রেডিও সিগন্যাল আদান-প্রদান করতে পারবে না।' বলল সোফিয়া সুসান।

'মিস সুসান, আপনি কি নৌবাহিনীতে চাকুরী করেন?' বিস্মিত কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসা।

'হ্যাঁ, নৌবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন আমি।' সুসান বলল।

'সাও তোরাহ সম্পর্কে আর কোন তথ্য আপনার কাছে আছে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'আর কিছু জানি না। কেন এ কথা জিজ্ঞেস করছেন?' সুসান বলল।

আহমদ মুসা একটু দ্বিধা করল, তারপর বলল, 'আমি মনে করি বিষয়টা আপনাকে অবশ্যই জানানো যায়।' কথা শেষ করল। একটা দম নিল আহমদ মুসা। তারপর বলল, 'আমি সাও তোরাহ দ্বীপে যেতে চাই। আমার নাম যখন জানেন তখন এটা নিশ্চয় জানেন যে, WFA আমার পুরনো শত্রু।'

'কিন্তু শত্রুতার জন্যে সাও তোরাহ দ্বীপে কেন?' জিজ্ঞাসা সুসানের।

‘সাও তোরাহ দ্বীপে এখন আজর ওয়াইজম্যানকে পাওয়া যাবে। এছাড়া বিশেষ কারণও আছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘আপনার সম্পর্কে যতদূর আমাদের জানা আছে তাতে আজর ওয়াইজম্যানকে খোঁজার জন্যে বা হত্যার জন্যে আপনি সাও তোরাহ নিশ্চয় যাবেন না। তাহলে দেখা যাচ্ছে বিশেষ কারণটাই আসল কারণ এবং সেটা ছোট কারণ নয়। কৌতূহল হচ্ছে জানার। আর আপনি আপনার সাথীকে ওদের কোন ঠিকানা বা মিনি-সাব সম্পর্কে কিছু পাওয়া যায় কিনা দেখতে বললেন। সাও তোরায় ওদের ঠিকানা জানেন আপনি। আবার ঠিকানা দেখা কেন? মিনি-সাব মানে মিনি-সাবমেরিনের ব্যাপারটা কি?’ সোফিয়া সুসান বলল।

‘মিনি সাবমেরিন ওদের গোপন বাহন। এ বাহনে চড়ে তারা সাও তোরাহসহ বিভিন্ন গোপন মিশনে যাতায়াত করে। ওদের ঠিকান খুঁজছি কারণ সাও তোরাহ যাবার জন্যে ওদের গোপন বাহন মিনি সাব-এর সন্ধান লাভ।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা থামতেই সোফিয়া সুসান বলে উঠল, ‘আর সাও তোরায় যাওয়ার কারণটা কি?’

‘আমি বিদেশী। আমি সাও তোরাহ দ্বীপে কোন সময় যাইনি। সাও তোরাহ দ্বীপে কি হচ্ছে আমি যদি বলি বিশ্বাস হবে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘আপনি বললে বিশ্বাস হবে। আমি আপনাকে জানি। আপনি চেগুয়েভারা, মাওসে তুং ও লেনিনের মত একজন বিপ্লবী। কিন্তু তাদের মত উদ্দেশ্য সাধনের জন্যে আপনি ষড়যন্ত্র, মিথ্যাচার, প্রতারণা, খুন, ইত্যাদিকে বৈধ মনে করেন না। আপনার বিপ্লব আপনার স্বার্থে বা কোন জাতির স্বার্থে নয়, এক পরম সত্তার স্বার্থে যিনি সব মানুষের ¯্রষ্টা এবং যিনি সব মানুষকে ভালবাসেন ও প্রতিপালন করেন। আপনার বিপ্লব দেশ-ভাষা-বর্ণ নির্বিশেষে মানুষের মঙ্গলের জন্যে। সুতরাং এতে কোন জিঘাংসাবৃত্তি নেই, অহেতুক রক্তপাত নেই, তাড়াহুড়া নেই এবং সব জান্তা, সব বোদ্ধার রূপ নিয়ে, সবার অধিকর্তা হয়ে চেপে বসার অহমিকাও নেই।’ কথা শেষ করল সোফিয়া সুসান। কণ্ঠে তার আবেগের আভাস, চোখ দুটি তার উজ্জ্বল।

বিস্ময় ফুটে উঠেছে আহমদ মুসার চোখে-মুখে। আজোরস সেনাবাহিনীর একজন ক্যাপ্টেন একটি মেয়ে এই কথাগুলো কিভাবে বলতে পারল! দীর্ঘ ও গভীর পর্যবেক্ষণ ছাড়া যে মন্তব্য করা যায় না, সে মন্তব্য তরুণীর মুখে এল কি করে! বলল আহমদ মুসা মেয়েটিকে লক্ষ্য করে, 'এটা আপনার মূল্যায়ন?'

হাসল মেয়েটি। বলল, 'বিশ্বাস হচ্ছে না? আমারও বিশ্বাস হচ্ছে না যে, আহমদ মুসা এমন অল্প বয়সের, এমন ভদ্রলোক গোছের এবং সিনেমার নায়কসুলভ চেহারার এমন একজন মানুষ হবেন। তবে হ্যাঁ, আপনার মিশনের সাথে আপনাকেই মানায়।'

বলে একটু থামল সোফিয়া সুসান। আবার বলতে শুরু করল, 'আপনার অবিশ্বাস ঠিক। এ মূল্যায়ন আমার নয়। কয়েকদিন আগে আমাদের নেভাল হেড কোয়ার্টারে, কনটেমপোরারি চেনজেস ইন রেভুলুশনারী থিংকিং এন্ড ফিউচার ষ্ট্রাটেজী ফর ন্যাশনাল ডিফেন্স' শীর্ষক বিষয়ের উপর আন্ত ঃ প্যাসেফিক একটি সেমিনার অনুষ্ঠিত হয়। এই সেমিনারের সবচেয়ে মূল্যবান বক্তা ছিলেন মার্কিন সেনাবাহিনী প্রধান জেনারেল রোনাল্ড ওয়াশিংটন। তাঁর মূল্যায়নই আমি আমার মত করে আপনাকে বললাম।'

'আপনি যা বললেন, মানে আপনি যে মুল্যায়ন কোট করলেন তাকি আপনি বিশ্বাস করেন?' বলল আহমদ মুসা।

'বিশ্বাস না করলে মনে রাখতাম না, বলতামও না। জানেন, তাঁর বক্তৃতা শোনার পর আমি আপনার সম্পর্কে সব ইনফরমেশন নতুন করে পড়েছি। তাতে বিশ্বাস আমার আরও দৃঢ় হয়েছে এবং আপনাকে দেখার একটা প্রবল ইচ্ছা আমার মধ্যে সৃষ্টি হয়েছিল। আমার সে ইচ্ছাও আজ পূর্ণ হলো। ঈশ্বরকে ধন্যবাদ।' সোফিয়া সুসান বলল।

'জেনারেল ওয়াশিংটন তাদের দেশের পলিসি সম্পর্কে কিছু বলেছিলেন?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'তিনি অনেক কথা বলেছিলেন। নোট দেখলে সব কথা বলতে পারব। তবে গুরুত্বপূর্ণ একটা কথা আমার মনে আছে। সেটা হলো, বিশ বছর আগে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার লিবার্টি ও ডেমোক্র্যাসি ধ্বংসের বিষয়। তিনি

বলেছিলেন, এই টুইন টাওয়ার ধ্বংসের জন্যে মুসলিম মৌলবাদী ও আল-কায়েদার সদস্যদের ওপর দোষ চাপিয়েছিলাম আমরা। এটা এখন আর প্রশ্নাতীত নয় বলে আমরাও মনে করি। আহমদ মুসাও এর অনুসন্ধান কাজে জড়িয়ে পড়েছে বলে জানতে পেরেছি। আমরাও এ ব্যাপারটাকে খতিয়ে দেখছি। মনে হচ্ছে বিশ বছর আগে আমরা যাকে সত্য বলে ধরে নিয়েছিলাম, সেটা পাল্টে যাবে। এমনও হতে পারে, আমাদের মেরিল্যান্ড অংগরাজ্যের 'নিউ হারমান'-এর সাম্প্রতিক গণহত্যার মতই আর এক কাহিনী হয়ে দাঁড়াবে নিউইয়র্কের টুইনটাওয়ার ধ্বংসের ঘটনা।' জেনারেল ওয়াশিংটনের এই উক্তি বলতে পারেন- আমার পিলে চমকে দিয়েছে।' বলল সোফিয়া সুসান।

'এমন সাংঘাতিক তথ্য, এত বড় একটা খবর কোন পত্রিকায় কিন্তু আসেনি!' আহমদ মুসা বলল।

'সেমিনারের গোটা বিষয়ই ছিল অফ দ্যা রেকর্ড। কোন সাংবাদিককে ডাকা হয়নি। কোন প্রেস রিলিজও করা হয়নি। বাছাই করা ডেলিগেটরাই শুধু শ্রোতা ছিলেন। আমি ষ্ট্রাটেজিক কমান্ডো ইউনিটের একজন কমান্ডার হিসাবে ডেলিগেট ছিলাম।' বলে একটু থেমেই আবার শুরু করল, 'দেখুন, আমি শুধু আপনার প্রশ্নের জবাব দিয়ে যাচ্ছি। আমার প্রশ্নের জবাব দিন। আপনি কেন যেতে চান সাও তোরায়?'

'সাও তোরাহ একটা বন্দীশালা। ওখানকার নিরপরাধ বন্দীদের উদ্ধার করতে চাই এবং তার মাধ্যমে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের হোতাদের সন্ধান ত্বরান্বিত করতে চাই।' বলল আহমদ মুসা।

'কি বলছেন আপনি? সাও তোরাহ দ্বীপ বন্দীশালা? কাদের বন্দীশালা? কিসের বন্দীশালা? আর সে বন্দী উদ্ধারের সাথে টুইনটাওয়ারের কি সম্পর্ক?' সোফিয়া সুসান বলল। উত্তেজিত কণ্ঠ তার।

'আপনি যত প্রশ্ন করেছেন, তার উত্তর দিতে হলে ইতিহাস বলতে হয়। আজর ওয়াইজম্যান..................।'

কথা শেষ করতে পারল না আহমদ মুসা। ভিক্টর রাইয়ার দুহাত ছিল তার কোটের দুই পকেটে। আকস্মিক তার দুহাত বেরিয়ে এসেছে দুই রিভলবার নিয়ে।

বিদ্যুতবেগে তার ডান হাত উঠে এসেছে আহমদ মুসার প্রতি। তার ডান হাত গুলী বর্ষণ করেছে আহমদ মুসার লক্ষ্যে। শুরুতেই ব্যাপারটা নজরে পড়েছিল সোফিয়া সুসানের। ‘কি করছেন আব্বা আপনি’ বলে সোফিয়া সুসান বাধা দেয়ার ভংগিতে দুহাত বাড়িয়ে তার পিতা ও আহমদ মুসার মাঝখানে ছুটে গিয়ে দাঁড়াল। কিন্তু ততক্ষণে ভিক্টর রাইয়া তার রিভলবারের ট্রিগার টিপে ফেলেছে। গুলী গিয়ে আঘাত করল সোফিয়া সুসানের কাঁধে। তার কাঁধে বিদ্ধ না হলে গুলীটা আহমদ মুসার বাম বুকে গিয়ে আঘাত করতো।

সোফিয়া সুসান গুলী বিদ্ধ হওয়ায় ভিক্টর রাইয়া চমকে উঠে থমকে গিয়েছিল এবং রিভলবার ধরা তার ডান হাতটা নিচে নেমে গিয়েছিল। কিন্তু পরমুহূর্তেই তার চোখ দুটি জ্বলে উঠেছিল এবং তার বাম হাতের রিভলবার একটু নড়ে উঠে আহমদ মুসাকে তাক করেছিল। তার তর্জ্জনি ট্রিগারে চেপে বসছিল। কিন্তু ট্রিগারটি ফায়ার লেভেলে পৌছার আগেই সিঁড়ির দিক থেকে ছুটে আসা একটি গুলী তার রিভলবারকে বিদ্ধ করল। তার হাত থেকে ছিটকে পড়ে গেল রিভলবার।

মুহূর্তের জন্যে থমকে গিয়েছিল ভিক্টর রাইয়া। কিন্তু নিমিষেই তার হাতের রিভলবার উপরে উঠে এল। আবার লক্ষ্য আহমদ মুসা।

গুলীবিদ্ধ হয়ে বসে পড়া সোফিয়া সুসানকে তখন পরীক্ষা করছিল সে, গুলী তার কোথায় লেগেছে।

সোফিয়া সুসান দেখতে পেয়েছিল তার পিতার ডান হাতের রিভলবার উঠে আসা। চিৎকার করে উঠেছিল, ‘মি. আহমদ মুসা গুলী।’

কিন্তু এবারও গুলী করতে পারল না ভিক্টর রাইয়া। এবার দ্বিতীয় আরেকটা গুলী সিঁড়ির দিক থেকে ছুটে এসে ভিক্টর রাইয়ার ডান হাতের রিভলবারকে আঘাত করল। আগের মতই তার হাত থেকে ছিটকে পড়ল রিভলবার।

সিঁড়ির দিক থেকে দুটি গুলীই করেছিল হাসান তারিক। সে সার্চ করছিল WFA এর লোকদের লাশ। সোফিয়া সুসানের চিৎকার ও গুলীর শব্দে ফিরে তাকিয়েছিল সোফিয়া সুসানের দিকে। আঁৎকে উঠেছিল অবিশ্বাস্য ঘটনা দেখে।

দ্রুত তার হাত পকেট থেকে বের করে এনেছিল তার রিভলবার। তার ছোঁড়া দুই গুলী ব্যর্থ করে দিয়েছিল আহমদ মুসাকে হত্যার ভিক্টর রাইয়ার শেষের দুই উদ্যোগকে। আর প্রথম উদ্যোগ ব্যর্থ করে দিয়েছিল সোফিয়া সুসান গুলীটাকে নিজের দেহে ধারণ করে।

ভিক্টর রাইয়া ডান হাতে গুলী খেয়েও বাম হাতে আবার তার হাত থেকে ছিটকে পড়া রিভলবারটা তুলতে যাচ্ছিল।

'পলা তুমি মিস সুসানকে দেখ' বলেই আহমদ মুসা সুসানকে ছেড়ে দিয়ে দ্রুত হামাগুড়ি দিয়ে এগিয়ে ভিক্টর রাইয়ার আগেই মেঝেয় পড়ে থাকা রিভলবার দুটি তুলে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। বলল দ্রুত কণ্ঠে, 'হাসান তারিক তুমি দেখ, মিস সুসানকে দ্রুত কোন হাসপাতালে নেয়ার ব্যবস্থা করতে হবে।'

পলা জোনসের গায়ে হেলান দিয়ে বসে মিস সুসান বলল, 'থ্যাংকস মি. আহমদ মুসা। আমি সামরিক হাসপাতালে যাব। পলা আমাকে সেখানে নেবে। বাইরেই গাড়ি আছে অসুবিধা হবে না। আমি সেখান থেকেই থানায় জিডি করব যে, আমার পিতার সাথে বন্ধুত্বের সুযোগ নিয়ে ডেভিড ইয়ামিন গোয়েন্দা কর্মী পলা জোনসকে অসৎ উদ্দেশ্যে বেজমেন্ট কক্ষে নিয়ে এসেছিল। টের পেয়ে আমি ছুটে আসি। ডেভিড ইয়ামিনসহ ওদের পাঁচজনকে আমি হত্যা করি। ওদের একজন আমাকে আহত করে পালিয়ে যায়। ঘটনাটা এভাবে সহজেই মিটে যাবে।'

'থ্যাংকস মিস সুসান।' বলে আহমদ মুসা তাকাল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, 'মি. ভিক্টর রাইয়া, আমি আপনার বা আপনার দেশ আজোরস-এর এমন কোন ক্ষতি করিনি যে, আমাকে খুন করার জন্যে আপনি এমন মরিয়া হয়ে উঠবেন।'

চোখে-মুখে একটা বিমূঢ় ভাব নিয়ে দাঁড়িয়েছিল ভিক্টর রাইয়া। আহমদ মুসার কথায় তার মুখে আবার কঠোরভাব ফিরে এল। শক্ত কণ্ঠে সে বলল, 'টেরসিয়েরা দ্বীপের সিলভার ভ্যালিসহ বিভিন্নস্থানে দুডজনেরও বেশি খুনের জন্যে তুমি দায়ী।'

আহমদ মুসা হাসল। বলল, ‘এ ব্যাপারে কোন মামলা হয়নি, তদন্তও হয়নি। তদন্ত হলে এ হত্যাকান্ডের জন্যে দায়ী হবে WFA এবং তাদের ভাড়া করা গুন্ডারা। সুতরাং এ কথা সত্য নয় যে, এ কারণেই আপনি আমাকে খুন করতে চান।’

‘ছেড়ে দিন এ প্রসংগ মি. আহমদ মুসা। আমার আব্বা নরম ও সরল মনের মানুষ। WFA তার কান ভারী করে রেখেছে।’ বলল মিস সুসান।

‘আমি দুঃখিত সুসান। তুমি যাকে বাঁচাবার জন্যে এত ঘটনা ঘটালে, যার জন্যে হয়তো আমি আমার একমাত্র মেয়ের হত্যাকারীতে পরিণত হতাম, সেই আহমদ মুসাকে তুমি কতটা চিন!’ ভিক্টর রাইয়া বলল।

‘আব্বা, কাউকে সারা জীবন দেখেও চিনা যায় না, আবার কাউকে একবার দেখেই সারা জীবনের চেনা হয়ে যায়। আহমদ মুসা এই শেষ শ্রেণীর মানুষ।’ বলল সুসান। আবেগে ভারী হয়ে উঠল তার কণ্ঠ।

কথা শেষ করেই থেমে তাকাল পলা জোনসের দিকে। বলল, ‘চলো পলা।’

সুসানের কথা শেষ হতেই আহমদ মুসা তাকাল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, ‘ওর একা যাওয়া আমি ঠিক মনে করছি না। আমরা ওদের ফলো করতে চাই।’

‘যেতে পারেন আপনারা। আমি যাচ্ছি ওদের সাথে।’ বলল ভিক্টর রাইয়া।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের হাতে তখনও রিভলবার। আহমদ মুসা বলল, ‘আমরা আমাদের রিভলবার পকেটে রাখতে পারি মি. ভিক্টর রাইয়া?’

‘মি. আহমদ মুসা আপনার সাথে আমার কোন ব্যক্তিগত শত্রুতা নেই। কিন্তু রাষ্ট্রের একজন অফিসার হিসেবে উপরের ইচ্ছা অনুসারে আমাকে চলতে হয়।’ গম্ভীর কণ্ঠে বলল ভিক্টর রাইয়া।

‘আমাকে হত্যা করা কি উপরের নির্দেশ?’ আহমদ মুসা বলল।

‘তা নয়। আজর ওয়াইজম্যান আমার বন্ধু। তাকে সাহায্য করা আমার একটা দায়িত্ব। আমার চোখের সামনে তাদের লোকদের হত্যা করে তাদের বন্দীদের ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছো তুমি। এর জবাব আমাকে দিতে হবে।’

‘বুঝেছি মি. ভিক্টর রাইয়া।’ বলে আহমদ মুসা তার রিভলবার ভিক্টর রাইয়ার দিকে তাক করে বলল হাসান তারিককে, ‘তুমি একে পিছমোড়া করে বেঁধে মুখে কাপড় গুঁজে দাও, যাতে চিৎকার করতে না পারে।’

সংগে সংগে হাসান তারিক এগিয়ে এসে একটানে ভিক্টর রাইয়ার গায়ের সার্ট ছিড়ে ফেলল। তার দুটা অংশ দিয়ে ভিক্টর রাইয়ার হাত-পা পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল। তারপর অবশিষ্ট অংশ ভিক্টর রাইয়ার মুখে গুঁজে দিল।

দুচোখ ছানাবড়া হয়ে গিয়েছিল ভিক্টর রাইয়ার। অভাবিত আকস্মিকতায় বিমূঢ় তার চেহারা, বিস্ময় সোফিয়া সুসানের চোখে-মুখেও।

আহমদ মুসা সোফিয়া সুসানের দিকে চেয়ে বলল, ‘এখন আপনার আব্বা আজর ওয়াইজম্যানের কাছে বলতে পারবেন এবং উপরে রিপোর্ট দিতে পারবেন যে, সন্ত্রাসীরা আগেই আমাকে বন্দী করে। কেউ যাতে জানতে না পারে এ জন্যে সাথে নিয়ে গিয়ে ঐ মর্মান্তিক ঘটনা ঘটিয়ে পলা জোনসকে মুক্ত করে। হঠাৎ সামনে এসে পড়ায় সোফিয়া সুসানকেও গুলী করে। পলা জোনসই তার বন্ধু সোফিয়া সুসানকে হাসপাতালে পৌছায়।’

বিস্ময় ও অস্থিরতার একটা মেঘ কেটে গেল সোফিয়া সুসানের চোখ-মুখ থেকে। তার মুখে হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘ধন্যবাদ আহমদ মুসা। আমার পিতাকে আপনি বিপজ্জনক এক পরিস্থিতি থেকে বাঁচালেন। এত দ্রুত এত দূরের কথা আপনি ভেবেছেন!’

কথা শেষ করে একটু থেমেই আবার বলল, ‘তাতো হবেই। আপনি তো আহমদ মুসা।’ এবার বিমুগ্ধ গম্ভীর কণ্ঠ তার।

কোন কথা না বলে আহমদ মুসা হাসান তারিককে লক্ষ্য করে বলল, ‘আমি গিয়ে বাইরের অবস্থা দেখি। পলা জোনস মিস সুসানকে নিয়ে আসবে। তুমি ওদের সাহায্য কর।’

বলে আহমদ মুসা হাঁটতে উদ্যত হলো।

এ সময় পলা জোনস হঠাৎ দ্রুত কণ্ঠে বলে উঠল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, 'ভাইয়া একটা খবর। আমি ওদের কথোপকথনে শুনেছি, শেখুল ইসলাম ড. আহমদ মুহাম্মাদ নামের এক গুরুত্বপূর্ণ বন্দীকে আজ রাতে ওরা সাও তোরাহ নিয়ে যাচ্ছে।'

'কি নাম বললে শেখুল ইসলাম ড. আহমদ মুহাম্মাদ?' বলল আহমদ মুসা। তার কণ্ঠে অপার বিস্ময়। চোখে-মুখে বেদনার একটা ঝলক।

'কে উনি? চিনেন তাঁকে?' জিজ্ঞাসা পলা জোনসের।

'হ্যাঁ। তিনি মিসরীয়। তবে উচ্চ শিক্ষা লাভ করেছেন সউদী আরবে। কিন্তু কর্মক্ষেত্র তার গোটা দুনিয়া। গ্রেট মুসলিম মিশনারী তিনি। দুনিয়া মন্থন করা জ্ঞানসমৃদ্ধ একজন সুযোগ্য তার্কিক এবং যাদুকরী বক্তা। লাখো মানুষ মুসলমান হয়েছে তার কথা শুনে। সম্প্রতি মুসলমানদের ঐক্যবদ্ধ করার কাজে মনোনিবেশ করেছিলেন।'

একটু থামল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই আবার বলে উঠল, 'আর কি শুনেছ তার সম্বন্ধে?'

'হার্তা হয়ে আজ তাকে সাও তোরাহ নিয়ে যাওয়া হবে। তারা বলছিল এই একই সাথে যদি আপনাকেও তারা সাও তোরাহ নিয়ে যেতে পারত! এই আশাতেই আপনার ঠিকানা জানার জন্যে তারা আমার উপর চরম জুলুম শুরু করেছিল।' বলল পলা জোনস।

আহমদ মুসা ঘড়ির দিকে তাকাল। তারপর তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'হাসান তারিক ওদের হাসপাতালে পৌছে দিয়ে সেই উপত্যকায় আমাদের আবার যেতে হবে। আমাদের সন্দেহের পরীক্ষাটাও হয়ে যাবে। ঠিক আছে তুমি এঁদের বাইরে নিয়ে এস।'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত পা চালাল সিঁড়ির দিকে।

সামরিক হাসপাতালের গেটে মিস সোফিয়া সুসান, তার পিতা ভিক্টর রাইয়া ও পলা জোনসকে পৌছে দিয়ে আহমদ মুসা বিদায় চাইল মিস সুসানদের কাছে।

মিস সুসান অনেকখানি যন্ত্রণাকাতর হয়ে পড়েছে। সে নিষ্পলক তাকিয়েছিল আহমদ মুসার দিকে। আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই মিস সুসান বলল, 'মি. আহমদ মুসা আপনারা আসুন। নিশ্চয় এই হাসপাতালেই আবার ফিরছেন। আমরা অপেক্ষা করব। আর একটা কথা, আমার অনুমান যদি ভুল না হয় তাহলে বুঝব, আপনারা ড. আহমদ মুহাম্মাদের সন্ধানে যাচ্ছেন। হার্তা হয়ে তাকে নেবার পথে যদি বাধা দেয়া যায় এই আশায়। গড ব্লেস ইউ। একটা কথা বলি, তাকে নিশ্চয় ওরা জলপথেই নেবে। তবে কোন দ্বীপের কোন বন্দর তাদের ব্যবহার করতে দেখা যায়নি। এই কিছুক্ষণ আগে মিনি-সাব এর কথা আপনার মুখ থেকে শুনলাম। আমিও জানি মিনি-সাব তারা ব্যবহার করে। এ পারমিশনও তারা নিয়ে রেখেছে। আমার মনে হয় তাদের গোপন কাজে তারা মিনি সাবই ব্যবহার করে। মিনি সাবেই নিশ্চয় তারা ড. আহমদ মুহাম্মাদকে পাচার করবে। কিন্তু কি করে আপনারা মিনি সাব-এর সন্ধান পাবেন?' দুর্ভাগ্য আমি আপনাদের সাহায্য করতে পারলাম না।' বড় ক্লান্ত শোনাল সোফিয়া সুসানের কণ্ঠস্বর।

'ধন্যবাদ মিস সুসান। আপনার কাছ থেকে জীবন বাঁচাবার মত অমূল্য সাহায্য আমরা পেয়েছি। আল্লাহ আপনাকে দ্রুত সুস্থ করুন। সকলকে ধন্যবাদ।' বলে আহমদ মুসা তার গাড়ির দিকে পা বাড়াল।

তার পেছনে হাসান তারিক।

মিস সুসানদের তিন জনের দৃষ্টিই আহমদ মুসাদের দিকে নিবদ্ধ।

ভিক্টর রাইয়ার চোখেও সপ্রশংস দৃষ্টি। গাড়ির খোলা দরজা দিয়ে মিস সুসান তাকিয়ে আছে। তার চোখে উদাস এক দৃষ্টি।

ষ্টার্ট নিয়ে যাত্রা শুরু করেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

পলা জোনস এক সময় তার চোখ ফিরিয়ে নিয়ে তাকাল সোফিয়া সুসানের দিকে। বলল, 'অদ্ভুত লোক আমার এই নতুন ভাইয়া। সাধারণ দৃষ্টিতে তিনি মুসলিম স্বার্থের একজন সেভিয়ার, কিন্তু কার্যত তিনি সব মানুষের স্বার্থের পক্ষে কাজ করেন।'

সংগে সংগে কথা বলল না সোফিয়া সুসান। তারও গাড়ি চলতে শুরু করেছে। চালাচ্ছে সোফিয়ার আব্বা ভিক্টর রাইয়া।

সোফিয়া সুসানের উদাস দৃষ্টি তখনও বাইরে নিবদ্ধ। ধীরে ধীরে বলল সে, 'সুযোগ পেলে অনেকেই উপকার করতে পারে, শক্তি ও বুদ্ধি থাকলে যে কেউ লড়াইয়ে জিততেও পারে। কিন্তু তাঁর মত প্রশান্ত চোখ আমি কোথাও দেখিনি। সৌন্দর্যের হৃদয় সয়লাবী মাদকতা সেখানে কোন সামান্য চাঞ্চল্যেরও সৃষ্টি করে না। চোখ দুটি যেন অতলান্ত এক সাগর। কোন ঢেউ সেখানে কোনদিন উঠেছে বলে মনে হয় না। এরাই শত সাধনার সূর্যোদয়।'

হাসল পলা জোনস। বলল, 'অবাক করলে, তোমার মত শক্ত মেয়েকে তো এমন আত্মহারা হতে কোনদিন দেখিনি! দেখছি, ভাইয়াকে আবার নতুন করে দেখতে হবে।'

সোফিয়া সুসানও হাসল। বলল, 'বলেছি না, শত বছরের চেনা এক দন্ডেই হয়ে যায়, আবার শত বছর দেখেও চেনা হয় না।' কথা হাসি দিয়ে শুরু করলেও শেষে কণ্ঠ ভারী হয়ে উঠল তার।

কিছু বলতে যাচ্ছিল পলা জোনস। তার আগেই কথা বলে উঠল সামনের ড্রাইভিং সিট থেকে ভিক্টর রাইয়া, 'সামরিক হাসপাতালে যাওয়ার সোজা পথটা ভাল নয়, একটু ঘুরা পথেই যাচ্ছি। তুমি বেশি কথা বলো না মা সুসান। আরও দূর্বল হয়ে পড়বে।'

'ঠিক বলেছেন স্যার।' বলে পলা জোনস সুসানের রক্তক্ষরণ আরও কমিয়ে দেবার জন্যে সোফিয়া সুসানের আঘাতপ্রাপ্ত স্থানটা আর একটু চেপে ধরল।

সান্তাসিমা উপত্যকার পাথুরে জেটিতে পা রেখেই পেছন থেকে হাসান তারিক বলে উঠল, আপনি কি করে নিশ্চিত হলেন ভাইয়া যে, শেখুল ইসলামকে ওরা এ পথেই নিয়ে যাবে। আমরা এখানে বসেই নিশ্চিতভাবে তার সন্ধান পাব।'

আহমদ মুসা পেছনে না ফিরে তার হাঁটা অব্যাহত রেখে বলল, 'গোটা হারতায় সান্তাসিমা উপত্যকার বাইরে সন্দেহ করার মত দ্বিতীয় জায়গা নেই বলেই এখানে এলাম।'

পাথুরে জেটির এক প্রান্তে একখন্ড পাথরের উপর দুজনে বসল।

বসেই আহমদ মুসা বলল, 'আমাদের সর্বোৎকৃষ্ট যা করণীয় ছিল, তা আমরা করলাম। এখন ভবিষ্যত আল্লাহর হাতে।'

'আল্লাহ আমাদের সফল করুন।' বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। তার দুটি চোখ চাঁদের তরল আলো প্লাবিত সাগরের শান্ত বুকে নিবদ্ধ।

হাসান তারিকের চোখও গিয়ে পড়ল সেই সাগরের বুকে।

সময় বয়ে চলল পল পল করে।

জমাট নিরবতা চারদিকে।

এই নিরবতারও একটা ভাষা আছে।

এই ভাষায় কথা হয় বনানীর সাথে মাটির। মাটির সাথে সাগরের এবং সাগরের সাথে আকাশের।

নিঃশব্দ কথার এই মহোৎসবে আহমদ মুসা এক সময় শব্দ করে উঠল। বলল, 'অন্ধকার ও নিঃশব্দতা এক অবিভাজ্য সত্তা। এই সত্তার রাজত্ব গোটা আকাশ জুড়ে। আকাশের মত শত কোটি তারার দ্বীপ সেখানে আলো জ্বালায় না। আলোকিত করে মানুষের পৃথিবীর মত পৃথিবীকে, প্রতিবিম্বিত হয় শুধুই মানুষের চোখে। পৃথিবীর আলো এবং মানুষ শব্দ ও সচলতারূপী জীবনের প্রতীক। পৃথিবীর দিন তাই আজকের জানা বিশ্ব-চরাচরের একমাত্র জীবন। এই পৃথিবীর প্রতিটি রাত আবার অন্ধকার ও নিঃশব্দ মহাকাশের সাথে হয় যায় একাকার, হয়ে দাঁড়ায় একখন্ড মৃত্যুর প্রতিবিম্ব। আমাদের এই পৃথিবীতে জীবন-মৃত্যুর এই খেলা চলছে প্রতিদিন। জীবন-মৃত্যুর দুই রূপ প্রতিদিনই মুর্তিমান হয়ে আভির্ভুত হচ্ছে আমাদের চোখের সামনে। কিন্তু আমরা মানে মানুষদের অনেককেই দিনের জীবন যতটা বিমুগ্ধ করে, রাতের মৃত্যু মহড়া ততটা ভীত করে না।'

‘কিন্তু ভাইয়া, মানুষ মৃত্যুকে ভয় করে বলেই জীবনকে তারা বেশি ভালবাসে।’ বলল হাসান তারিক।

‘তোমার কথা দৃশ্যত ঠিক হাসান তারিক। কিন্তু এটা শেষ কথা নয়। মৃত্যুকে সত্যিই ভয় করলে জীবনকে ভালবাসা তাদের বেহিসাব হতে পারতো না। জীবনকে ভালবাসা ভাল, কিন্তু বেহিসাব হওয়া দোষের। জীবন সম্পর্কে বেহিসাব হওয়ার অর্থ মৃত্যু বা পরকাল সম্পর্কে বেহিসাব হওয়া এবং এই চরিত্র মানুষকে স্বৈরাচারী ফেরাউন করে তোলে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘জীবনকে হিসেবী করার এবং বেহিসাবী না করার ভেদ রেখা সবার জন্যে সহজ নয় ভাইয়া।’ বলল হাসান তারিক।

‘হালাল উপার্জন কোনটা, কে না জানে বলত? মানুষকে ভালবাসা উচিত, নিজসহ কারো অধিকার হরণ না করা কর্তব্য, জীবন পরিচালনা সম্পর্কে মৌলিক বিধান দেয়ার অধিকার একমাত্র স্রষ্টার এবং তা মান্য করা সকলের জন্যে অপরিহার্য- এই কথাগুলো কে না জানে? ইসলাম তো এ কথাগুলোরই সমষ্টি। জীবন পরিচালনা সম্পর্কে এই সব বিধি-বিবেচনাই তো হিসাব-বেহিসাবের ভেদরেখা।’

তাদের অনুচ্চ কণ্ঠের এই ভারী আলোচনা চলতেই থাকল। এক সময় আপনাতেই তা বন্ধ হয়ে গেল। তাদের দুজনেরই চোখ গিয়ে নিবদ্ধ হলো সামনের জোৎ¯œা¯œাত জলরাশীর উপর।

চাঁদ তখন মাথার উপরে। মাথার উপরের চাঁদ যেন শান্ত সাগরের পানিতে নেমে আসা রূপালী স্বর্গ।

সাগরের বুক থেকে হাসান তারিকের চোখ এক সময় ফিরে তাকাল তার ঘড়ির দিকে। দেখল রাত তিনটা বাজে।

ঘড়ি থেকে চোখ সরিয়ে নিয়ে অনেকটা স্বগতোক্তির মতই বলল, ‘শেখুল ইসলামকে সাও তোরায় নিয়ে যেতে ওরা এখানে আসবে কেন ভাইয়া?’

আহমদ মুসা কথা বলে উঠল, ‘কেন জানি না। তবে তথ্য যেটা জানা গেছে সেটা হলো, ওদের রুট এখন হারতা হয়ে সাও তোরাহ। রুট হারতা হয়ে যাওয়ার অর্থ হারতা ওদের একটা ষ্টেশন। ষ্টেশনে কি হয়? নামা-উঠা হয়। এই

বিবেচনা থেকে আমরা বলতে পারি, হারতার কোথাও এসে ওরা নামবে, তারপর হারতা থেকে তাদের নতুন যাত্রা হবে সাও তোরাহ দ্বীপে।'

'কিন্তু হারতার সেই ষ্টেশনটা যে এই সান্তাসিমা উপত্যকা হবে, সেটা কি একেবারে নিশ্চিত?' আবার জিজ্ঞাসা হাসান তারিকের।

'কেলভিন ও অন্যান্য সূত্রে যা এ পর্যন্ত জানা গেছে তাতে সান্তাসিমাই হয় তাদের সে ষ্টেশন।' বলল আহমদ মুসা।

হাসান তারিক কিছু বলতে যাচ্ছিল।

হঠাৎ আহমদ মুসা তার মুখ চেপে ধরে কথা বন্ধ করে দিল।

হাসান তারিক বিস্ময়ে আহমদ মুসার দিকে চোখ ফিরিয়ে দেখল তার উদগ্রীব দুচোখ চন্দ্রালোকিত সাগরের জলের উপর নিবদ্ধ। সে যেন কিছু দেখছে বিস্ময়ের সাথে।

'কি ভাইয়া?' জিজ্ঞেস করল হাসান তারিক ফিসফিসে কণ্ঠে।

'দেখ সাবমেরিনের পেরিস্কোপ এবং পানির আন্দোলন।' ফিসফিসে কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকও দেখতে পেয়েছে। বিস্ময় ও আনন্দ তার চোখে-মুখে। বলল, 'ভাইয়া একটা সাবমেরিন ভেসে উঠছে।'

'হ্যাঁ, বলে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়িয়ে বলল, 'এস আমরা একটু আড়ালে যাই।'

ওরা দুজনে পেছনের একটা বড় পাথরের আড়ালে চলে গেল।

সাব মেরিনটা ভেসে উঠল। মিনি সাবমেরিন।

পুরোটা ভেসে উঠল না। আধা আধি। মিনি সাবমেরিনের পেরিস্কোপ ও এ্যান্টেনাগুলোসহ সেইলটা মাত্র দেখা যেতে লাগল। গোটা দেহটা পানির তলায়ই রয়ে গেল। মিনি সাবমেরিনটা এগিয়ে এল পাথুরে জেটির দিকে। তার ডুবে থাকা নোজটা একেবারে যেন জেটির ডুবে থাকা গায়ে এসে ঠেকল।

আনন্দে চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেরই। তারা ভাবতে লাগল, এই এখনি মিনি সাবমেরিন পুরোটা ভেসে

উঠবে। খুলে যাবে পিঠের হ্যাচটা। বেরিয়ে আসবে মানুষ। শেখুল ইসলামকে এই মিনি সাবমেরিনেই আনা হচ্ছে সাও তোরাহতে পৌছানোর জন্যে।

কিন্তু না মিনি সাবমেরিনটা ভেসে উঠল না।

পল পল করে বয়ে চলল সময়।

কেটে গেল আধা-ঘণ্টার মত সময়।

এক সময় হঠাৎ সাবমেরিনটা ডুবে গেল। প্রবলভাবে পানি আন্দোলিত হয়ে উঠল। চলে যাচ্ছে মিনি সাবমেরিনটা। পূর্ব দিক থেকে এসেছিল, সেই পূর্ব দিকেই আবার চলে গেল।

স্তম্বিত আহমদ মুসা ও হাসান তারিক। তাদের চোখে-মুখে হতাশার চিহ্ন। তারা খুবই আশা করেছিল শেখুল ইসলামের দেখা তারা পাবে এবং তাকে মুক্ত করার জন্যে কিছু করতে পারবে। ভাবতে লাগল তারা, মিনি সাবমেরিনটা ভেসে উঠল না কেন? তাদের উপস্থিতি কি টের পেয়েছে সাবমেরিনটা! তাদের উপস্থিতি টের পেয়েই কি মিনি সাবমেরিনটা ভেসে না উঠেই চলে গেল! কিন্তু শেখুল ইসলামকে সাও তোরাহ'তে পৌছাবার তাহলে কি হলো! মিশন কি বাতিল করতে পারে? না পরিস্থিতি দেখে ফিরে গেল মিনি সাবমেরিনটা কোন কাজে? ফিরে আসবে কি আবার?

অপেক্ষা করাই ঠিক মনে করল আহমদ মুসা।

অন্ধকারের মধ্যে পাথরে বসে আবার অপেক্ষা করার পালা।

ফিস ফিস করে গল্প চলল আবার।

হাসান তারিক বলল, 'ভাইয়া দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর ১৯৪৮ সালে ফিলিস্তিনে ইহুদীদের ইসরাইল রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগ পর্যন্ত খৃষ্টান ও ইহুদীদের মধ্যে ছিল সাপে-নেউলে সম্পর্কে। তারই একটা প্রকাশ ছিল হিটলারের ইহুদী নিধন। তারা ইহুদীদের বোঝা মাথা থেকে নামাবার জন্যেই ফিলিস্তিনে ইসরাইল রাষ্ট্র চাপিয়ে দিয়ে ইহুদীদের ওখানে পাঠাল। তারপর ইহুদীবাদী ও মুসলমানদের মধ্যে বিরোধ শুরু হলো, আর সখ্যতা গড়ে উঠল খৃষ্টান ও ইহুদীবাদীদের মধ্যে, বিষে করে আরব বিশ্বকে শায়েস্তা করার জন্য। আমার মনে হচ্ছে খৃষ্টান ও

ইহুদীদের মধ্যেকার হানিমুন শেষ হতে যাচ্ছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীদের বিপর্যয় তারই যাত্রা শুরু বলে মনে হয়।'

'তুমি বুঝলেও ইহুদীরা বুঝেনি। তারা মনে করছে, মুসলমানদের সাহায্য ও পরামর্শেই খৃষ্টানরা ইহুদীদের নানা দোষ ত্রুটি ধরছে ও অভিযুক্ত করছে। তাদের নিজেদের ষড়যন্ত্র ও অপকীর্তিই যে তাদের বিপর্যয় ঘটাচ্ছে, সে কথা তারা একেবারেই আড়ালে রাখছে। তারা ভাবছে, মুসলমানদের ঘাড় ভাঙতে পারলেই আবার তারা খৃষ্টানদের মাথায় উঠে বসতে পারবে।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের মাথায় বসে টুইন টাওয়ার ধ্বংসের দায় মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়েও মুসলমানদের মাথা ভাঙতে পারেনি ইহুদীরা। এখন কি পারবে? এখন তো ওরা আত্মরক্ষায় নেমেছে।' হাসান তারিক বলল।

'আত্মরক্ষায় নেমেছে বলছ কেন?' বলল আহমদ মুসা।

'ওরা এখন টুইন টাওয়ার ধ্বংসের কাহিনী ধামাচাপা দিতে সর্বশক্তি নিয়োগ করেছে।' হাসান তারিক বলল।

'ঠিক। কিন্তু সেই সাথে ওরা মুসলমানদের ঘাড় ভাঙারও চেষ্টা করছে। মুসলমানদেরকে ওরা বুদ্ধিবৃত্তিকভাবে নেতৃত্বহীন করার চেষ্টা চালাচ্ছে। সাও তোরাহ দ্বীপে যাদের আটকে রাখা হয়েছে, তাদের মধ্যে জন সাতেককে টুইন টাওয়ার ঘটনার তদন্তের সাথে জড়িত থাকার কারণে আটক করা হয়েছে, অন্যেরা সবাই মুসলিম বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তের মুসলিম বুদ্ধিজীবি নেতা।' বলল আহমদ মুসা।

'কিন্তু ভাইয়া, এভাবে কি একটা জাতির ঘাড় ভাঙা যায়?' হাসান তারিক বলল।

'সেটা ভিন্ন প্রশ্ন। কিন্তু ইহুদীবাদীদের ষড়যন্ত্রের ঘর রক্ষা করতে হলে মুসলমানদের সচেতনতা ও সক্রিয়তা ধ্বংস করতে হবে, এটাই তাদের কাছে বড় কথা।' বলল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করে আহমদ মুসা হঠাৎ মাথা খাড়া করে সোজা হলো। দৃষ্টি তার জ্যোৎ¯œো¯œোত সাগরের বুকে। ফিসফিসে কণ্ঠে বলে উঠল সে, 'হাসান

তারিক আবার সেই পেরিস্কোপ। পানির সেই আন্দোলন। উপকূলের দিকে আসছে একটি সাবমেরিন।'

'মিনি সাবমেরিনটা কি আবার ফিরে এল?' বলল হাসান তারিক।

'হতে পারে। কিন্তু এ আসছে পশ্চিম দিক থেকে।' আহমদ মুসা বলল।

আগের মতই মিনি সাবমেরিনটি ভেসে উঠল। তার 'সেইল' ও এন্টেনাগুলোই শুধু দেখা যেতে লাগল। আধা ভেসে উঠা মিনি সাবমেরিনটি আগের মতই উপকূলের পাথুরে জেটির মুখোমুখি এসে দাঁড়াল। তার ডুবে থাকা নোজটা যেন পাথুরে জেটি স্পর্শ করেছে।

আবার আশান্বিত হলো আহমদ মুসা ও হাসান তারিক। এখনি মিনি সাবমেরিনটি পুরো ভেসে উঠবে এবং তার হ্যাচ খুলে বেরিয়ে আসবে মানুষ।

এই আশায় চলল তাদের অপেক্ষা। কিন্তু অর্ধ ভেসে উঠা মিনি সাবমেরিনটি নিশ্চল দাঁড়িয়ে থাকল। পুরো ভেসে উঠলো না।

উদগ্রীব অপেক্ষার মধ্যে সময় কতটা বয়ে গেল তারা খেয়াল করেনি।

হঠাৎ এক সময় মিনি সাবমেরিন ঝাকুনি দিয়ে উঠল। আন্দোলিত হলো পানি। সরে গেল মিনি সাবমেরিনটি পাথুরে জেটি থেকে। তারপর ঝুপ করে ডুবে গেল তা পানির তলায়। ভেসে থাকল মাত্র পেরিস্কোপটা। দ্রুত চলতে লাগল মিনি সাবমেরিনটা যে দিক থেকে এসেছিল সেই পশ্চিম দিকে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেরই চোখ সেদিকে নিবদ্ধ। চোখে তাদের শূন্য দৃষ্টি। মুখের চেহারায় বোকা বনে যাবার ভাব। মিনি সাবমেরিনটা দুবারই তার চেহারা দেখিয়ে চলে গেল। ভেসে উঠেও আবার উঠল না। উপকূলে ভিড়েও কেউ নামলো না। তাদের কাচকলা দেখানোই কি ওদের উদ্দেশ্য! ওরা কি তাহলে টের পেয়েছে আহমদ মুসারা এখানে! কিন্তু কিভাবে জানবে? ওখানে ওদের কেউ বাঁচেনি যে আমাদের ফলো করবে।

উঠে দাঁড়ালো আহমদ মুসা। হাসান তারিকও।

দুজনে এসে পায়চারী করল গোটা পাথুরে জেটিটায়। যেখানে দুটো সাবমেরিনই এসে দাঁড়িয়েছিল, সেখানে তারা অনেকক্ষণ দাঁড়াল। কিন্তু কিছুই বুঝলো না।

ঘুরে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, ‘চল হাসান তারিক, এখানকার কেচ্ছা শেষ।’

বলে চলতে লাগল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকও।

চলতে শুরু করে হাসান তারিক বলল, ‘কেচ্ছা তো বাকি রইল না ভাইয়া। কেলভিন মারা গেল। ওখানেও কেউ বাঁচলো না। এখানে এসেও কিছু মিলল না। সামনে এগোব আমরা কি করে? শেখুল ইসলামকে তো কোন সাহায্য আমরা করতে পারলাম না।’ হতাশার সুর হাসান তারিকের কণ্ঠে।

‘হতাশ হচ্ছো কেন হাসান তারিক। এখানে এসে বিরাট লাভ করেছি আমরা। প্রমাণ হলো, এটাই মিনি সাবমেরিনের ঘাঁটি। তার উপর আমরা দেখলাম ওদের মিনি সাবমেরিনকে। আজ দেখলাম, কাল ওতে নিশ্চয় আমরা উঠব। সামনে এগুবার পথ নিশ্চয় আল্লাহ করে দেবেন।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাই যেন হয় ভাইয়া।’ বলল হাসান তারিক।

সান্তাসিমা উপত্যকা পেরিয়ে বেরিয়ে এল ওরা।

ঝোপের আড়ালে ওরা গাড়ি লুকিয়ে এসেছিল।

গাড়িতে গিয়ে উঠল আহমদ মুসারা।

তারা গাড়ি ষ্টার্ট দেবার আগেই হঠাৎ তাদের কানে এল আরেকটি গাড়ি ষ্টার্ট দেবার শব্দ।

আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। হাসান তারিক গাড়ি থেকে দ্রুত বেরিয়ে ছুটল রাস্তার দিকে। রাস্তায় গিয়ে যখন সে পৌছল দেখল একটা গাড়ি রাস্তার এ পাশেরই কিছু পশ্চিমের একটা ঝোপ থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে পূর্ব দিকে ছুটল।

হাসান তারিক ছুটল তার গাড়ির দিকে। গাড়িতে উঠে বসতে বসতে বলল আমাদের পাশের ঝোপ থেকে একটা গাড়ি বেরিয়ে পূর্ব দিকে যাচ্ছে।

শুনতেই আহমদ মুসার দুচোখে বিস্ময়ের একটা ঝলক খেলে গেল। কুঞ্চিত হলো তার কপাল। গাড়ি ষ্টার্ট দিতে দিতে সে বলল, ‘আমাদের পাশের ঝোপ থেকে বেরিয়ে এসেছে?’ আহমদ মুসার কণ্ঠেও বিস্ময়।

‘হ্যাঁ ভাইয়া, রাস্তার এ পাশে গজ তিরিশেক পশ্চিমের একটা ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল গাড়িটা।’ বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসার গাড়ি বেরিয়ে এসেছে রাস্তায়। তীর বরাবর সোজা রাস্তায় সে দেখতে পেল সামনের গাড়িটার পেছনের লাল দুটো আলো।

‘ধরতে হবে গাড়িটাকে হাসান তারিক। গাড়িটা আমাদের ফলো করে এখানে এসেছিল কিনা তা দেখতে হবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘না ভাইয়া, গাড়িটা যদি আমাদের ফলো করে এখানে এসে থাকত তাহলে আমরা যাওয়ার আগে সে এভাবে পালাত না। তবে আমার মনে হয় কোন একটা রহস্য আছে, যা আমি বুঝতে পারছি না।’

আহমদ মুসার গাড়ির স্পিডোমিটারের কাঁটা দ্রুত উঠতে লাগল সত্তর থেকে আশি, আশি থেকে একশ। একশ ত্রিশে কাঁটা স্থির হলো।

কাঁপছে গাড়ি। ছুটে চলছে পাগলের মত।

কম্পনরত ষ্টেয়ারিং-হুইলে হাত রেখে সামনে স্থির দৃষ্টি ফেলে স্বগতকণ্ঠে আহমদ মুসা বলল, ‘তুমি ঠিক বলেছ হাসান তারিক। গাড়িটা আমাদের ফলো করে এলে পালাত না। কোন কারণে পালালেও পেছনের আলো জ্বালিয়ে রাখতো না।’

‘আমারও তাই মনে হয় ভাইয়া। কিন্তু ভাইয়া এই ঝোপের আড়ালে গাড়িটা এল কেন?’ বলল হাসান তারিক।

‘সেটাই তো প্রশ্ন। সামনে চল, উত্তর পাওয়া যায় কিনা দেখি।’ আহমদ মুসা বলল।

ঝড়ের বেগে চলছে আহমদ মুসার গাড়ি। সামনের গাড়িটি আগের সেই একই মধ্যম গতিতে চলছে। সামনের গাড়িটার অনেক কাছে চলে এসেছে আহমদ মুসার গাড়ি।

‘আল্লাহর শুকরিয়া। গাড়িটা আমাদের একটুও সন্দেহ করেনি হাসান তারিক।’ বলল আহমদ মুসা।

গাড়িটার একদম পেছনে চলে এসেছে আহমদ মুসার গাড়ি। হঠাৎ গাড়িটার নাম্বারের উপর নজর পড়তেই চমকে উঠল আহমদ মুসা। দ্রুতকণ্ঠে

আহমদ মুসা বলল, 'হাসান তারিক গাড়ির নাম্বারটা দেখ। পলা জোনসকে উদ্ধারের জন্যে মি. ভিক্টর রাইয়ার অফিসে ঢোকার সময় এই গাড়িটা দেখেছিলাম, আবার বেরুবার সময়ও দেখেছিলাম গাড়িটাকে দাঁড়িয়ে থাকতে। আর এটা ভিক্টর রাইয়ার গাড়ি নয় এবং সোফিয়া সুসানের গাড়িও নয়। যদি তাই হয়, তাহলে গাড়িটা অবশ্যই WFA এর হবে।'

থামল আহমদ মুসা। বলল হাসান তারিক, 'ঠিক ভাইয়া, মি. ভিক্টর রাইয়ার হলে সেটা সরকারী গাড়ি হতো। আর মিস সুসানের গাড়িতো আমাদের সাথে হাসপাতালে গিয়েছিল। সুতরাং আপনার অনুমানই ঠিক ভাইয়া।'

আহমদ মুসা কোন কথা বলল না। গাড়ির গতি আকস্মিক আরও বেড়ে গেল। মিনিট দুয়েকের মধ্যেই আহমদ মুসার গাড়ি সামনের গাড়িকে ক্রস করে কিছুটা সামনে এগিয়ে বাঁক নিয়ে গাড়িটাকে ব্লক করে দাঁড়াল।

গাড়িটা আহমদ মুসাদের গাড়িকে পাশ কাটাবার চেষ্টা করে না পেরে দ্রুত ঘুরে পেছন দিকে পালাবার চেষ্টা করল।

হাসান তারিকের পাশের জানালা খোলা ছিল। জ্যাকেটের পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিয়েই হাসান তারিক গুলী করল।

পলায়নপর গাড়িটা তখনও সোজা হয়ে সারেনি। হাসান তারিকের গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল গাড়িটার সামনের চাকার টায়ার। মুখ থুবড়ে পড়ল গাড়িটা।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক গাড়ি থেকে বেরিয়ে ছুটল ঐ গাড়িটার দিকে।

গাড়ির আরোহী বেরিয়ে এসেছিল গাড়ি থেকে। পালাবার জন্যে দৌড় দিয়েছিল। হাসান তারিক ঝাঁপিয়ে পড়ল তার উপর।

মধ্য বয়সী লোকটি। কিন্তু লোকটির ষ্টিল রোবটের মত শক্ত এবং সেরকমেরই শক্তি। তাকে বাগে আনতে সময় লাগল হাসান তারিকের।

অবশেষে আহমদ মুসারা তাকে টেনে তুলল তাদের গাড়িতে।

সময় বেশি নিল না। অল্প দূরেই রাস্তা থেকে নেমে একটা ঝোপের আড়ালে একটা ফাঁকা জায়গায় গাড়ি দাঁড় করাল। গাড়ি থেকে নামাল লোকটিকে।

লোকটিকে দাঁড় করিয়ে গাড়িতে হেলান দিয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

লোকটি রাগে ফুসছিল। দাঁড়িয়েই বলে উঠল, ‘কে তোমরা? আমাকে এভাবে আক্রমণ করার অর্থ কি? কি চাও তোমরা?’

বলে লোকটি তার চোখ আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের দিকে তীক্ষè করল। চাঁদের আলোতেই সে আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে ভালো করে দেখার চেষ্টা করল।

আহমদ মুসা বলল, ‘বেশি কিছু চাই না। সান্তাসিমা উপত্যকায় কি করছিলে, তাই জানতে চাই।’

‘সান্তাসিমা উপত্যকাই আমি চিনি না।’ বলল লোকটি।

‘কেলভিন চিনত, তুমি চিনবে না কেন?’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিল না। তার দুচোখ উঠে এল আহমদ মুসার দিকে। যেন দৃষ্টি আরও তীক্ষè করে আহমদ মুসাকে আরো গভীরভাবে দেখার চেষ্টা করছে। এক সময় বলে উঠল সে, ‘ও, তাহলে আহমদ মুসারাই তোমরা?’

‘আমার প্রশ্নের জবাব দাও।’ গর্জে উঠল আহমদ মুসা।

‘তোমরা আমাদের সর্বনাশের মূল। কোন জবাব তোমরা পাবে না।’ বলল লোকটি দৃঢ় কণ্ঠে।

‘কথা বলাতে আমরা জানি। কেলভিনকেও মুখ খুলতে হয়েছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

লোকটি হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ‘কেলভিন তোমাদের কিছুই বলেনি। বললে আমাকে প্রশ্ন করারই দরকার হতো না।’

আহমদ মুসা তার দিকে রিভলবার তুলে বলল, ‘নষ্ট করার মত সময় আমাদের নেই। বল, শেখুল ইসলাম আহমদ মুহাম্মাদ কোথায়?’

লোকটি আবার হো হো করে হেসে উঠল। বলল, ‘জানি তোমরা কথা বলাতে পার। কিন্তু লাশ তো কথা বলে না।’

বলেই লোকটি তার একটা আঙুল কামড়ে ধরল। কি ঘটছে বুঝতে পারল আহমদ মুসা।

সঙ্গে সঙ্গেই আহমদ মুসা তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল। লোকটির হাত ছিনিয়ে আনল তার মুখ থেকে। কিন্তু দেখল লোকটির আঙুল খালি। নিশ্চয় আংটিটা লোকটির মুখে।

আহমদ মুসা তার মুখে হাত দিতে গিয়ে দেখল মুখ শিথিল। বুঝল, সত্যিই লোকটি লাশ হয়ে গেছে।

উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'হাসান তারিক, পটাসিয়াম সাইনাইডের আংটি ছির তার হাতে। লাশ তো এখন আর কথা বলতে পারবে না। দেখ সার্চ করে কিছু পাও কিনা।'

আহমদ মুসা আবার গিয়ে গাড়িতে ঠেস দিয়ে দাঁড়াল। মনটা খারাপ হয়ে গেছে আহমদ মুসার। মানুষের জীবন-মৃত্যু এত কাছাকাছি! আর একটা মিথ্যা বিশ্বাসের জন্যে মানুষ এমন অবলীলাক্রমে জীবন দিতে পারে! তাহলে তাদের তুলনায় মুসলমানরা কত পেছনে!

ভাবনায় ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসা। হাসান তারিকের কথায় তার সম্বিত ফিরে এল।

হাসান তারিক বলছে, 'ভাইয়া ঠিকানা লেখা একটা চিরকুট ছাড়া তার কাছ থেকে উল্লেখ করার মত কিছু পাওয়া যায়নি।'

'চিরকুটে কি আছে?' বলল আহমদ মুসা।

'কয়েক লাইন লেখা। এখনো পড়তে পারিনি।' হাসান তারিক বলল।

সোজা হয়ে দাঁড়াল আহমদ মুসা। বলল, 'দাও দেখি।'

আহমদ মুসা চিরকুটটি হাতে নিয়ে গাড়ির ভেতরে ঢুকে গিয়ে পড়তে লাগল ঃ

সুলিভান, আসছে সন্ধ্যায় ৭১ বে ষ্ট্রিটে এস। এভাবে চলতে পারে না। বস ভীষণ ক্ষুব্ধ। আমরা এখন ডু অর ডাই কন্ডিশনে।' -ডেভিড ডেনিম।

চিরকুটটা পড়ে আহমদ মুসা হাসান তারিকের দিকে তাকাল।

আহমদ মুসা তার দিকে চিরকুটটা তুলে ধরে বলল, 'পড়।'

হাসান তারিক চিরকুটটা পড়েই বলে উঠল, 'আমাদের পরবর্তী গন্তব্য তাহলে ৭১ বে ষ্ট্রিট।

‘হ্যাঁ তাই।’

বলে আহমদ মুসা গাড়ি ষ্টার্ট দিল।

সাও তোরাহ্ দ্বীপের আন্ডার গ্রাউন্ড জেলখানা।

জেলখানা বলা ঠিক নয়। আসলে বিশাল এক কনসেনট্রেশন ক্যাম্প এটা। WFA-এর নেতা আজর ওয়াইজম্যান শত নির্যাতনে নিষ্পিষ্ট বন্দীদের বিদ্রুপ করে বলে, 'আল্লাহ নাকি তোমাদের জন্যে মহাসাড়ম্বরে মহাসুখের বেহেশ্ত সাজিয়ে রেখেছেন, সেখানে যাবার আগে দোজখের স্বাদটা নিয়ে যাও।'

আর বন্দীখানা বা কনসেনট্রেশন ক্যাম্পটা আন্ডার গ্রাউন্ড এই অর্থে যে, মাঝে মাঝে এ বন্দীখানা মাটির উপর থেকে আন্ডার গ্রাউন্ডে নেমে আসে। বন্দীখানাটার ছাদ জুড়ে বাগান। উপর থেকে দেখলে মনে হবে সুন্দর সবুজ পরিচ্ছন্ন একটা ভূমিখ-। যখন বন্দীখানাটা আন্ডার গ্রাউন্ডে চলে যায়, তখন তো কথাই নেই। কেউ উপর থেকে দেখে হাজার চেষ্টা করেও বলতে পারবে না যে, বাগানটা কৃত্রিম কিছু এবং এর নিচে এক বিশাল বন্দীখানা আছে। কেন এটা দুনিয়ার অদ্বিতীয় দোজখখানা তার পক্ষে আজর ওয়াইজম্যান যুক্তি দেন যে, আমরা এই দোজখখানার জন্যে যে টেকনলজি ব্যবহার করেছি, হিটলার তার কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের জন্যে তা কল্পনাও করেননি। আরেকটা পার্থক্যের কথা আজর ওয়াইজম্যান বলে থাকে। সেটা হলো, হিটলার ছিলেন স্বৈরাচারী, আর আমরা দুনিয়ায় গণতন্ত্র প্রমোট করছি।

একদল বন্দী বন্দীখানার ময়লা পরিষ্কার ও মাজা-ঘসা করছিল।

সপ্তাহে একদিন বন্দীখানা মাজা ঘসা ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করা হয়।

সাও তোরাহ্-এর বন্দীদের জন্যে সপ্তাহের এ দিনটি বহুল আকাঙ্খিত দিন। কাজ করতে গিয়ে সবার এদিন একত্র হবার সুযোগ হয়। হাতে পায়ে পরানো হয় নতুন শেকল। শেকল দেড়ফুট লম্বা হওয়ায় চলা-ফেরায় কিছুটা সুবিধা হয়। সবচেয়ে বড় কথা পায়ে পরানো কাঁটার জুতা খুলে নেয়া হয়ে থাকে, বন্দীদের জন্যে এই কাঁটার জুতা খুবই ভয়ংকর। জুতার সুখতলীতে বসানো থাকে

অতিসূক্ষè কাঁটার সারি। এই কাঁটা অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। এ জুতা পায়ে দিয়ে হাঁটা তো দূরের কথা দাঁড়ানোও যায় না। জুতা পায়ের সাথে লক করা থাকে বলে খোলাও যায় না। এ জুতা বন্দীদের উপর নির্যাতনের ক্ষেত্রে নতুন সংযোজন।

সত্যি বন্দিখানাকে আজর ওয়াইজম্যান দোজখে পরিণত করেছে। বন্দীদের কম্বল ও কাপড় আরামদায়ক না হলেও কষ্টদায়ক ছিল না শুরুর দিকে। কিন্তু এখন কম্বল ও কাপড়-চোপড় হয়ে দাঁড়িয়েছে আরেক ভীতির কারণ। ওগুলোতে ছারপোকা জাতীয় এক ধরনের পোকার বাসা। গায়ে দিলেই ওগুলো গায়ে চরে বেড়াতে শুরু করে এবং কামড়াতে থাকে। তাছাড়াও কম্বল ও কাপড়ত-চোপড় গায়ে দিলেই সর্বাঙ্গ চুলকাতে শুরু করে। ভীষণ জ্বালা-যন্ত্রণায় কম্বল ও পোশাক গায়ে রাখা খুবই কঠিন হয়ে দাঁড়ায়। আবার প্রচ- শীতের মধ্যে ওগুলো গা থেকে নামানোও যায় না। এক ভয়ংকর অবস্থার মধ্য দিয়ে বন্দীদের প্রতিটি মুহূর্ত অতিবাহিত হয়।

সুতরাং সাতদিনের এই একটা দিন তাদের জন্যে পরম আকাক্সক্ষার, যদিও এ দিন তাদের যে কাজটা করতে হয় তা ক্লিনার ও মেথরদের কাজ। ৬ দিনে বন্দীখানায় যে মল-মূত্র ও ময়লা জমে ৭ম দিনে তা পরিষ্কার করতে হয়। তবু পায়ে কাঁটার জুতা থাকে না এবং ভিন্ন ধরনের কাপড় পরা যায় বলে এই কাজটাই সবার কাছে পরম আরামদায়ক।

আজর ওয়াইজম্যানের মতে সপ্তাহের সপ্তম দিনকে কিছুটা আরামদায়ক করা হয়েছে ছয়দিনের কষ্টকে তীব্র করে তোলার জন্যে। কষ্ট অভ্যাসে পরিণত হলে কষ্ট কমে যায়। এটা যাতে না হয় এ জন্যেই আজর ওয়াইজম্যানের এই ব্যবস্থা।

একদল বন্দী একটু সুযোগ পেয়ে আলাপ করছিল। ইন্দোনেশিয়ার একজন বন্দী ভাঙা ইংরেজীতে জিজ্ঞেস করল তুরস্কের একজন বন্দীকে, 'মি. বায়ার গত সপ্তাহে আপনার কাছ থেকে ব্যাপারটা জানার পর থেকেই আমি ভাবছি। আমার মনে হচ্ছে কি জানেন, দুনিয়ার এ দোজখখানাটা মুসলমানদের প্রায়শ্চিত্ত করার শেষ মনজিল। মুক্তির সূর্যোদয় খুব সামনেই।'

'কোন ব্যাপারটা মি. হাদি আমর?' বলল জালাল বায়ার।

জালাল বায়ার তুরস্কের একটা মুসলিম চ্যারিটি ফান্ডের প্রধান। তুরস্ক ভিত্তিক এ ফান্ডটি গোটা দুনিয়ায় বিজ্ঞান বিষয়ক শিক্ষার উন্নয়নে কাজ করে। সেই সাথে অসহায় কিন্তু প্রতিভাবান এমন মুসলিম শিক্ষার্থীদের আর্থিক সহায়তা দান করে। আজর ওয়াইজম্যানের WFA এই ফান্ড ধ্বংসের এক অংশ হিসেবে জালাল বায়ারকে কিডন্যাপ করেছে। তার বিরুদ্ধে অভিযোগ হলো শিক্ষা-সহায়তার নামে তার ফান্ড ইসলামী রেঁনেসা তথা মুসলমানদের মধ্যে হিংসা উদ্দীপ্ত করার কাজ করছে।

আর ইন্দোনেশিয়ার হাদি আমর 'লিভিং মস্ক মুভমেন্ট' বা 'মসজিদ আবাদ আন্দোলন'-এর নেতা। এ আন্দোলনের কাজ হলো, মসজিদ সংস্কার করা, মসজিদে পাঁচ ওয়াক্ত নামাজের ব্যবস্থা করা এবং মসজিদকে এলাকার শান্তি-শৃঙ্খলার কেন্দ্রে পরিণত করা। আজর ওয়াইজম্যানের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মি (WFA)-এর কাছে এটা খুবই আপত্তিকর মনে হয়েছে। হাদী আমরকে কিডন্যাপ করা হয়েছে এই অভিযোগে যে, সে সাম্প্রদায়িকতাকে উদ্দীপ্ত করে সন্ত্রাসবাদকে সাহায্য করছে। তার কাছে এখন দাবী করা হচ্ছে তার জনশক্তির একটা পূর্ণ তালিকা।

'কেন মনে নেই, আপনি বলেছিলেন দুনিয়ার এই দোজখখানায় আমাদের ইন্দোনেশিয়ার পিতৃস্থানীয় আহমদ সুকর্নের বংশধর মোহাম্মদ সুকর্নের সাথে রয়েছেন আপনাদের পিতা কামাল আতাতুর্কের উত্তর সুরী কামাল সুলাইমান, মিসরের বাদশাহ ফারুকের প্রত্যক্ষ বংশধর আবদুল্লাহ ফারুক, লিবিয়ার বাদশাহ ইদরিসের উত্তরসূরী আহমদ আল সেনুসি, তুরস্কের শেষ খলিফা আবদুল হামিদের উত্তর-পুরুষ ওসমান আবদুল হামিদ, ইরানের রেজাশাহ পাহলবীর বংশধর মোহাম্মদ আলী রেজা এবং স্পেনের সোনালী ইতিহাসের নির্মাতা ওমাইয়া শাসকদের ধ্বংসাবশেষের সপ্তদশ পুরুষ আবদুল রহমান। দুনিয়ার এই দোজখখানায় এঁদের ঐতিহাসিক এই সম্মেলন কাকতালীয় বলা যাবে, কিন্তু আমার মনে হয়েছে এটা আল্লাহ তাআলারই এক পরিকল্পনা। এই সাত ব্যক্তি ঐতিহাসিক যে সাত ব্যক্তির উত্তরসূরী, সেই সাত ব্যক্তিকে আল্লাহ তাদের নিজ নিজ দেশে সব দ--মু-রে কর্তা বানিয়েছিলেন, কিন্তু তারা জাতি

গঠনের পরিবর্তে জাতিকে বিজাতীয়দের হাতে তুলে দিয়েছেন। এই ঐতিহাসিক সাতের পাপেরই প্রায়শ্চিত্ত করতে এসেছেন আপনারা, বলা যায় সেই সাতজনই এখন দুনিয়ার এই দোজখখানায়।' বলল হাদি আমর।

দুঃখের মধ্যেও হাসল জালাল বায়ার। বলল, 'আপনি চমৎকার একটা ইকুয়েশন করেছেন। কিন্তু মুক্তির সূর্যোদয় আপনি কোথায় দেখতে পেলেন?'

'ঠিক দেখতে পাইনি। কল্পনার দিগন্তে তৃতীয় নয়ন দিয়ে অবলোকন করছি। অনেক খবর এ জেলখানার বাতাসেও ভাসছে। তার একটি হলো, আহমদ মুসা আজোরস দ্বীপপুঞ্জে এসেছেন। আহমদ মুসা আল্লাহর এমন এক বান্দাহ যাকে সংগ্রাম এবং সাফল্য অনুসরণ করে থাকে।'

'হ্যাঁ, হ্যাঁ, আহমদ মুসার কথা আমিও শুনলাম। কয়েক মিনিট আগে আমাদের কামাল সুলাইমান ও ওসমান আবদুল হামিদ বলল যে, আহমদ মুসা তেরসিয়েরা দ্বীপে WFA-কে বিধ্বস্ত করে 'হারতা' দ্বীপে এসেছেন।' বলল জালাল বায়ার।

'সত্যি? কার কাছ থেকে তারা জানলেন?' হাদি আমর আনন্দে চোখ উজ্জ্বল করে বলল।

'ফ্রান্স থেকে সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহকে ওরা ধরে এনেছে। তাঁর কাছ থেকেই এরা শুনেছেন।' বলল জালাল বায়ার।

'বুমেদীন বিল্লাহ? আলজেরিয়ার পিতৃস্থানীয় বেন বেল্লাহর কি কেউ?' জিজ্ঞাসা হাদী আমর-এর।

'শুনলাম, শুধু বেন বেল্লাহ নয়, আলজেরিয়ার দীর্ঘ দিনের শাসক হুয়ারী বুমেদীনের বংশের সাথেও তিনি সম্পর্কিত। তিনি যেমন বেন বেল্লাহর 'গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড সান', তেমনি তিনি হুয়ারী বুমেদীনেরও গ্রেট গ্রেট গ্রান্ড-ডটারের স্বামী।'

স্থান-কাল-পাত্র ভুলে গিয়ে হাদী আমর হাততালি দিয়ে উঠল। বলল উচ্চ স্বরে, 'তাহলে বংশীয় প্রায়শ্চিত্ত করার সংখ্যা আট-এ দাঁড়াল। আর বুমেদীন বিল্লাহ প্রায়শ্চিত্ত করবেন দুজনে.............'

কথা শেষ করতে পারল না হাদী আমর। পাশ থেকে উত্থিত বাঘের মত হিং¯্র গর্জনে তার কন্ঠ থেমে গেল। মুখ ফিরিয়ে দেখল, দুজন তাদের দিকে

তেড়ে আসছে। কাঁধে তাদের ষ্টেনগান, হাতে পেরেক বিছানো ব্যাটন। এই ব্যাটন ষ্টেনগানের গুলীর চেয়ে ভয়াবহ। ষ্টেনগান নিমিষেই মানুষকে মেরে ফেলে, কিন্তু পেরেক বিছানো ব্যাটনের প্রহার মৃত্যুর চেয়েও ভীতিকর ও অসহনীয়। এই পেরেক বিছানো ব্যাটন WFA-এর নির্যাতন-অস্ত্রের তালিকায় আরেকটি নতুন সংযোজন।

হাদী আমররা চারজন দাঁড়িয়ে গল্প করছিল।

ব্যাটনধারী দুজন এসে চারজনকে এলোপাথাড়ী প্রহার শুরু করে দিল। জালাল বায়ার ও হাদী আমরকে সবচেয়ে নির্দয়ভাবে প্রহার করতে লাগল। শীঘ্রই রক্তের পিন্ডে পরিণত হলো দুটি দেহ। অন্য দুটি দেহও রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে লুটিয়ে পড়েছিল।

অন্যান্য বন্দীরা চারদিক থেকে সারিবদ্ধভাবে এগিয়ে আসছিল রক্তের পিন্ডে পরিণত হওয়া তাদের সাথীদের দিকে।

এমন ঘটনা বন্দীখানার সাধারণ ব্যাপার। সুযোগ পেলে একে অপরকে সেবা-শুশ্রুষা করে থাকে বন্দীরা।

ব্যাটনধারীরা তাদের রক্ত¯œাত ব্যাটন ফেলে দিয়ে হাতে নিয়েছিল ষ্টেনগান।

এ সময় চারদিকে একটা গম্ভীর কণ্ঠ ধ্বনিত হলো, ‘ধন্যবাদ ঈশ্বরের সন্তান প্রহরীরা। চারজন বন্দীকে কাজের সময় অকাজ করার শাস্তি হিসাবে যে রক্তের পোশাক পরিয়েছ সেজন্যে তোমাদের ধন্যবাদ। এখন বড় একটি সার্কেল দাও ওদের চারদিকে। কয়েকটা চেয়ার সাজিয়ে দাও রক্তের পোশাক পরা চারজনের সামনে।

বিখ্যাত নতুন মেহমান নিয়ে আমরা আসছি।

রক্তাপ্লুত হাদী আমরদের সামনে কয়েকটা চেয়ার উঠে এল।

তার সাথে উপর থেকে নেমে এল একটা সিঁড়ি। সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল রাজপুরুষের সাজসজ্জা পরিহিত একজন দীর্ঘকায় মানুষ। সে এসে বসল সিংহাসনের মত একটা সুন্দর চেয়ারে।

তার পরেই নেমে এল সফেদ শ্মশ্রুওয়ালা স্বর্গীয় চেহারার একজন লোক। তাকে ধরে নামিয়ে নিয়ে এসেছিল আরেকজন। তাকে বসানো হলো সিংহাসনাকৃতি চেয়ারের সামনের একটা চেয়ারে। সে নেমে আসতেই বন্দীদের মধ্যে গুঞ্জন শুরু হয়ে গিয়েছিল। কেউ কেউ উঠে দাঁড়িয়েছিল। কিন্তু একজন প্রহরী চিৎকার করে উঠল, 'কেউ কথা বলবে না, কেউ নড়বে না। দ্বিতীয়বার আদেশ দেয়া হবে না।'

বন্দীরা সব চুপ করল। কিন্তু সকলের চোখে-মুখে বিস্ময় ও বেদনার ছাপ।

সফেদ শ্মশ্রুওয়ালা স্বর্গীয় চেহারার লোকটিই শেখুল ইসলাম আহমদ মুহাম্মাদ। ইনি মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক 'আন্তর্জাতিক হিউম্যান ডেভলপমেন্ট এন্ড এইডস ফর অপ্রেসড' (IHDAAFD)-এর প্রধান। তাকে কিডন্যাপ করে সাও তোরাহে আনা হয়েছে।

শেখুল ইসলাম বসার পর সিঁড়ি দিয়ে নেমে এল মাঝবয়সী কঠিন চেহারার একজন লোক। সে বসল শেখুল ইসলামের ডান পাশে মুখোমুখি।

সিঁড়ি দিয়ে প্রথম নেমে আসা সিংহাসনাকৃতির চেয়ারে বসা রাজসিক পোশাকের লোকটি আজর ওয়াইজম্যান। আর সর্বশেষ নেমে আসা কঠোর চেহারার লোকটি বেন্টো বেগিন। আজর ওয়াইজম্যানের নতুন অপারেশন চীফ।

সবাই এসে বসলে আজর ওয়াইজম্যান তার সিংহাসনে নড়ে-চড়ে সোজা হয়ে বসল। তাকাল রক্ত পিন্ডের মত পড়ে থাকা চারজনের দিকে।

ওদের গা থেকে তখনও রক্ত ঝরছে। কাতরাচ্ছে ওরা যন্ত্রণায়। ওদের একজন 'পানি' 'পানি' বলে বিলাপ করছে।

আজর ওয়াইজম্যানের দৃষ্টি তার প্রতিই নিবদ্ধ হলো। বলল, 'ধৈর্য ধর হাদি আমর। দুনিয়ার পানি খেয়ে কি হবে, বেহেশতের শরাবন তহুরা তোমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।'

বলেই তাকাল একজন প্রহরীর দিকে। বলল, 'যাও হাদী আমরকে এক গ্লাস পানি দেখিয়ে ফিরিয়ে নিয়ে এস।'

থামল আজর ওয়াইজম্যান। হাসল একটু। তারপর চারদিকে বসা বন্দীদের দিকে একবার চোখ ঘুরিয়ে নিয়ে বলল, 'তোমরা বিস্মিত হয়েছ শেখুল ইসলামের মত বিখ্যাত একজন জনসেবক ও সকলের শ্রদ্ধাভাজন লোককে কেন আমরা দুনিয়ার এই দোজখে নিয়ে এলাম। কারণ একটাই সেটা হলো, যারা আমাদের বন্ধু নয়, তারাই আমাদের শত্রু। শেখুল ইসলাম সব মানুষের বন্ধু, কিন্তু আমাদের বন্ধু হতে রাজী হননি। তাই তিনি এখানে।'

একটু থেমেই আজর ওয়াইজম্যান তার চোখ শেখুল ইসলামের দিকে ঘুরিয়ে নিল।

শেখুল ইসলাম দেখছিল চারদিকের বন্দীদের। বন্দীদের অধিকাংশই বিখ্যাত লোক এবং শেখুল ইসলামের পরিচিত। প্রথমে তার বিস্ময়ের পালা। তাহলে নিখোঁজ বলে প্রচারিত সবাইকে এখানে এনে বন্দী রাখা হয়েছে! এ সবই WFA -এর কাজ! তার মন কেঁদে উঠল সকলের অবস্থা দেখে। বিশেষ করে হাদী আমরদের অবস্থা তাকে দিশেহারা করে তুলল। বিশেষ করে জালাল বায়ার ও হাদী আমর দুজনেই তার খুব প্রিয় ব্যক্তি।

'জনাব শেখুল ইসলাম, আপনি সবই দেখলেন এবং দেখছেন, এখন বলুন আপনি আমাদের সহযোগিতা করতে রাজী কিনা।' বলল আজর ওয়াইজম্যান শেখুল ইসলামকে লক্ষ্য করে।

'নতুন কোন সহযোগিতার বিষয় হলে বলুন।' শেখুল ইসলাম বলল নির্লিপ্ত ও নিরুত্তাপ কণ্ঠে।

'আমাদের প্রয়োজনের কথা আবার বলছি। এক. আপনার 'হিউম্যান ডেভলেপমেন্ট' ও 'এইড ফর অপ্রেসড' প্রোগ্রামে যারা সাহায্য করে আসছে তাদের একটা পূর্ণ তালিকা আমরা চাই। দুই. স্পুটনিক তার ডকুমেন্টগুলো কোথায় লুকিয়ে রেখেছে, তারও সন্ধান আমাদের প্রয়োজন।' শক্ত কিন্তু শান্ত কণ্ঠে বলল আজর ওয়াইজম্যান।

শেখুল ইসলাম তার চেয়ারে সোজা হয়ে বসল। বলল ধীর কণ্ঠে, 'তালিকা আপনার প্রয়োজন নেই, সুতরাং তা আপনারা পাবেন না, এ কথা আগেই বলেছি। আর মি. কামাল সুলাইমানদের স্পুটনিক-এর ডকুমেন্ট সম্পর্কে আমি

কিছুই জানি না। তারা আমার পরিচিত, মাঝে মাঝেই তাদের সাথে আমার কথা হয়েছে, কিন্তু ডকুমেন্ট নিয়ে কোন কথা কোন দিন হয়নি, এ কথাও আমি আপনাদের বলেছি।'

'তালিকার প্রশ্নে পরে আসছি জনাব। ডকুমেন্টের ব্যাপারে আপনার কথা যদি শেষ হয়, তাহলে এ ডকুমেন্টের খবর কে জানবে জনাব। কামাল সুলাইমানরা নিশ্চয়?' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'তা অবশ্যই জানবে।' শেখুল ইসলাম বলল।

'তাহলে দয়া করে ওদের বলে দিন যেন ডকুমেন্টগুলো কোথায় তা আমাদের বলে দেয়।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'স্পুটনিক ধ্বংস হবার সাথে সাথে ওদেরও অন্তর্ধান ঘটেছে। ওরাও কি তাহলে আপনার এখানে বন্দী?' শেখুল ইসলাম বলল।

'হ্যাঁ, ওরাও আমার এ দোজখখানার বিশেষ মেহমান। এখনি ওদের নিয়ে আসা হচ্ছে। তারা আপনাকে শ্রদ্ধা করে। আপনি ওদের রাজী করান।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

আজর ওয়াইজম্যানের কথা শেষ হতেই তাদের এবং হাদী আমরদের মাঝখানে ছয় সাত বর্গফুটের একটা সেল টিউব উঠে এল। তার মধ্যে কামাল সুলাইমানসহ স্পুটনিকের ওরা ছয়জন দাঁড়িয়ে।

সেল টিউবটি মেঝের সমান্তরালে এসে স্থির হতেই সেলের চারদিকের প্রাচীর আবার নিচে ফিরে গেল। উন্মুক্ত মেঝের উপর দাঁড়ানো কামাল সুলাইমানরা ছয়জন।

ওদের ছয়জনেরই বিধ্বস্ত অবয়ব। ভেঙে পড়া স্বাস্থ্য। দূর্বল দেহ। কিন্তু চোখ-মুখে তাদের সুস্থতার অদ্ভুত দ্যুতি ও আত্মবিশ্বাসের অপরূপ আলো।

শায়খুল ইসলাম এক দৃষ্টিতে তাকিয়েছিল ওদের সাতজন অর্থাৎ কামাল সুলাইমান, আবদুল্লাহ আল ফারুক, আহমদ আল সেনুসি, ওসমান আবদুল হামিদ, মোহাম্মদ আলী রেজা, মোহাম্মদ সুকর্ণ, আবদুল রহমান উমাইয়া-এর দিকে। ওদের অবস্থা দেখে অন্তর কেঁদে উঠেছিল শেখুল ইসলামের। হতাশা ও দূর্বলতা এসে তাকে চেপে ধরেছিল চারদিক থেকে। কিন্তু ওদের চোখ-মুখের

দিকে তাকিয়ে দূর্বলতা ও হতাশা মুহূর্তে বিদায় নিল তার। কান্নার বদলে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠল তার মন। যেন ওদের চোখ-মুখের দীপ্তিতে মূর্তিমান হয়ে উঠেছে দয়ালু আল্লাহর অশেষ দয়া।

আত্মবিশ্বাসের আলো ফিরে এল শেখুল ইসলামের চোখে-মুখেও।

আজর ওয়াইজম্যান শেখুল ইসলামকে বলল, 'আপনি ওদের বোঝান। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের অন্তরালের ঘটনা সম্পর্কে যে দলিলপত্র ওরা সংগ্রহ করেছে, তা আমাদের দিয়ে দিক।'

বিস্ময় ফুটে উঠল শেখুল ইসলামের চোখে-মুখে। বলল, 'টুইনটাওয়ার ধ্বংসের অন্তরালের ঘটনা কি? সে ঘটনা সম্পর্কিত ডকুমেন্ট আপনি কেন চান?' বলল শেখুল ইসলাম আজর ওয়াইজম্যানকে লক্ষ্য করে।

আজর ওয়াইজমানের দুচোখ জ্বলে উঠল। বলল, 'আপনাকে এখানে আনা হয়েছে প্রশ্ন করার জন্যে নয়, প্রশ্নের উত্তর দেবার জন্যে। আপনাকে যা বলেছি তাই করুন।'

আজর ওয়াইজম্যানের কথা শেষ না হতেই ওদের ৭ জনের একজন ওসমান আবদুল হামিদ বলে উঠল, 'মুহতারাম, উনি জবাব দেবেন কি করে? ঐ ষড়যন্ত্রকারীরাই নিউইয়র্কের লিবার্টি ও ডেমোক্রাসি টাওয়ার ধ্বংস করে মুসলমানদের ঘাড়ে চাপিয়েছিল, এ কথাই আমরা মানে স্পুটনিক প্রমাণ করতে যাচ্ছিলাম। দলিল কিছু আমরা উদ্ধারও করেছি। এটাই আমাদের অপরাধ।'

বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে উঠেছে শেখুল ইসলামের দুই চোখ। এই তথ্য তার কাছে খুবই নতুন। পত্র-পত্রিকায় এ ধরনের কিছু খবর প্রকাশিত হয়েছিল স্পুটনিক ধ্বংসের ফলো-আপ হিসাবে। কিন্তু সে বিষয়টাকে কেউই তেমন গুরুত্ব দেয়নি, কারণ টুইন টাওয়ার ধ্বংসের পরও এ ধরনের আশংকা ও সম্ভাবনার কথা নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছিল। যা গুরুত্ব না পাওয়ায় আপনাতেই থেমে গিয়েছিল।

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল শেখুল ইসলাম। মুখের মধ্যেই কথা তার থেমে গেল। দেখল সে, আজর ওয়াইজম্যানের ইংগিতে একজন প্রহরী পেরেক বিছানো একটা ব্যাটন হাতে ঝাঁপিয়ে পড়েছে ওসমান আবদুল হামিদের উপর। মুহূর্তেই তার দেহ রক্তাপ্লুত হয়ে উঠল। পড়ে গেছে সে। শোয়া অবস্থায়ই তাকে

পেটানো হচ্ছে। অবাক ব্যাপার। মুখে কোন অভিব্যক্তি নেই ওসমান আবদুল হামিদের। তার চোখ বন্ধ। জ্ঞান হারাল নাকি সে। আঁৎকে উঠল শেখুল ইসলাম। আজর ওয়াইজম্যানের দিকে তাকিয়ে অনেকটা অনুরোধের কণ্ঠে বলল, 'এই বর্বরতা থামান মি. ওয়াইজম্যান।'

'আপনি ওদের বলুন ডকুমেন্টগুলো কোথায় তা বলতে। সংগে সংগেই অপারেশন থেমে যাবে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান নির্লিপ্ত কণ্ঠে।

শেখুল ইসলাম কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল, তার আগেই কামাল সুলাইমান বলে উঠল, 'মুহতারাম শেখুল ইসলাম, আপনি এই ষড়যন্ত্রকারী দুর্বৃত্তদের কোন সহযোগিতা করবেন না। আর আমরা মরে গেলেও ডকুমেন্টের কথা বলব না। আমরা যে কোন পরিণতির জন্যে প্রস্তুত। আল্লাহ ছাড়া এদের কোন কৃপা আমাদের কাম্য নয়। মুসলমানদের কৃপা করার কোন যোগ্যতাই এরা রাখে না।'

কামাল সুলাইমানের কথা শেষ না হতেই গর্জে উঠেছে আজর ওয়াইজম্যান। তার দুচোখে আগুন। গর্জে উঠেই সে ইংগিত করেছে আরেকজন প্রহরীকে। সংগে সংগেই সে প্রহরী পেরেক বিছানো সেই ব্যাটন হাতে ছুটল কামাল সুলাইমানের দিকে।

অন্ধের মতই এলোপাথাড়ী ব্যাটন চার্জ শুরু করল কামাল সুলাইমানের উপর। প্রতিটি আঘাতেই কামাল সুলাইমানের দেহ থেকে রক্ত ঝরণাধারার মত ফিনকি দিয়ে বেরুতে লাগল।

কয়েখ মুহূর্তের মধ্যেই কামাল সুলাইমানের দেহ মাটিতে আছড়ে পড়ল। রক্তের লাল রংয়ে ঢাকা পড়ে গেল কামাল সুলাইমানের দেহ।

ওসমান আবদুল হামিদের মতই কামাল সুলাইমানের মুখ থেকে একটি শব্দও বেরুলো না। দাঁত দিয়ে ঠোঁট কামড়ে চোখ বন্ধ করে মাটিতে পড়ে আছে সে।

অসহনীয় এই দৃশ্য থেকে বাঁচার জন্যে চোখ বন্ধ করেছে শেখুল ইসলাম। বেদনায় মুখ তার নীল হয়ে গেছে।

শেখুল ইসলামকে লক্ষ্য করে আজর ওয়াইজম্যান কঠোর কণ্ঠে বলল, ‘চোখ বন্ধ রাখলে বাইরের ঘটনা বন্ধ থাকবে না শেখুল ইসলাম। চোখ খুলুন। ওদের বোঝান।’

চোখ খুলল শেখুল ইসলাম। বলল, ‘আমি ভয়ে চোখ বন্ধ করিনি মি. ওয়াইজম্যান। মানুষের এই বর্বরতা সত্যিই অসহনীয়। আর ওদের বোঝাবার কথা বলছেন। কেন ওরা বুঝবে, যদি সে বুঝটা জাতির স্বার্থের বিরুদ্ধে হয়। যারা ভয়কে জয় করতে পারে, হুমকি, নির্যাতন ইত্যাদিতে তাদের কিছুই হয় না। নিজ চোখেই তো তা দেখছেন।’

হাসল আজর ওয়াইজম্যান। বলল, ‘যারা নিজের উপর নির্যাতনকে হাসি মুখে সহ্য করতে পারে, তারাই আবার অনেক ক্ষেত্রে অন্যের উপর নির্যাতন সহ্য করতে পারে না, ভেঙে পড়ে।’

কথা শেষ করেই একজন প্রহরীর দিকে চেয়ে বলল, ‘তুমি শেখুল ইসলামকে ওদের কাছে নিয়ে যাও। রঙীন সাজে একেও সাজাও। দেখি ব্যাটারা মুখ খোলে কিনা।’

সঙ্গে সঙ্গে প্রহরীটি ছুটে এল শেখুল ইসলামের কাছে। প্রহরী তাকে ধরতে যাবে এসময় শেখুল ইসলাম বলল, ‘ধরে নিতে হবে না, আমি নিজেই যাচ্ছি যেখানে নিতে চাও।’

‘অত বড়াই করো না শেখুল ইসলাম, তুমি কোন দিন আঙুলের আঘাতও খাওনি, এই দোজখী ব্যাটন-চার্জ খেয়ে তুমি হাতির মত চিৎকার করবে। সে চিৎকার ওদের মুখ খুলতে বাধ্য করবে।’ বলল আজর ওয়াইজম্যান ঠান্ডা স্বরে।

‘তোমার কথা ঠিক ছিল আজর ওয়াইজম্যান কিছুক্ষণ আগে পর্যন্ত। এখন আর সে অবস্থা নেই। আমি শিক্ষা নিয়েছি এই ছেলেদের কাছ থেকে। সারা জীবনের বিদ্যা আমাকে যা শেখায়নি, তা আমি শিখেছি ছেলেদের দীপ্ত চেহারা দেখে এবং যে কোন কষ্ট জয় করার ধৈর্য্য দেখে। তুমি একবার পরীক্ষা করে দেখ আজর ওয়াইজম্যান।’ পাথরের মত শক্ত আর ঠান্ডা স্বরে কথাগুলো বলে শেখুল ইসলাম হাঁটতে শুরু করল।

এ সময় বেন্টো বেগিন উঠে এল তার আসন থেকে। বন্দীদের সারিতে বসা নতুন বন্দী সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহর দিকে ইংগিত করে আজর ওয়াইজম্যানের কানে ফিসফিস করে বলল, 'শেখুল ইসলাম আমাদের শেষ তুরুপের তাস। সবশেষের জন্যে তাকে রেখে সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহকে টেষ্ট করতে পারি আমরা। সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহ স্পুটনিক ধ্বংসের আগের ও পরের ঘটনার সাথে সব চেয়ে বেশি সংশ্লিষ্ট।'

কথা শুনে একটু ভাবল আজর ওয়াইজম্যান। তার চোখে-মুখে হাসির রেখা ফুটে উঠল। বলল, 'তুমি ঠিক বলেছ বেগিন। নিয়ে এস বুমেদীন বিল্লাহকে।'

বেন্টো বেগিন উঠে এগোল তার ডান পাশের বন্দীর সারির দিকে।

আজর ওয়াইজম্যান শেখুল ইসলামকে বলল, 'আপনি ওখানেই ওদের কাছে বসুন। আপনার টার্মটা একটু পরে। সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহ আমাদের দোজখখানার বাসিন্দা হিসেবে আপনার সিনিয়ার। তার দাবীটাই আগে।'

বেন্টো বেগিন নিয়ে এল সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহকে। বুমেদীন বিল্লাহর চেহারায় গাম্ভীর্য। কিন্তু মুখে ভয়ের চিহ্ন নেই।

বুমেদীন বিল্লাহ আসতেই আজর ওয়াইজম্যান তাকে শেখুল ইসলামের রেখে যাওয়া চেয়ারে বসতে বলল।

বেন্টো বেগিন তার চেয়ারে বসেছে।

বুমেদীন বিল্লাহ সেই নির্দেশিত চেয়ারে গিয়ে বসল।

বুমেদীন বিল্লাহ বসতেই আজর ওয়াইজম্যান হালকা কণ্ঠে বলল, 'তুমি তো সাংবাদিক, আমাদের কথা শুনলে। তোমার মতামত বলার মত কিছু আছে?'

'অমিত বলশালী বাঘ শিকার ধরেও তাকে বাগে আনতে পারছে না, এটাই বুঝলাম আমি।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'চমৎকার, চমৎকার। তোমার উপমা একশ'ভাগ ঠিক। মনে হচ্ছে তুমি খুব বুদ্ধিমান ছেলে। যে সাহায্য আমরা চাচ্ছি, সে সাহায্য তুমি করতে পারবে।'

তৎক্ষণাৎ উত্তর দিল না বুমেদীন বিল্লাহ। মাথা নিচু করেছে সে। যেন সে গভীর ভাবনায় পড়েছে।

খুশিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল আজর ওয়াইজম্যানের মুখ। সে নিশ্চিত বুঝল বুমেদীন বিল্লাহর কাছে মূল্যবান তথ্যটি আছে, না হলে সংগে সংগেই সে অস্বীকার করতো। বুমেদীন বিল্লাহর কথঅ বলতে দেরি দেখে উদগ্রীব কণ্ঠে আজর ওয়াইজম্যান বলে উঠল, 'বুমেদীন বিল্লাহ আমাদের সাহায্য কর। আমরা সাহায্য চাই যে কোন মূল্যে।'

মুখ তুললো বুমেদীন বিল্লাহ। বলল গম্ভীর কণ্ঠে, 'আমি আপনাদের সাহায্য করব। কিন্তু এই অমূল্য তথ্যের জন্যে আমি কি মূল্য পাব?'

শেখুল ইসলাম কথাগুলো শুনছিল। কামাল সুলাইমানসহ সবার কানেই কথাগুলো পৌছেছিল। বুমেদীন বিল্লাহর শেষ কথা কামাল সুলাইমানের কানে পৌছতেই নড়ে উঠল কামাল সুলাইমানের রক্তপিন্ড আকারের দেহ। অনেক কষ্টে মাথা তুলল সে। বলল সে বুমেদীন বিল্লাহকে লক্ষ্য করে, 'মি. বিল্লাহ টাকার জন্যে জাতির এতবড় সর্বনাশ করবেন না। এদের আপনি চেনেন না। ডকুমেন্টগুলোর খবর ওদের দিলেও ওরা আপনাকে বাঁচতে দেবে না। কোন মুসলমানের প্রতিই তাদের আস্থা নেই।'

ক্লান্ত কণ্ঠ থামল কামাল সুলাইমানের।

কামাল সুলাইমান থামতেই আজর ওয়াইজম্যান বলে উঠল, 'বিল্লাহ এ শয়তানদের কথা বিশ্বাস করবে না। এদের দুর্ভাগ্যের সাথে সব মুসলমানকে জড়াতে চাচ্ছে, তোমাকেও জড়াতে পারলে ওরা খুশি হয়। আমরা তোমার মত মানে কামাল আতাতুর্কের মত মুসলমানদের বন্ধু। এটা তুমি নিজেই দেখতে পাবে।'

আজর ওয়াইজম্যানের কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে বুমেদীন বিল্লাহ বলে উঠল কামাল সুলাইমানকে লক্ষ্য করে, 'মি. সুলাইমান আমি কোন প্রকার সাম্প্রদায়িকতার মধ্যে নেই। আমাকে দোষ দেবেন না। আমি আপনা পূর্ব পুরুষ কামাল আতাতুর্কের অনুসারী। আমি মনে করি টুইনটাওয়ার ধ্বংসের বিশ বছর পর এ নিয়ে সাম্প্রদায়িক সংঘাত বাধাবার কোন যুক্তি নেই। সুতরাং ডকুমেন্টগুলো ওদের হাতে তুলে দিয়ে এ সংঘাত-সম্ভাবনার ইতি ঘটাতে চাই। এতে আপনাদেরও উপকার হবে, উপকার হবে আপনাদের পরিবারগুলোর।

জানেন, আপনাদের পরিবার সার্বক্ষণিক উদ্বেগ নিয়ে কিভাবে পালিয়ে বেড়াচ্ছে? আমি ওদেরকেও বাঁচাতে চাই।'

থামল বুমেদীন বিল্লাহ।

'আমাদের এবং আমাদের পরিবার নিয়ে আপনাকে ভাবতে হবে না মি. বিল্লাহ। আজর ওয়াইজম্যান আপনার জন্যে কতটা করবেন জানি না, কিন্তু আমাদের জন্যে আল্লাহ আছেন। তাঁর উপর আমরা নিশ্চিত ভরসা করতে পারি। ইতিহাস বলে, অসাম্প্রদায়িক সেজে কেউই অতীতে লাভবান হয়নি, আপনিও হবেন না মি. বিল্লাহ।'

'আমিও বলছি ইতিহাসও বলবে। সেটা দেখার জন্যে আজর ওয়াইজম্যান আপনাদের জীবিত রাখুন, এটা আমি চাইব।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'হ্যাঁ, বিল্লাহ। অন্তত তোমার ইতিহাস তারা দেখেই মরবে। এখন বল তুমি কি বিনিময় চাও। আমরা দ্রুত আগাতে চাই।'

বুমেদীন বিল্লাহ একটু ভাবল। তারপর বলল, 'বিনিময় হিসাবে তিনটি শর্ত। এক. আমার মুক্তি, দুই. বৃটেন ও ফ্রান্সের দুটি কাগজে খবর ছাপতে হবে যে, আপনি আমাকে সাংবাদিক হিসেবে সাও তোরাহ দ্বীপের বোটানিক্যাল রিসার্চ পরিদর্শন ও রিপোর্ট করার জন্যে এই দ্বীপে নিয়ে এসেছেন, তিন. এক বিলিয়ন ডলার এক্সপ্রেস ব্যাংকে আমার একাউন্টে জমা দিতে হবে। শেষ দুটি কাজ আপনাদের তথ্য দেবার আগেই সম্পন্ন হতে হবে এবং ব্যাংকের ডিপোজিট শ্লীপ এবং নিউজসহ পত্রিকা আমাকে পেতে হবে।'

সংগে সংগেই উত্তর দিল না আজর ওয়াইজম্যান। ভাবল একটুক্ষণ। তারপর বলল, 'কোন শর্তেই আমার কোন আপত্তি নেই। তবে নিউজ প্রকাশ করতে হবে কেন?'

'ওটা আমার নিরাপত্তার গ্যারান্টি মি. আজর ওয়াইজম্যান। নিউজ প্রকাশিত হলে আমাকে হত্যা করা আপনার জন্যে কঠিন হবে। হত্যা করলেও আপনি শুধু নন, সাও তোরাহ দ্বীপও আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়াবে। ওটুকু গ্যারান্টি

আমার জন্যে না থাকলে আমি নিঃশর্ত কোন ঝুঁকি নিতে পারি না।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'ঠিক আছে তোমার তিনটি শর্তই আমি মেনে নিলাম। কিন্তু আমার একটা শর্ত আছে। সেটা হলো, 'ডকুমেন্ট আমাদের হাতে না আসা পর্যন্ত তোমাকে এখানেই থাকতে হবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'এখানে এই জেলখানায় থাকব কি করে। প্রথম সুযোগেই তো ওরা আমাকে মেরে ফেলবে।' বলল বুমেদীন বিল্লাহ চোখে-মুখে উদ্বেগ টেনে।

'হ্যাঁ সেটা চিন্তার বিষয়। তোমাকে ওদের সাথে রাখা যাবে না। ঠিক আছে তুমি আমাদের লোকদের সাথে এ্যাডমিনিষ্ট্রেশন সেকশনে থাকবে।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

বলেই আজর ওয়াইজম্যান উঠে দাঁড়ালো।

উঠে দাঁড়ালো বেন্টো বেগিনও।

'বেগিন, বুমেদীন বিল্লাহকে তোমাদের সাথে নিয়ে এস। এখন থেকে সে তোমাদের সাথে থাকবে।'

বলে সিঁড়ির দিকে এগুলো আজর ওয়াইজম্যান।

আজর ওয়াইজম্যান উঠে যাবার পর বুমেদীন বিল্লাহকে নিয়ে সিঁড়িতে উঠতে উঠতে বলল একজন প্রহরীকে লক্ষ্য করে, বুমেদীন বিল্লাহর সেলে এখন থেকে থাকবে শেখুল ইসলাম।'

সিঁড়ি দিয়ে উঠার সময় বুমেদীন বিল্লাহ কামাল সুলায়মানদের দিকে চেয়ে বলল, 'মি. সুলায়মান, ইতিহাস আমার শুরু হলো।'

'আপনার ইতিহাস আপনি লিখবেন না, লিখবেন ঐতিহাসিকরা।' বলল কামাল সুলায়মান ক্ষীণ কণ্ঠে।

'যা ঘটে ঐতিহাসিকরা তাই লেখে। আমি ঘটাব, ইতিহাস তাই লিখবে।' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

'বিশ্বাসঘাতক বিশ্বাসঘাতক হিসাবে ঘটনা ঘটায় না। কিন্তু ইতিহাস তাকে বিশ্বাসঘাতক বলে।' বলল কামাল সুলাইমান দুর্বল ও কাঁপা কণ্ঠে।

হাসল বুমেদীন বিল্লাহ। বলল, ‘সে ইতিহাস দেখা পর্যন্ত আপনারা বেঁচে থাকুন, আমি চাই।’

কিছু বলার জন্যে মুখ খুলেছিল কামাল সুলাইমান। কিন্তু বুমেদীন বিল্লাহ উপরে উঠে অদৃশ্য হয়ে গেছে। সিঁড়িও উঠে যাচ্ছে।

আহমদ মুসা ধীরে ধীরে গাড়ি চালিয়ে ৭১ বে ষ্ট্রিট-এর সামনে দিয়ে একবার দক্ষিণে চলে গেল।

‘ভাইয়া, ৭১ বে ষ্ট্রিট তো একটা বদ্বীপ।’ বলল হাসান তারিক।

‘হ্যাঁ, নিশ্চয় বাড়িটা ব-দ্বীপের কেন্দ্রস্থলে হবে। গাড়ি চালিয়ে যাওয়া যাবে না। প্রধান সড়ক থেকে ৭১ বে ষ্ট্রিট-এর গেট পেরিয়ে অনেকটা হাঁটতে হবে মনে হচ্ছে।’ আহমদ মুসা বলল।

কিছুটা এগিয়ে গাড়ি আবার ফেরাল আহমদ মু। ৭১ বে ষ্ট্রিট-এর কাছাকাছি এসে গাড়িটা একটা ঝোপের আড়ালে রেখে দুজন হেঁটে হেঁটে ৭১ বে ষ্ট্রিট বাড়িটার দিকে এগুতে লাগল।

বে ষ্ট্রিটটা সাগরের ধার ঘেঁষে তৈরি। রাস্তার পরে সেফটি ফেঞ্চ বা নিরাপত্তা বেড়া। তার পরেই সাগর। তবে কোন কোন স্থানে ভূখন্ড মাথা বাড়িয়ে সাগরে ঢুকে গিয়ে বদ্বীপের আকার নিয়েছে। এসব স্থানে কিন্তু বাঁক না নিয়ে রাস্তা সোজা চলে গেছে। এই ধরনেরই স্থান হলো ৭১ বে ষ্ট্রিট।

তখন সন্ধ্যা পুরোপুরি নেমেছে। কিন্তু সাগর তীরের সন্ধ্যা আলো-আঁধারীর এক মিশ্রণ।

আলো-আঁধারীর বুক চিরে এগিয়ে যাচ্ছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক প্রশস্ত ফুটপাত ধরে।

চারদিকটা নিরব।

মাঝে মাঝে শিশ দিয়ে যাচ্ছে রাস্তার চলমান গাড়ি। কদাচিৎ দুএকজন লোক দেখা যাচ্ছে ফুটপাতে চলাচল করতে।

৭১ বে ষ্ট্রিট-এর দুপাশেই সাগর তীরের কিছু দূর পর্যন্ত ছোট-খাট গাছ-গাছড়া ও ঝোপ-ঝাড়। ঝোপ-ঝাড় মিশেছে গিয়ে ৭১ বে ষ্ট্রিট গেটের দুপ্রান্তে। নিশ্চয় এই ধরনের ঝোপ-ঝাড় কেটেই গেটটা তৈরি করা হয়েছে। গেট থেকে যে রাস্তা ব-দ্বীপের অভ্যন্তরে এগিয়ে গেছে তাও দুপাশের ঘন ঝোপ-ঝাড়ের মধ্য দিয়ে।

গোটা ব-দ্বীপটাই ঘন জঙ্গলের বর্মে ঢাকা।

৭১ বে ষ্ট্রিট এর গেট তখন দো যেতে শুরু করেছে।

ফুটপাতের প্রান্ত ঘেঁষে ঝোপ-ঝাড়ের ছায়া-ঘন অন্ধকারে নিজেদের আড়াল করে গেটের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক।

গেটের একেবারে পাশে এসে গেছে তারা।

গেটে দরজা আছে, কিন্তু খোলা।

হয়তো দরজা রাতে বন্ধ হয় কিছু সময়ের জন্য, কিংবা হয়ই না।

গেটের ভেতরের রাস্তাটা নির্জন।

রাস্তায় আলো আছে, কিন্তু যথেষ্ট নয়।

গেটের ভেতরের রাস্তাটা প্রাইভেট। আলোর ব্যবস্থা দূরে দূরে। সেই আলো রাস্তাকে যথেষ্ট আলোকিত করতে পারেনি।

আহমদ মুসা হাতঘড়ির দিকে তাকালো। রাত ৮টা বাজে। সূর্য অস্ত যাবার পর আধা ঘণ্টা পার হয়েছে। এই সময়টাকেই প্রকৃত সন্ধ্যা বলা হয় এই অঞ্চলে।

'গেট খোলা, তার উপর গেটে ওদের লোক নেই কেন হাসান তারিক বলতে পারো?' আহমদ মুসা বলল।

'ভাইয়া কদিন এখানে থেকে বুঝেছি, এখানকার প্রাইভেট বাড়ির প্রাইভেট রোডগুলোর সংস্কৃতি এক ধরনের নয়। কোথাও গেট আছে, কোথাও গেট নেই। কোথাও প্রহরী থাকে, কোথাও থাকে না।' বলল হাসান তারিক।

'কিন্তু হাসান তারিক, ভালো করে দেখ। ওপাশে গেটের পাশেই ছোট একটা গার্ডরুম। গার্ডরুমের দরজা খোলা। ভেতরে এই অন্ধকারেও একটা ছোট কিছুর অস্তিত্ব দেখা যাচ্ছে। ওটা চেয়ারই হবে। যদি তাই হয়, তাহলে চেয়ারে

মানুষ থাকে। কিন্তু এখন নেই। সে গেল কোথায়? বিশেষ করে আজ সন্ধ্যায় যখন ওদের বিশেষ অনুষ্ঠান।’

‘ঠিক, সার্বক্ষণিক লোকের তো গেট ফেলে কোথাও চলে যাওয়ার কথা নয়। তাই আমাদের কিছুটা অপেক্ষা করা উচিত। ব্যাপারটা আরও পরিষ্কার হবে।’

‘হ্যাঁ, হাসান তারিক, এটাই যুক্তিসংগত। তবে চল.........।’

কথা শেষ করতে পারলো না আহমদ মুসা। একটা হাত এসে সাঁড়াশির মত তর গলা চেপে ধরল। আরেকটা হাত এসে চেপে বসল তার নাকে।

সংগে সংগেই আহমদ মুসা বুঝল তাকে ক্লোরোফরম করা হচ্ছে।

আহমদ মুসা সে মুহূর্তেই শ্বাস বন্ধ করে গোটা দেহের ভার নিচের দিকে ছুঁড়ে দিয়েই দুহাত জোরে সামনের দিকে ছুড়ে দিল। ফলে দেহের ভারে বাড়তি গতির সৃষ্টি হলো এবং আকস্মিক এই গতির শক্তিই আক্রমণকারীর দেহকে সামনে উল্টে দিল। তার হাত খসে পড়লো আহমদ মুসার নাক ও গলা থেকে।

লোকটি উল্টে গিয়ে পড়েছিল আহমদ মুসার সামনে। তার মাথা আহমদ মুসার একদম দুহাতের মধ্যে।

লোকটি পড়ে গিয়েই পাশ ফিরে উঠে দাঁড়াবার চেষ্টা করছিল। আহমদ মুসা তার ডান হাতের একটি তীব্র কারাত চালাল তার কানের নিচের জায়গায়। তার দেহটা আবার পড়ে গেল মাটির উপর।

আহমদ মুসা তাকে উপুড় করে ফেলে তার দুহাতদ পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল পকেট থেকে অ্যাডেসিভ টেপ বের করে।

তাকাল এবার আহমদ মুসা হাসান তারিকের দিকে। সে আক্রান্ত হবার আগেই বুঝতে পেরেছিল। দেখল, হাসান তারিক তার আক্রমণকারীকে ধরাশায়ী করে ফেলেছে। আহমদ মুসা তার দিকে তাকাতেই হাসান তারিক ফিস ফিস করে বলে উঠল, ‘এ একটু স্লো ছিল, আমার উপর এসে পড়ার আগেই টের পেয়ে যাই।’

‘হাসান তারিক, ওকে বেঁধে ফেল। চল একটু দূরে ওদের সরিয়ে নিয়ে যাই। এদের কাছ থেকে কিছু জানা যায় কিনা দেখতে হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

ওদের টেনে নিয় গেল একদম সাগরের কিনারে। একটা পাথরের উপর ওদের আছড়ে ফেলে দিয়ে আহমদ মুসা বলল, ‘বল তোরা আমাদের উপর আক্রমণ করেছিস কেন?’ হাতের রিভলবারটা ওদের দিকে তাক করল আহমদ মুসা।

প্রবল ক্ষোভ ফুটে উঠেছে লোক দুটির চোখে-মুখে। কিন্তু কথা বলল না।

আহমদ মুসার রিভলবার নড়ে উঠল। প্রায় নিশব্দে একটা গুলী বেরিয়ে ওদের একজনের মাথার কিছু চুল ছিঁড়ে নিয়ে চলে গেল। বলে উঠল তার সাথে সাথেই আহমদ মুসা, ‘একটা সুযোগ দিলাম। দ্বিতীয় গুলীটায় এবার কিন্তু তোমার ডান কানটা উড়ে যাবে। মরার আগে তোমাকে অনেকবার মরতে হবে।’

আহমদ মুসার রিভলবারের নল নড়ে-চড়ে আবার স্থির হলো তার দিকে।

লোকটি মিট মিট করে চাইল। চোখ মুখ তার হঠাৎ শক্ত হয়ে উঠেছে। অকস্মাৎ তার মুখটি ডান দিকে নিচু হয়ে তার সার্টের একটা বোতাম কামড়ে ধরল।

আহমদ মুসা বুঝতে পেরেই হাত থেকের রিভলবারটি ফেলে দিয়ে লোকটির জামার কলার ধরে জোরে টান দিয়ে জামার বোতামটি লোকটির মুখ থেকে সরাতে চাইল কিন্তু পারল না। জামা তার মুখ থেকে সরে এল, কিন্তু বোতাম রয়ে গেল লোকটির মুখেই।

যখন আহমদ মুসা এদিকে ব্যস্ত, তখন হাসান তারিক দ্বিতীয় লোকটির জামা তার গা থেকে ছিঁড়ে খুলে ফেলেছে।

আহমদ মুসা তাকিয়েছিল প্রথম লোকটির লাশের দিকে। বিস্ময় তার চোখে-মুখে। এই হারতাতেই তার চোখের সামনে এ পর্যন্ত WFA-এর তিন জন লোক ধরা পড়ার চাইতে জীবন দেয়া বেশি পছন্দ করল! তার মানে নিজেদের আড়াল করাকে তারা তাদের জীবনের চেয়েও বেশি মূল্যবান মনে করে।

আহমদ মুসা লাশের দিক থেকে চোখ ফিরিয়ে তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, ‘ধন্যবাদ হাসান তারিক। তুমি একজনকে জীবন্ত হাতে রাখতে পেরেছো।’

বলেই আহমদ মুসা ঘুরে দাঁড়াল দ্বিতীয় লোকটির দিকে, লোকটি বলা যায় একজন নব যুবক। চোখে-মুখে একটা দুর্বিনীত ভাব। দেয়ালে পিঠ ঠেকে গেলে যা হয়। আহমদ মুসা তাকে লক্ষ্য করে বলল, 'তোমার সঙ্গী বিনা কারণেই নিজেকে শেষ করল।'

লোকটি কথা বলল না। শুধু একবার তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

আহমদ মুসা আবার বলল, 'তুমি কি ডেভিড ডেনিমের চাকুরী কর?'

লোকটি চমকে উঠে মুখ তুলল। বলল, 'তুমি কি করে তাকে জান?'

'আমরা তো তার কাছেই যাচ্ছিলাম।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ তোমাদেরই এ সময় আসার কথা।' বলল লোকটি।

'তুমি কি করে জান?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'তোমরাই সুলিভান ও কেলভিনদের খুনী।' বলল লোকটি।

'কে বলেছে, ডেভিড ডেনিম? তাহলে তুমি তো সবই জান। তুমি আমাদের সাহায্য করতে পারবে।' শীতল কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'আমি তোমাদের সাহায্য করব?' বলল লোকটি। তার কণ্ঠে বিস্ময়।

আহমদ মুসা বলল, 'হ্যাঁ, তুমি আমাদের সাহায্য করবে। সেটা হলো, আমরা ডেভিড ডেনিম-এর কাছ থেকে না ফেরা পর্যন্ত তুমি এখানে থাকবে এবং বেঁচে থাকবে। তোমাকে দিয়ে আমাদের অনেক কাজ আছে।'

হাসল লোকটিও। বলল, 'তোমরা ডেভিড ডেনিম-এর কাছে যেতে পারার আশা করছ? আবার সেখান থেকে ফিরে আসার আশাও করছ?'

'তিনি আসমানে থাকেন না। কোথায় থাকেন আমরা জানি।' বলল আহমদ মুসা।

'তোমরা আমাদের দুজনকে পরাভূত করে সব জয় করেছ মনে করো না। একবার চেষ্টা করে দেখ।' লোকটি বলল।

আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তুমি এর মুখটা ভালো করে টেপ দিয়ে আটকে দাও। তারপর পাটা বেঁধে ঐ গাছের কান্ডটার সাথে শক্ত করে বেঁধে রাখ।'

হাসান তারিক লোকটিকে নিয়ে একটু উত্তরে তীর ঘেঁষে দাঁড়ানো গাছটার দিকে এগুল।

লোকটি যাওয়ার জন্যে পা তুলে আবার ফিরে তাকিয়ে আহমদ মুসাকে বলল, 'আবার রেখে যাওয়া কেন। আমাকেও মেরে ফেল।'

'বললাম তো তুমি আমাদের অনেক কাজে লাগবে।' বলল আহমদ মুসা।

তারপর হাসান তারিককে লক্ষ্য করে বলল, 'তুমি ওকে বেঁধে সার্চ করে এস। ওকে সার্চ করে দেখা হয়নি। আমি ওকে দেখছি।'

বলেই আহমদ মুসা লাশটির পাশে বসে তাকে সার্চ করতে শুরু করল।

মাত্র কয়েক মুহূর্ত, এক মিনিটও পার হয়নি।

'দাঁড়াও, না হলে গুলী করব।' হাসান তারিকের এই চিৎকার শুনতে পেল আহমদ মুসা।

চমকে পেছন ফিরে দেখল, হাত বাঁধা লোকটি সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়ছে, আর হাসান তারিক গুলী ছুড়ছে তার রিভলবার থেকে।

আহমদ মুসা দ্রুত উঠে দাঁড়াল।

দেখল হাসান তারিকও সাগরে ঝাঁপিয়ে পড়তে যাচ্ছে।

'হাসান তারিক দাঁড়াও।' বলে চিৎকার করে উঠল আহমদ মুসা।

হাসান তারিক আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে থমকে দাঁড়াল।

আহমদ মুসা দৌড়ে গিয়ে পৌছল হাসান তারিকের কাছে।

'কেন নিষেধ করলেন ভাইয়া। তার তো হাত বাঁধা আছে। সাঁতরাতে পারবে না। ধরা যাবে তাকে।' দ্রুতকণ্ঠে বলল হাসান তারিক। তার চোখে-মুখে অনুমতি চাওয়ার ভাব।

আহমদ মুসা শান্ত কণ্ঠে বলল, 'হয়তো তাকে ধরা যেত। কিন্তু এতে তোমার বিপদ বাড়ত। তুমি খেয়াল করনি, যে টেপ দিয়ে ওকে বাঁধা হয়েছিল তা ওয়াটার সলিউল। পানিতে পড়ার সাথে সাথেই ওটা গলে গেছে। দ্বিতীয়ত, খাড়া তীর দেখেই বোঝা যাচ্ছে এখানে সাগর গভীর। তৃতীয়ত, জোৎ¯œার আলো থাকলেও গাছ-গাছড়ার কারণে উপকূলটা অন্ধকার। তার উপর এলাকাটা ওর চেনা। সুতরাং ধরার চেষ্টা বৃথাই হতো।'

‘একটা সুযোগ আমরা হারালাম।’ হতাশ কণ্ঠে বলল হাসান তারিক।

ভাবছিল আহমদ মুসা সাগর এবং ডেভিড ডেনিমের বাড়ির দিকে তাকিয়ে। সেই ৭১ বে ষ্ট্রিট-এর ডেভিড ডেনিমের বাড়িটা একটু উত্তরে সাগরের মধ্যে ঢুকে যাওয়া এই উপদ্বীপাকৃতি ভূখন্ডের মাথার দিকেই নিশ্চয় হবে। আহমদ মুসা নিশ্চিত, লোকটি সাঁতরে ডেভিড ডেনিমের বাড়িতে গিয়েই উঠতে পারে।

হঠাৎ আহমদ মুসার মুখটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

আহমদ মুসা হাসান তারিকের কথার দিকে ভ্রুক্ষেপ না করে বলল, ‘হাসান তারিক আমাদেরকেও সাগরে নামতে হবে।’

ভ্রু কুঞ্চিত হলো হাসান তারিকের। একটু ভাবল। বিস্ময় ফুটে উঠল হাসান তারিকের চোখে-মুখে। বলল, ‘সাগরের পথে ডেভিড ডেনিমের ওখানে যেতে চাচ্ছেন ভাইয়া?’

‘হ্যাঁ হাসান তারিক। এই পথে সংঘাতের সম্ভাবনা কম। অন্তত বিনা সংঘাতে আমরা ডেভিড ডেনিমের বাড়ি পর্যন্ত পৌছতে পারব।’ বলল আহমদ মুসা।

‘একটা বিষয় ভাইয়া, ওদের সতর্কতা ও আমাদের উপর আক্রমণ দেখে মনে হচ্ছে, আমরা আসব ওরা জানত। তাই সব দিক থেকেই আট-ঘাট বেঁধে রেখেছে ওরা।’ হাসান তারিক বলল।

‘তোমার কথা ঠিক হাসান তারিক। কিন্তু জানবে কি করে ওরা?’ বলল আহমদ মুসা।

‘হতে পারে সুলিভানের অন্তর্ধানের বিষয় তারা যেভাবে জানতে পেরেছে, সেভাবেই জানতে পারে।’ হাসান তারিক বলল।

‘তাতে প্রমাণ হয় না আমরা এখানে আসব। ওদের অনেক লোকই তো এভাবে মারা গেছে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ঠিক ভাইয়া। কিন্তু এ কথায় কোন সন্দেহ নেই যে, ওরা বড় কোন সন্দেহ করেছে।’

আহমদ মুসা কোন উত্তর না দিয়ে একটু ভেবে বলল, 'তোমার ব্যাগটা ওয়াটার প্রুফ নয়, আমারটাও নয়। কোন ধরনের বোমাই নেয় যাচ্ছে না। ওগুলো ফেলে দিয়ে চল যাই। আমার বিশ্বাস ওগুলোর প্রয়োজনও হবে না।'

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই ধীরে ধীরে পানির কিনারায় নেমে গিয়ে সাগরের পানিতে গা ভাসিয়ে দিল।

৭১ নং বে ষ্ট্রিট বাড়িটি সাগরে ঢুকে যাওয়া দ্বীপের একেবারে শেষ প্রান্তে গড়ে উঠেছে। দ্বীপের এই শেষ প্রান্তে হঠাৎ করেই মাথা উঁচু করে দাঁড়িয়েছে ছোট ছোট পাহাড়ের টিলায় ভরা পাথরের দেয়াল। সেখান থেকে পাহাড় নেমে গেছে সাগরের পানিতে। উপকূল এখানে দুর্গম। পানির প্রান্ত রেখা থেকে পাথর ও টিলার ফাঁকে ফাঁকে গজিয়ে উঠেছে গাছ। ঢেকে দিয়েছে টিলাকে।

পাহাড়ের দেয়ালকে পেছনে রেখেই তৈরি হয়েছে ৭১ বে ষ্ট্রিট বাড়িটি।

সাগর থেকে সোজাসুজি তাকালে বড় বড় গাছ ও তার ফাঁকে পাথুরে টিলার দৃশ্য ছাড়া আর কিছুই দেখা যায় না। দুপাশ থেকেও ঘন জংগল বাড়িটাকে ঢেকে রেখেছে।

আহমদ মুসারাও মিনি উপদ্বীপটার নাক বরাবর সামনে এসে উপকূলে উঠে বসল। তারা উপরের দিকে তাকিয়ে আলো-আঁধারে ঘেরা জংগল ছাড়া আর কিছুই দেখতে পেল না।

'তাহলে দেখা যাচ্ছে ভাইয়া উপকূলের সাথে বাড়ির কোন সম্পর্ক নেই। আমার দক্ষিণ পাশেও দেখেছি ঘন জংগল। মনে হয় বাড়িটা উপকূল থেকে দূরে দ্বীপের মাঝ বরাবর হবে।' বলল হাসান তারিক।

'বাড়িটা উপকূল ঘেঁষে না হলেও পানি পর্যন্ত নামার কোন প্যাসেজ তারা রাখবে না, তা স্বাভাবিক নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'আমরা কি খুঁজব সে প্যাসেজ?' বলল হাসান তারিক।

'তার প্রয়োজন নেই। সেটা খুঁজতে যে শ্রম এবং সময় যাবে, তা দিয়ে আমরা উপরে পৌছে যাব।' আহমদ মুসা বলল।

প্রায় আধ ঘণ্টার প্রচেষ্টায় আহমদ মুসারা ৩০ ফুট উপরে পাহাড়ের এক গলি পথে উঠে এল। ঘুটঘুটে অন্ধকার। গাছ-পালার বাধা অতিক্রম করে চাঁদের

আলো নিচে পর্যন্ত পৌছতে পারেনি। এর মধ্যেই পশ্চিমমূখী লক্ষ্য ঠিক রেখে এঁকে বেঁকে, কোথাও কোথাও পাহাড় টিলার ছোট ছোট বাধা ডিঙিয়ে তারা এগুতে লাগল।

পনের মিনিট চলার পর একটা টিলার দেয়াল ডিঙিয়ে একটা সমতলে এসে নামতেই তারা একটা বিরাট বাড়ির মুখোমুখি হলো।

বাড়িটা তিনতলা।

বাড়ির ধবধবে সাদা রঙের উপর চাঁদের আলো বাড়িটাকে চারদিকের নিরব পরিবেশে এক স্বপ্নপুরীতে পরিণত করেছে। বিদ্যুতের ঝাঁঝালো আলো ও ইট-পাথরের নগ্ন চেহারা দেখায় অভ্যস্ত আহমদ মুসারা যেন অভিভূত হয়ে পড়ল বাড়িটার দিকে তাকিয়ে।

বাড়িটা এখনও চল্লিশ পঞ্চাশ গজ দূরে। মাঝখানে ছোট ছোট গাছ-গাছড়া ও ঘাসের সবুজ চত্বর।

বাড়ির দুতলা ও তিনতলার কোন কোন জানালা দিয়ে আলোর রেশ বাইরে ছড়িয়ে আছে। গ্রাউন্ড ফ্লোরের গোটাটাই অন্ধকার। বোধ হয় কোন জানালা খোলা নেই, অথবা হতে পারে সবগুলো আলো নিভানো।

আহমদ মুসা চারদিকটা একবার দেখল। পেছনে পাহাড়ের দেয়াল। সামনে দাঁড়িয়ে আছে বাড়িটা, আর সামনের সবুজ চত্বরের উত্তর ও দক্ষিণ দুপাশেই ঘন গাছ-পালার সারি। গাছের সারির নিচটায় ঘুটঘুটে অন্ধকার।

'চল আমাদেরকে চত্বরের পাশে গাছ-পালার অন্ধকারের কভার নিয়ে এগুতে হবে।' হাসান তারিককে লক্ষ্য করে কথাগুলো বলে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা চত্বরের দক্ষিণ পাশ লক্ষ্যে।

হাসান তারিকও হাঁটতে লাগল পাশা-পাশি। দুজনেই শোল্ডার হোলষ্টার থেকে মেশিন রিভলবার বের করে হাতে নিয়েছে।

তারা দুজন হাঁটতে লাগল অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়ে বাড়ির দিকে।

বাড়ির কাছাকাছি পৌছে গেছে তারা।

এক জায়গায় এসে ডান পা মাটিতে ফেলেই আহমদ মুসার মনে হলো, মাটিটা নরম ও পিচ্ছিল।

থমকে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

বাঁ হাত দিয়ে মাটি স্পর্শ করল। মাটি ভেজা। 'হঠাৎ এখানে মাটি ভিজল কি করে?' নিজেকেই প্রশ্ন করল আহমদ মুসা।

বসে পড়ল আহমদ মুসা। পরীক্ষা করে দেখল এক দেড় বর্গফুট জায়গা জুড়ে মাটি ভেজা।

'কি ভাইয়া।' হাসান তারিক ঝুঁকে পড়ে জিজ্ঞাসা করল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল 'বেশ একটু জায়গা জুড়ে মাটি ভেজা। এটা হতে পারে যে, পালানো লোকটি এখানে এসে তার কাপড় চিপেছে। যদি তাই হয়, তাহলে এখানেই কোথাও সাগরে নামার তাদের প্যাসেজ আছে।

'খুঁজে দেখলে হয় না ভাইয়া?' বলল হাসান তারিক।

'বোধ হয় তার প্রয়োজন নেই। চল সামনে এগোই। সাবধান, ওরা কিন্তু সব জানতে পেরেছে।' আহমদ মুসা বলল।

বিড়ালের মত নিশব্দ পা ফেলে এগুচ্ছে আহমদ মুসারা।

বাড়ির দক্ষিণ-পশ্চিম কোণায় পৌছে গেছে তারা। গাছের অন্ধকার থেকে বেরিয়ে একটু ডানে ঘুরে ছয় সাত গজ হাঁটলেই বাড়ির দেয়াল স্পর্শ করা যাবে।

এখান থেকে বাড়ির পুব ও দক্ষিণ পাশটা পরিষ্কার দেখা যাচ্ছে। দুপাশেরই দুতলা তিন তলার অনেকগুলো জানালা দিয়ে আলো দেখা যাচ্ছে।

বাড়ির এ পাশটা পেছন দিক। রাস্তার মুখোমুখি পশ্চিম দিকটা বাড়ির সম্মুখভাব তা নিশ্চিত।

বাড়ির ভেতরটাতেও একদম পিনপতন নিরবতা।

দাঁড়িয়ে পড়েছে আহমদ মুসা।

বাড়িটা কি ফ্যামিলী রেসিডেন্স, না অফিস! ফ্যামিলি রেসিডেন্স হলে এমন ভর সন্ধ্যায় বাড়ি এমন নিরব থাকবে তা স্বাভাবিক নয়।

হঠাৎ তার মনে পড়ল পালিয়ে আসা লোকটির মাধ্যমে নিশ্চয় ইতিমধ্যে সবকিছু জানাজানি হয়ে গেছে। তাই কি এই নিরবতা? ঝড় ওঠার কি পূর্বাভাস এটা?

আহমদ মুসার এই চিন্তা শেষ হবার আগেই তীব্র আলোর একটা ঢেউ এসে তাদের চারদিকটা ভাসিয়ে দিল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই পশ্চিমমুখো হয়ে দাঁড়িয়েছিল। তারা দেখল, তাদের সামনে চারগজের মধ্যে দাঁড়িয়ে উদ্যত ষ্টেনগান হাতে চারজন। তাদের একজনের হাতেই ফ্লাশ লাইট।

সেই চারজনের একজন কোন নির্দেশ দিতে যাচ্ছিল আহমদ মুসাদেরকে।

কিন্তু তার মুখ থেকে কথা বের হবার আগেই আহমদ মুসার দেহ ডান দিকে ছিটকে পড়ল। তার পা দুটি শূন্যে উঠল। আর শূন্য থেকে তার দেহ যখন মাটিতে পড়ছিল তখন তার হাতের এম-১০ গুলী করছিল সেই চারজন লক্ষ্যে।

চোখের পলকে ঘটে গেল ঘটনাটা। চারজন গুলী বৃষ্টির অসহায় শিকারে পরিণত হলো। চারজনেরই গুলীতে ঝাঁঝরা দেহ মাটিতে ঝরে পড়েছে। ফ্লাশ লাইটও পড়ে গেছে মাটিতে। এমনভাবে পড়েছে যাতে আলোর ফ্লাশ দক্ষিণ দিকে ঘুরে গেছে।

আহমদ মুসার সাথে সাথে হাসান তারিকও মাটিতে শুয়ে পড়েছিল শত্রু পক্ষের কোন আক্রমণ হলে তা থেকে বাঁচার জন্যে।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক মাটিতে শুয়ে একটুক্ষণ অপেক্ষা করল ওপক্ষের প্রতিক্রিয়া জানার জন্যে। ওদের চারজনের সবাই মারা গেছে কিনা, ওপক্ষের কোন আক্রমণ আসে কিনা! আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেরই চোখ পশ্চিম দিকে অর্থাৎ ওরা যেখানে গুলী খেয়ে পড়ে গেছে সে দিকে নিবদ্ধ।

ওদিকে অনুসন্ধিৎসু চোখ রেখেই আহমদ মুসা ও হাসান তারিক উঠে বসল। দুজন পাশাপাশি।

আহমদ মুসা ফিস ফিস করে কিছু বলার সাথে সাথে উঠতে যাচ্ছিল। এ সময় আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই অনুভব করল তাদের পিঠে ভারী কিছু একটার স্পর্শ এবং শুনতে পেল পেছন থেকে শান্ত ও শক্ত একটি কণ্ঠ, ‘আমাদের সাথীদের যেভাবে হত্যা করলে আমরাও এখন তোমাদের সেভাবেই

হত্যা করতে পারি। কিন্তু তা করব না যদি অস্ত্র রেখে হাত ওপরে তোল এ মুহূর্তেই।'

ইতিমধ্যে পেছন থেকে আক্রমণকারীদের একজন ফ্লাশ লাইটটি তুলে নিয়ে তার ফ্লাশটা এদিকে ফিরিয়ে দিয়েছে।

আলোতে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে চারদিক আবার।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই হাত তুলেছে। ভারী বস্তুর স্পর্শটা এখনও তাদের পিঠে লেগেই আছে।

ভারী বস্তুর স্পর্শটা ষ্টেনগানের নলের এ কথা শুরুতেই বুঝে নিয়েছে আহমদ মুসা।

আলো জ্বলে উঠতেই পেছন থেকে একজন লোক এসে আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের দুহাত পিছমোড়া করে বেঁধে ফেলল।

পিঠে ঠেসে থাকা ষ্টেনগানের নল ধাক্কা মেরে আহমদ মুসাদের সামনের দিকে ঠেলে দিল। সেই সাথে পেছন থেকে আগের সেই কণ্ঠ বলে উঠল, 'সামনে আগাও। পালাবার চেষ্টা করলে কুকুরের মত গুলী করে মারব।'

যে লোকটি হাত বেঁধেছিল, সেই লোকটি আগে আগে চলল। তার পেছনে চলতে লাগল আহমদ মুসা ও হাসান তারিক।

দুতলায় উঠে একটা হলঘরে প্রবেশ করল তারা।

পুরো কার্পেট মোড়া সোফায় সাজানো ঘর। ঘরের মাঝখানে বড় সোফায় বসে আছে একজন। দীর্ঘ দেহ, রাজসিক পোষাক।

আহমদ মুসারা দরজায় পৌছতেই লোকটি বসে থেকেই বলে উঠল আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে, 'আমি ডেভিড ডেনিম। আপনাদের জন্যেই অপেক্ষা করছি। তবে আর একটু অপেক্ষা করতে হবে। ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসানকে আনার জন্যে লোক পাঠিয়েছি। ওদেরও সাহায্য চাই।'

কথাটা শেষ করে লোকটি চোখ ঘুরাল আহমদ মুসাদের পেছনের ষ্টেনগানধারীর দিকে। বলল, 'ধন্যবাজদ জীম। পেছন থেকে তোমার আক্রমণ খুবই কার্যকরী হয়েছে। যাও ওদের পাশের ঘরে বন্ধ করে রাখ। ওরা এলে এদের নিয়ে আসবে।'

ষ্টেনগানধারী জীম লোকটি আহমদ মুসাদের হলঘর থেকে বের করে নিয়ে পাশের একটি ছোট ঘরে ঢুকিয়ে ঘর বন্ধ করে দিল।

ঘরটার দরজা বন্ধ হতেই অন্ধকারে ডুবে গেল ঘর। ঘরটাতে কোন আলো নেই।

'এই ওয়েটিং রুমের ব্যবস্থা আল্লাহই আমাদের জন্য করেছেন হাসান তারিক।' বলল আহমদ মুসা।

'কেন একথা বলছেন ভাইয়া?' হাসান তারিক বলল।

'মুক্তির পথ বের করার জন্যে একটা এক্সক্লুসিভ সময় পাওয়া গেল।' বলল আহমদ মুসা।

'তা ঠিক। কিন্তু জানালাহীন এ বন্ধ ঘরে পথ কি আমরা পাব?' হাসান তারিক বলল।

'আমাদের কি দিয়ে বেঁধেছে দেখেছ?' বলল আহমদ মুসা।

'অটো প্লাষ্টিক কর্ড।' হাসান তারিক বলল।

'হ্যাঁ। এ কর্ডে গিরা দেয়া যায় না। বাঁধার পর দুই প্রান্ত মুড়ে দিলে প্লাষ্টিক কর্ডের গিরার চেয়ে শতগুণ শক্তিশালী হয়। কিন্তু মুড়ে দেয়া প্রান্ত খোলা খুব সহজ। শুধু উল্টোদিকে ঘুরিয়ে দিলেই হলো।'

হেসে উঠল হাসান তারিক। বলল, 'বুঝেছি ভাইয়া। আপনারটা আমি, আর আমারটা আপনি।'

খুলে গেল দরজা।

খুলে যাওয়া দরজা দিয়ে প্রবেশ করল এক রাশ আলো।

পিছমোড়া করে বাঁধা অবস্থায় পাশাপাশি বসে ছিল আহমদ মুসা ও হাসান তারিক।

আলোর ফ্লাশ গিয়ে পড়েছে তাদের উপর।

জীম নামের লোকটা দরজায় এসে দাঁড়িয়েছে। তার হাতে আগের মতই ষ্টেনগান। তার পেছনে আরও দুজন ষ্টেনগানধারী।

'উঠে এস দুজন।' বলল জীম নামের লোকটা।

উঠল আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই।

জীম আগে আগে চলল। পেছনে আহমদ মুসারা দুজন। তাদের পেছনে দুজন ষ্টেনগানধারী।

ঘরে ঢুকে আহমদ মুসা দেখল, ডেভিড ডেনিম বসে আছে তার সেই সোফায়। তার সামনে পাশাপাশি সোফায় বসে আছে ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসান। তাদের পেছনটা আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু পেছনটা দেখেই আহমদ মুসা চিনতে পারল ওদের।

দরজার ভেতরে দুপাশে আরও দুজন ষ্টেনগানধারী দাঁড়িয়েছিল।

আহমদ মুসা ঘরে ঢুকতেই ডেভিড ডেনিম বলে উঠল জীমকে লক্ষ্য করে, 'ওদের এদিকে নিয়ে এস।' বলেই ইংগিত করল তার ডান পাশে ও সোফিয়া সুসানদের বাম পাশ অর্থাৎ দরজার সোজাসুজি জায়গাটার দিকে।

জীম আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে নিয়ে এল সে জায়গাতেই।

ডেভিড ডেনিম-এর কথা শুনে সোফিয়া সুসান ও ভিক্টর রাইয়া তাকিয়েছিল পেছন দিকে। আহমদ মুসাকে দেখে তারা দুজনেই চমকে উঠল।

বিশেষ করে ছানা-বড়া হয়ে গেছে সোফিয়া সুসানের চোখ। পর মুহূর্তেই ভয় ও উদ্বেগে ফ্যাঁকাসে হয়ে উঠল সোফিয়া সুসানের মুখ।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে এনে দাঁড় করানো হলো ডেভিড ডেনিমের ডানপাশ ও সোফিয়া সুসানদের বাম পাশের মধ্যবর্তী ফাঁকা জায়গাটায়।

আহমদ মুসার মুখোমুখি হবার জন্যে ডেভিড ডেনিম একটু ডানদিকে ঘুরে বসল। ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসানকেও বামদিকে ঘুরে তাকাতে হলো আহমদ মুসাদের দেখার জন্যে।

ষ্টেনগান বাগিয়ে জীম দাঁড়াল আহমদ মুসাদের বাম পাশে ডেভিড ডেনিমের কাছাকাছি জায়গায় আহমদ মুসার দিকে ষ্টেনগান তাক করে।

ঘরে আসা অবশিষ্ট চারজন ষ্টেনগানধারী দাঁড়াল দরজায় আহমদ মুসাদের দিকে চোখ রেখে।

আহমদ মুসা স্থির হয়ে দাঁড়াবার আগেই ডেভিড ডেনিম হো হো করে হেসে উঠল। বলল, 'ভাবছ বোধ হয় তোমার জন্যে ফাঁদ পাতা হলো কি করে? আমরা জানলাম কি করে যে তুমি আসছ!'

থামল ডেভিড ডেনিম। হো হো করে হেসে উঠল আবার। বলল, 'সুলিভানকে খুন করে তার পকেটে চিরকুট পেয়ে ধেয়ে আসছিলে আমাকে পরবর্তী শিকার বানাতে। কিন্তু জানতে না সুলিভানের কাছে যেমন চিরকুট ছিল, তেমনি ছিল একটা ট্রান্সমিটার চীফ যা খুঁজে পাওয়া তোমার সাধ্য ছিল না।'

'আমরা সুলিভানকে জিন্দা চেয়েছিলাম। কিন্তু কেলভিনের মত সুলিভানও নিজেকে নিজেই হত্যা করেছে, এটা আপনি জানেন। সুলিভান হাতছাড়া হবার পরেই চিরকুট থেকে সন্ধান পাওয়ার পর আপনার সন্ধানে এসেছি।' আহমদ মুসা বলল।

'সুলিভানকে কেন জিন্দা চেয়েছিলে? আমার সন্ধানে কেন?' বলল ডেভিড ডেনিম।

'এ প্রশ্নের উত্তর প্রশ্নকর্তার নিজেরই জানা আছে।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসার উত্তরের সঙ্গে সঙ্গে কথা বলল না ডেভিড ডেনিম। আগুন ঝরা তার দৃষ্টি তুলে ধরল সে আহমদ মুসার দিকে। বলল একটু সময় নিয়ে ধীরে ও শক্ত কণ্ঠে, 'তুমি কে জানি না। অনেকেই তোমাকে আহমদ মুসা বলে। কিন্তু আমি তোমাকে অতবড় ভাবতে চাই না। তোমার প্রসংগে পরে আসব। আজ ডেকেছি ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসানকে। ওদের কেসটা সেটে করার জন্যে সুলিভানকে ডেকেছিলাম। সে নেই। কিন্তু তাই বলে ক্ষতি হয়নি কিছু। তার বদলে পেয়েছি তোমাদেরকে, মানে প্রধান আসামীকে। প্রধান আসামীর সামনে বিচার হবে কলাবরেটর আসামীদের।'

বলে ডেভিড ডেনিম তাকাল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, 'ভিক্টর রাইয়া আপনাদের কেন ডেকেছি জানেন?'

ভিক্টর রাইয়া কোন জবাব দিল না। প্রচন্ড বিরক্তি নিয়ে তাকাল শুধু।

'ডেকেছি আপনাকে উপলব্ধি করাবার জন্যে যে আজর ওয়াইজম্যানের 'ওয়ার্ল্ড ফ্রিডোম আর্মি'র বিরুদ্ধে যাওয়ার শাস্তি কত ভয়াবহ।' বলল ডেভিড ডেনিম।

'মি. ডেভিড আপনি আমার দেশে বসে এ দেশেরই একজন দায়িত্বশীল অফিসারকে হুমকি দিচ্ছেন।' ভিক্টর রাইয়া।

হাসল ডেভিড ডেনিম। বলল, 'দেশে জন্ম নিলেই দেশের মালিক হওয়া যায় না। দেশে যাদের শাসন চলে সেই হয় দেশের মালিক। তোমাদের সরকার পার্লামেন্ট ও প্রশাসন ইচ্ছা-অনিচ্ছায় আমাদের শাসনের অধীন। আমরা যা চাই, তাই এখানে হয়। গোলাম বেয়াদব ও বিদ্রোহী হলে তার কি পরিণাম হওয়া উচিত ভিক্টর রাইয়া?'

'মি. ডেভিড, ভালো লোকদের শুভেচ্ছাকে, করুণাকে গোলামী বলে ভুল করছেন। দেশ কেউ বিক্রি করেনি আপনাদের কাছে।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

আবার হাসল ডেভিড ডেনিম। বলল, 'ভিক্টর রাইয়া, শুভেচ্ছার বিনিময়ে করুণার বিনিময়ে কেউ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার হস্তগত করে না, আবার কেউ বিলিয়ন বিলিয়ন ডলার দিয়ে শুভেচ্ছা, করুণা কেনে না। যখন এ ধরনের বিনিময় হয়, তখন সেটা হয়ে থাকে ক্রয়-বিক্রয়। সুতরাং আপনারা বিক্রি হয়েছেন, আমরা কিনে নিয়েছি। ক্রীতদাসরা নিছক গোলামের চেয়েও নিকৃষ্ট কিছু।'

চুপসে গেল ভিক্টর রাইয়ার মুখ। কোন উত্তর সে দিল না।

সেই হাসি হাসল আবার ডেভিড ডেনিম। বলল, 'ভিক্টর রাইয়া, পলা জোনসের বাড়ির হত্যাকান্ড, এ্যামানুয়েলের বাড়িতে সংঘটিত হত্যাকান্ড এবং গোয়েন্দা সদর দফতরের হত্যাকান্ড আপনার জ্ঞাতসারে হয়েছে। বিশেষ গোয়েন্দা সদর দফতরের হত্যাকান্ডে আপনি ও সোফিয়া সুসান শরীক ছিলেন। হত্যার বদলে হত্যার নির্দেশ এসেছে আমাদের কাছে।'

উদ্বেগ ফুটে উঠেছে ভিক্টর রাইয়ার চোখে-মুখে। এবারও কোন কথা বলল না ভিক্টর রাইয়া।

কথা বলল সোফিয়া সুসান। তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। প্রবল ক্রোধ ঠিকরে পড়েছিল তার চোখ-মুখ থেকে। বলল সে, 'টাকায় বিক্রি হওয়া

কয়েকজন লোক দেশের মালিক নয়। দেশের মালিক দেশের জনগণ। তারা কখনো আপনাদের গোলাম নয়, দেশও আপনাদের কেনা সম্পত্তি নয়। আর মি. ডেভিড, আপনাদের ক্রাইম আপনাদেরকে যে পরিণতির শিকার করেছে, তার দায় অন্যের ঘাড়ে চাপাবেন না।' ভীষণ উত্তেজিত কণ্ঠ সোফিয়া সুসানের।

কথাগুলো বলে একটু থামল সোফিয়া সুসান। একটু দম নিয়েই সোফিয়া সুসান আবার বলে উঠল, 'আব্বা উঠুন, আর এক মুহূর্ত নয় এখানে।'

উঠে দাঁড়াল সোফিয়া সুসান।

সোজা হয়ে বসল ডেভিড ডেনিম। বলল সোফিয়া সুসানকে লক্ষ্য করে, 'এটা তোমার কমান্ডো হেডকোয়ার্টার নয়, এটা তোমার প্রভুর হেডকোয়ার্টার।'

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল, 'তোমার শরীর বোধ হয় একটু বেশি গরম। আমরা ঠান্ডা করতেও জানি। কথা শেষ করেই ডেভিড ডেনিম তাকাল দরজায় দাঁড়ানো একজন ষ্টেনগানধারীর দিকে। বলল, 'ডগ, তুমি তো মেয়েদের সঙ্গ একটু বেশি পছন্দ কর। এস সুসানকে একটু ঠান্ডা করে দিয়ে যাও। তার পূজনীয় পিতাসহ সবাই দেখুক, তার দেহের গরম কিভাবে ঠান্ডা হয়।'

বলে ডেভিড ডেনিম তাকাল আহমদ মুসা ও ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, 'ভাববেন না ওর একটুকুও লজ্জা আছে। ওকে আদর করে সবাই আমরা ডগ বলে ডাকি। এ ডগ কুস্তি লড়তো। এখন আমাদের বাহিনীতে।'

'ডগ' নামের লোকটা সোফিয়া সুসানের সামনে এসে দাঁড়াল। তার হাতের ষ্টেনগানটা সে কাঁধে ঝুলাল। তারপর দুহাত বাড়িয়ে সুসানকে ধরে দাঁড় করাতে গেল।

সঙ্গে সঙ্গেই স্প্রিং এর মত উঠে দাঁড়াল ভিক্টর রাইয়া। প্রচন্ড এক ঘুষি চালাল 'ডগ'কে লক্ষ্য করে। ঘুষিটা তার চোখের নিচটাকে আহত করল। ফিনকি দিয়ে রক্ত বেরিয়ে এল সেখান থেকে।

ডগ এর নিচু হয়ে যাওয়া হাতটা ঘুরে এল ভিক্টর রাইয়ার দিকে। দুহাত তার জড়ো হলো। তারপর তা গিয়ে আঘাত করল ভিক্টর রাইয়ার কপালে। ভিক্টর রাইয়ার দেহটা টলে উঠে ঘুরপাক খেয়ে পড়ে গেল মেঝের উপর।

চোখের পলকে ঘুরে গেল ডগ এর দুহাত আবার সুসানের দিকে।

পড়ে গিয়ে টলতে টলতেই আবার উঠে দাঁড়াচ্ছিল ভিক্টর রাইয়া। বলছিল সে, 'আমি বেঁচে থাকতে আমার মেয়ের গায়ে হাত দিতে পারবে না কুকুর।'

ঠিক সে সময়েই চোখের পলকে বেরিয়ে এল ডেভিড ডেনিম-এর হাত পকেট থেকে রিভলবার সমেত। রিভলবার থেকে একটা গুলী বেরিয়ে এল। তা গিয়ে আঘাত করল ভিক্টর রাইয়ার ডান হাতের কব্জীকে। বলে উঠল ডেভিড ডেনিম সেই সাথে, 'এ কিছু নয় ভিক্টর রাইয়া, আমার ডগের গায়ে হাত তোলার ছোট্ট শাস্তি। একটু অপেক্ষা কর সুসানের পর তোমার পালা আসছে।'

ভিক্টর রাইয়া আর্তনাদ করে উঠে বাম হাত দিয়ে ডান হাতটা চেপে ধরে বসে পড়েছিল।

সোফিয়া সুসান ডগ-এর হাতকে পাশ কাটিয়ে চেষ্টা করল তার আহত পিতার দিকে ছুটে আসতে। কিন্তু ডগ তার বাঁ হাত দিয়ে খামচে ধরল সুসানের সার্টের কলার এবং একটা হ্যাচকা টান দিয়ে টেনে নিল নিজের দিকে। সার্টের বাম পাশটা ছিড়ে কাঁধের নিচে নেমে গেল।

সোফিয়া সুসানের বাঁম কাঁধটা আহত ছিল। ওখানে আঘাত পাওয়ায় ককিয়ে উঠল সে। কিন্তু কঁকিয়ে উঠলেও সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়েই তার ডান হাতের ঘুষি চালাল ডগ-এর বাম চোখের সেই আহত জায়গাতেই।

কমান্ডো সুসানের এ ঘুষিটা খুবই কার্যকর হয়েছিল। থমকে গিয়েছিল ডগ। সে দুহাতে চেপে ধরেছিল তার বাম চোখটা।

কিন্তু পরক্ষণেই দুহাত তার নেমে এল চোখ থেকে। তার রক্তাক্ত চেহারা ভয়ংকর হয়ে উঠল। কুস্তির প্রতিপক্ষের মতই সে ঝাঁপিয়ে পড়ল সুসানের উপর।

কমান্ডো সুসান চকিতে নিজেকে সরিয়ে নিল। ডগ উপুড় হয়ে হুমড়ি খেয়ে পড়ল গিয়ে সোফার উপর।

সঙ্গে সঙ্গে সুসান তার ডান হাতের কনুইটাকে তীব্র বেগে ছুড়ে দিল ডগ-এর পিঠের ডান পাশটা লক্ষ্যে।

আঘাত করেই ডগ-এর ষ্টেনগানটা কেড়ে নিল।

কিন্তু ষ্টেনগান নিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়াবার আগেই ডেভিড ডেনিমের রিভলবারের গুলী গিয়ে বিদ্ধ করল সোফিয়া সুসানের ডান হাতকে।

তার হাত থেকে ষ্টেনগান পড়ে গেল।

'জীম, তুমি ষ্টেনগানটা সরিয়ে নাও। ডগটা এখনি উঠবে। তার কাজটা শেষ করা পর্যন্ত আমরা অপেক্ষা করব।' বলল ডেভিড ডেনিম জীমকে লক্ষ্য করে।

জীম তার ষ্টেনগান আহমদ মুসাদের দিকে তাক করে মূর্তির মত দাঁড়িয়েছিল। তার দৃষ্টি সে মুহূর্তের জন্যে আহমদ মুসাদের থেকে বিচ্ছিন্ন করেনি। ডেভিড ডেনিম-এর নির্দেশ পেয়ে সে নড়ে উঠল। মাথা ঘুরিয়ে সে তাকাল সুসানের কাছে পড়ে থাকা ষ্টেনগানের দিকে।

আহমদ মুসা এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল।

পিছমোড়া করে বাঁধা আহমদ মুসার দুহাত নড়ে উঠল। তার হাতের খোলা বাঁধনটি খসে পড়ল হাত থেকে। চোখের পলকে আহমদ মুসার দুহাত ছুটে গেল জীমের ষ্টেনগানের দিকে। কেড়ে নিল ষ্টেনগান।

কেড়ে নিয়েই আহমদ মুসা ব্রাশ ফায়ার করল দরজায় দাঁড়িয়ে থাকা তিনজনকে লক্ষ্য করে।

জীম ঘুরে দাঁড়িয়েছিল।

কিন্তু ততক্ষণে আহমদ মুসার ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরে এসেছে জীমকে লক্ষ্য করে।

ওদিকে হাসান তারিক ঝাঁপিয়ে পড়েছে ডেভিড ডেনিমের উপর। সে তার রিভলবার তুলছিল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

ডেভিড ডেনিম আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে ট্রিগার টিপতে যাচ্ছিল। হাসান তারিক তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ায় ডেভিড ডেনিমের হাতটি বেঁকে যায় এবং সেই সাথে ফায়ারও হয়ে যায়। বুলেটটি গিয়ে বিদ্ধ হয় ডেভিড ডেনিমের দুচোখের সন্ধিস্থলে। মাথাটা এফোঁড়-ওফোঁড় হয়ে যায়।

ওদিকে ডগ উঠে দাঁড়িয়ে তার ষ্টেনগান হাতে তুলে নিয়েছিল। তার ষ্টেনগানের ব্যারেল ঘুরছিল আহমদ মুসার দিকে। কিন্তু তার আগেই সে আহমদ মুসার তৃতীয় ব্রাস ফায়ারের শিকার হলো।

হঠাৎ উৎকর্ণ হয়ে উঠল আহমদ মুসা। বাইরে অনেকগুলো পায়ের শব্দ। এদিকেই ছুটে আসছে।

আহমদ মুসা নিজের জ্যাকেটটি খুলে সোফিয়া সুসানের দিকে ছুড়ে দিয়ে ছুটল দরজার দিকে। বলল, ‘হাসান তারিক তুমিও এস।’

আহমদ মুসা দরজায় পৌছার আগেই কয়েকজন দরজায় এসে গিয়েছিল। প্রত্যেকের হাতেই ষ্টেনগান।

দরজায় যারা এসে দাঁড়িয়েছিল তারা ভেতরের অবস্থা বুঝার জন্যে একটু সময় নিয়েছিল। এ সময়টুকুই ছিল আহমদ মুসার জন্যে বোনাস সময়। আহমদ মুসা দরজার দিকে এগুনো অবস্থাতেই তার ষ্টেনগানের ট্রিগার টিপে দরজার উপর দিয়ে ঘুরিয়ে নিল।

পাঁচজন ওরা এসে দাঁড়িয়েছিল দরজায়। দরজার উপরই স্তুপ হয়ে পড়ে গেল ওদের লাশ।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই গিয়ে দরজায় দাঁড়াল। দুজন দুদিকে উকি দিল।

আহমদ মুসা উকি দিয়েছে বাঁ দিকে। এদিকেই নিচে নামার সিঁড়ি।

আহমদ মুসা দেখল সিঁড়িমুখ থেকে একটু এদিকে দুজন দাঁড়িয়ে। দ্বিধাগ্রস্তভাবে ওরা এগিয়ে আসছিল। ওদের ষ্টেনগানের ব্যারেল কিছুটা নিচু।

আহমদ মুসা ওদের দেখেই বলে উঠল, ‘ষ্টেনগান হাত থেকে ফেলে দাও।’

ওরাও দেখে ফেলেছে আহমদ মুসাকে। সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে ওরা। ওদের ষ্টেনগান উঠে আসছে আহমদ মুসা লক্ষ্যে।

কিন্তু লক্ষ্য পর্যন্ত উঠে আসার সুযোগ পেল না ওদের ষ্টেনগান। তার আগেই আহমদ মুসার ষ্টেনগান থেকে ছুটে যাওয়া এক ঝাঁক গুলী দুই ষ্টেনগানধারীর দেহকে ঝাঁঝরা করে দিল।

হাসান তারিক আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল।

‘হাসান তারিক, তুমি দুপাশের ঘরগুলো দেখ, কোন কাগজ-পত্র পাওয়া যায় কিনা। আমি এদের সার্চ করে দেখি।’ বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসা ঘরে প্রবেশ করল। দেখল, সোফিয়া নিজের ছেঁড়া জামাটা ছিড়ে ফেলে সেই টুকরো দিয়ে তার পিতা ভিক্টর রাইয়ার হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধার

চেষ্টা করছে। তার পিতা বাঁ হাত দিয়ে সহযোগিতা করছে। কিন্তু দুই বাম হাত মিলেও কাজটা ভালভাবে করতে পারছে না।

আহমদ মুসা দ্রুত গিয়ে বলল, 'সুসান দাও মি. রাইয়ার ব্যান্ডেজটা আমি বেঁধে দেই।'

বলে সুসানের হাত থেকে কাপড় নিয়ে ভিক্টর রাইয়ার হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধতে বাঁধতে বলল, 'আল্লাহকে ধন্যবাদ মি. রাইয়া, বুলেটটা কব্জীর হাড়কে আঘাত করলেও তা পাশ কেটে গেছে। বড় রকমের ফ্রাকচার মনে হয় হয়নি।'

'ঈশ্বরের আগে ধন্যবাদ আপনার প্রাপ্য আহমদ মুসা। আমরা কৃতজ্ঞ।' বলল ভিক্টর রাইয়া আবেগ জড়িত কণ্ঠে।

আহমদ মুসা ভিক্টর রাইয়ার ব্যান্ডেজ শেষ করে সোফিয়া সুসানের দিকে এগুতে এগুতে বলল, 'আমি যেটা করেছি, সেটা ঈশ্বরই করিয়েছেন। সুতরাং সব প্রশংসা তাঁরই প্রাপ্য মি. রাইয়া।'

আহমদ মুসা মেঝে থেকে সুসানের ছেঁড়া জামা তুলে নিয়ে একটু ছিঁড়ে নিয়ে বলল, 'তোমার হাতটা দাও সুসান।'

আহমদ মুসার দেয়া জ্যাকেটটা পরতে পারেনি সুসান। বাঁম কাঁধটা আহত থাকায় বাঁ হাত নাড়ানো তার জন্যে কষ্টকর ছিল। ডান হাতটা গুলী বিদ্ধ হওয়ায় সেটাও কাজ করছিল না। তবুও বাম হাত দিয়ে কষ্ট করে জ্যাকেটটা সে ধরে রেখেছিল গায়ের উপর। ধীরে ধীরে সে তার ডান হাতটা আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে দিল এবং বলল, 'ঈশ্বর কিন্তু সবাইকে দিয়ে কাজ করান না।'

'হ্যাঁ, ঠিক। আপনাকে দিয়ে আল্লাহ আজ মূল কাজটি করিয়ে নিয়েছেন এজন্যে আপনাকে ধন্যবাদ।' আহমদ মুসা বলল।

'কিভাবে?' বলল সোফিয়া সুসান।

'আপনি' ডগকে কাবু করে ও জীমকে আমাদের সার্বক্ষণিক পাহারা থেকে সরিয়ে এনে আমাদেরকে এ্যাকশনে আসার সুযোগ করে দিয়েছেন।'

হাসল সোফিয়া সুসান। বলল, 'লড়াই-এর পথ দেখানো আর লড়াই করা এক জিনিস নয়। যাক। আমি বিস্মিত হয়েছি, আপনাদের বাঁধা হাত কখন কিভাবে খুলে গেল?'

‘পিছমোড়া করে বেঁধে দুজনকে যদি একই জায়গায় নিরিবিলি রাখা হয়, তাহলে তাদের বাঁধন খোলা সমস্যা হয় না। আমাদেরকে বেঁধে ওরা পাশের ঘরে রেখেছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। আপনাদের বাঁধন খোলা না থাকলে, আপনারা সাহায্য করতে না পারলে সর্বনাশ রোধ করা যেত না। মরতেও হতো আমাদের দুজনকেই। আব্বা ঠিকই বলেছেন। সত্যিই আমরা কৃতজ্ঞ।’ বলল সোফিয়া সুসান।

আহমদ মুসা ততক্ষণে সোফিয়া সুসানের ব্যান্ডেজ বাঁধা শেষ করে ফেলেছে।

সুসানের কথার উত্তরে কোন কথা না বলে আহমদ মুসা লাশগুলোর পকেট সার্চ শুরু করে দিল। জীম থেকেই সে প্রথম কাজ শুরু করল।

হাতে ব্যান্ডেজ বাঁধার পর সোফিয়া সুসান আহমদ মুসার জ্যাকেটটা কষ্ট করে হলেও পরতে পারল। জ্যাকেট পরে নিয়ে সোফিয়া সুসান বলল, ‘সার্চে আমিও আপনাদের সাহায্য করতে পারি।’

বলে সোফিয়া সুসান সার্চের জন্যে ডেভিড ডেনিমের দিকে এগুলো।

‘আসলে আপনি কি চাচ্ছেন আহমদ মুসা?’ প্রশ্ন করল ভিক্টর রাইয়া আহমদ মুসাকে।

‘সাও তোরাহ দ্বীপ সম্পর্কে জানতে চাই, জানতে চাই সাও তোরাহ দ্বীপে ওদের যাতায়াতের মাধ্যম মিনিসাব-এর গতিবিধি সম্পর্কে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘মিনি সাব এর গতিবিধি দিয়ে কি করবেন। সাও তোরাহ যাবার জন্যে কি মিনিসাব ব্যাবহার করতে চান?’ জিজ্ঞাসা ভিক্টর রাইয়ার।

‘ঠিক তাই।’ বলল আহমদ মুসা।

‘কেন, যে কোনভাবেই তো সাও তোরাহ যাওয়া যায়।’ সোফিয়া সুসান বলল।

‘যাওয়া যায়, কিন্তু তাতে মিশন সফল হওয়ার সম্ভাবনা কম। আকাশ পথ কিংবা সী-সারফেস দুপথের যে দিক দিয়েই যাওয়া হোক ওদের চোখে ধরা পড়তে হবে। তাতে তারা বন্দীদেরকে নিয়ে পালাবার সুযোগ পাবে মিনি-সাব এ

করে। অথবা বন্দীদের হত্যা করে তারা আমাদের মিশনটাকেই ব্যর্থ করে দিতে পারে।' বলল আহমদ মুসা।

'বুঝেছি।' বলল সোফিয়া সুসান। তারপর তাকাল তার পিতা ভিক্টর রাইয়ার দিকে। বলল, 'তাহলে আব্বা তুমিই একটা ব্যবস্থা কর না 'মিনি-সাবে'র। সেটাতে চড়ে ওঁরা যাবেন।'

'মিনি-সাব বা সাবমেরিন আমাদের গোয়েন্দা বিভাগের নেই। নৌবাহিনীর আছে। কিন্তু সেসব ডিফেন্স কমান্ডোর অধীন।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

'হ্যাঁ, আমরা কমান্ডো ইউনিটও মিনি-সাব ব্যবহার করি। কিন্তু এ মিনি-সাবগুলোর যাতায়াত কেন্দ্রীয়ভাবে মনিটর করা হয়। নিশ্চয় সাও তোরাহ দ্বীপে এ্যালাও করবে না। তবে সাও তোরাহের জন্যে বিশেষ প্রোগ্রাম তৈরী করা যায় আজ এদের যে ভয়াবহ রূপ দেখলাম তার ভিত্তিতে।' সোফিয়া সুসান বলল।

'না সুসান, এভাবে প্রোগ্রাম তৈরী করলেও তা কোন কাজ দেবে না। কারণ এ খবর ফাঁস হয়ে যাবে এবং সাও তোরাহ সাবধান হয়ে যাবে। দ্বিতীয়ত আমি শুনেছি, সাও তোরাহ দ্বীপের আকাশ থেকে তোলা গোয়েন্দা ফটোতে সাও তোরাহ দ্বীপে কোন ডেক বা কোন জেটি খুঁজে পাওয়া যায়নি। এমনকি মানুষের বসবাসযোগ্য কোন স্থাপনাও নয়। এই অবস্থায় তোমাদের মিনি সাব ওখানে পৌছলেও লাভ হবে না। ওদের ঘাঁটি খুঁজে পাওয়া যাবে না।' বলল আহমদ মুসা।

সার্চ করা ফেলে সোফিয়া সুসান সোজা হয়ে দাঁড়াল। তাকাল সে আহমদ মুসার দিকে। তার চোখে বিস্ময় বিমুগ্ধ দৃষ্টি।

কিছু বলার জন্যে সে মুখ হা করেছিল। কিন্তু তার আগেই তার পিতা ভিক্টর রাইয়া বলে উঠল, 'ঠিক বলেছেন। এমন গোয়েন্দা ছবি আমিও দেখেছি। আপনার কথা ঠিক।'

ভিক্টর রাইয়া থামতেই সোফিয়া সুসান বলে উঠল, 'আপনি এত কিছু চিন্তা করছেন? এত দুরদৃষ্টি আপনার? আপনি তথ্য ফাঁস হওয়ার কথা বললেন। কিন্তু সিদ্ধান্ত হবে কমান্ডো অপারেশন কমান্ড থেকে। সেখান থেকে তথ্য ফাঁস হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমার কথাই হয়তো ঠিক। কিন্তু একটু আগে ডেভিড ডেনিমের কাছ থেকে জেনেছ ওরা টাকা দিয়ে সবকিছুই কিনে থাকে। এটা সত্য হলে এদের কেনার হাত কোন পর্যন্ত পৌছেছে কিনা কি করে জানবে? সুতরাং সন্দেহ থেকেই যায়।’

মুখ ম্লান হয়ে গেল সোফিয়া সুসানের। ছোট্ট করে বলল, ‘স্যরি মি. আহমদ মুসা। আমাদের জাতির দুর্ভাগ্য যে, তাদের শ্রেষ্ঠ সন্তানরাও বিক্রি হয়।’

বলে আবার সার্চ করায় মনোযোগ দিল সোফিয়া সুসান।

‘এটা আপনার জাতির একার দুর্ভাগ্য নয়। পৃথিবীর বহুদেশের বহুজাতির অসংখ্য শ্রেষ্ঠ সন্তান ইহুদীবাদীদের টাকার কাছে বিক্রি হয়েছে অথবা ওদের ষড়যন্ত্রের ফাঁদে আত্মসমর্পণ করতে বাধ্য হয়েছে। শতাধিক বছর ধরে জর্জ ওয়াশিংটন আব্রাহাম লিংকন-টমাস জেফারসনের দেশ মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র ওদের কুটবুদ্ধির দ্বারা ডোমিনেটেড হয়েছে, ওদের স্বার্থের বাহন সেজে শান্তির নামে অশান্তির ধ্বজা উড়িয়েছে দুনিয়ায়। সবে সে দেশটি মুক্তি লাভ করেছে ওদের অক্টোপাশ থেকে। অনেক দেশ এখনও মুক্তি পায়নি। তোমাদের আজোরস তারই একটু ক্ষুদ্র দৃষ্টান্ত।’ বলল আহমদ মুসা।

আবার সোজা হয়ে দাঁড়িয়েছে সোফিয়া সুসান। তাকাল আহমদ মুসার দিকে। আবেগে তার চোখ-মুখ ভারী হয়ে উঠেছে। বলল, ‘মার্কিনীদের এই মুক্তির একটা নিমিত্ত আপনিও ছিলেন। আমরা এবং আমাদের জাতীয় মর্যাদা কোথায় পৌঁছেছে তার কিছুটা তো আজ জানলেন। আপনি কি আমাদের আজোরসকে সাহায্য করবেন।’ আবেগে রুদ্ধ হয়ে গেল সোফিয়া সুসানের কণ্ঠ। দুচোখে তার টলটল করতে লাগল অশ্রু।

ম্লান হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘এ সুযোগ যদি আমার ভাগ্যে ঘটে, আমি আনন্দিত হবো সুসান।’

সোফিয়া সুসান সামনে মাথা ঝুঁকিয়ে কোমর বাঁকিয়ে বাও করল আহমদ মুসাকে। তার দুচোখ থেকে নেমে এল দুফোটা অশ্রু।

চোখ মুছে আবার সার্চের কাজ শুরু করল সোফিয়া সুসান।

আহমদ মুসা ও সোফিয়া সুসান মোট ১৪টি মৃতদেহ সার্চ করল। কিন্তু আশ্চর্য কারও পকেটেই কিছু পেল না। একেবারে শূন্য পকেটগুলো। পকেটে তাদের মানিব্যাগ আছে, কিন্তু তাতে টাকা ছাড়া আর কিছুই নেই।

এ সময় ফিরে এল হাসান তারিকও। বলল, 'দুতলার সবগুলো কক্ষই বেড রুম। এই হলঘরের পাশে একটা অফিসরুম রয়েছে, সেখানে টেবিল, চেয়ার ও একটি কম্পিউটার। কম্পিউটারটিও শূন্য।'

'ঠিক ওদের পকেটের মত।' বলল আহমদ মুসা।

বলেই একটু ভাবল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলে উঠল, 'আমার মনে হচ্ছে মি. ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসানের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেয়ার পর তারা তাদের সব ডকুমেন্ট সরিয়েছে, কম্পিউটারও খালি করেছে।'

'কেন?' বলল ভিক্টর রাইয়া।

'আপনাদের হত্যার পর প্রশাসনের অন্তত একটা অংশ থেকে রিটালিয়েশন হতে পারে, এ ভয়েই তারা তাদের পরিচয়ের সব রকম চিহ্ন গোপন করে ফেলেছে।'

'ঠিক বলেছেন মি. আহমদ মুসা। এটাই এর একমাত্র ব্যাখ্যা।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

ভিক্টর রাইয়া দাঁড়িয়েছিল ডেভিড ডেনিমের লাশের পাশে।

তাকাল আহমদ মুসা ভিক্টর রাইয়ার দিকে কিছু বলার জন্যে।

ভিক্টর রাইয়ার দিকে তাকাতে গিয়েই আহমদ মুসার নজর পড়ল ডেভিড ডেনিমের গলায় থাকা একটা চকচকে জিনিসের উপর। পাশেই দাঁড়িয়েছিল সোফিয়া সুসান। আহমদ মুসা সোফিয়া সুসানকে জিজ্ঞেস করল, 'মি. ডেভিডের গলায় চকচকে ওটা কি?'

'সোনার একটা ক্রস।' বলল সোফিয়া সুসান।

'ইহুদী ডেভিডের গলায় খ্রীষ্টের ক্রস!'

বলে আহমদ মুসা দ্রুত এগিয়ে একটু ঝুঁকে পড়ে সোনার ক্রসটা সোনার চেন থেকে ছিঁড়ে নিল। ধরল চোখের সামনে। বলল স্বগত কণ্ঠে, মোটা-সোটা

এতবড় ক্রস তো কারও গলায় কখনও দেখিনি। আর একজন কট্টর ইহুদীবাদী ক্রস পরবে এটাও অবিশ্বাস্য ঘটনা।

বলে উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল আহমদ মুসা ক্রসটিকে।

হঠাৎ ভ্রুকুচকে গেল আহমদ মুসার। সে দেখল ক্রসের দুপাশেই লম্বা-লম্বি জোড়া লাগানোর মত সোজা সরল রেখা।

আহমদ মুসা ক্রসটা দুহাতে ধরে জোড়ার মত লাইনের দুপাশে দুহাতের দুআঙুলের নখ সেট করে দুদিকে টান দিল।

সংগে সংগে দুভাগ হয়ে গেল ক্রসটি। ভেতর থেকে বেরিয়ে এল দুটি ফাইবার চীপ। চীপ দুটি হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। বিস্ময় তার চোখে-মুখে।

চোখ বুলাল চীপস দুটির উপর। দেখল দুটিতেই কয়েকটি ইংরেজী বর্ণ ও কয়েকটি করে ইংরেজী অংক খোদাই করা। পড়ল আহমদ মুসা। প্রথমটিতে লেখা 'FAMS 00654123' এবং দ্বিতীয়টিতে খোদাই করা হয়েছে 'FAST 00456321'

সবাই দেখছিল আহমদ মুসাকে। সবার চোখে-মুখে বিস্ময়। ক্রসও কোন কিছু লুকানোর আধার হতে পারে তাহলে!

'ওগুলো মনে হচ্ছে ফাইবার চীপস। ওগুলোতে কিছু লেখা আছে?' বলল সোফিয়া সুসান।

আহমদ মুসা কোন কথা না বলে চীপস দুটি তুলে দিল সুসানের হাতে।

ওরা একে একে সবাই দেখল চীপস দুটিকে। সর্বশেষে হাতে পেল ভিক্টর রাইয়া।

ভিক্টর চীপস দুটিতে চোখ বুলিয়েই বলে উঠল, 'চীপস দুটি গুরুত্বপূর্ণ কোড নাম্বার বহন করছে।'

'জি সেটা পরিষ্কার। কিন্তু কোড নাম্বার কিসের হতে পারে?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

'চীপসের কোডে ৮টি ডিজিট থেকে ধরে নেয়া যেতে পারে ওগুলো কোন লককে আনলক করার কোড নাম্বার। সে লক কম্পিউটারেরও হতে পারে। কিন্তু

বর্ণমালাগুলো দ্বারা কি বুঝাচ্ছে তা জানতে পারলে রহস্যের সমাধান সহজ হতো।' বলল ভিক্টর রাইয়া।

গভীর চিন্তায় ডুবে গিয়েছিল আহমদ মুসা।

সে চীপস দুটি ভিক্টর রাইয়ার হাত থেকে নিয়ে আবার নজর বুলাতে লাগল। উল্টে-পাল্টে দেখতে লাগল ভালো করে। এক জায়গায় গিয়ে তার চোখ আটকে গেল। দেখল, প্রথম চীপসের শেষ ডান প্রান্তে সোনালী রংয়ের চীপসে সোনালী রংয়ের একটা এ্যারো আরও ডান দিককে মানে বাইরের দিককে ইংগিত করছে। এর বিপরীত দৃশ্য দ্বিতীয় চীপসটিতে। সেটার বাম প্রান্তে একটি এ্যারো। এ্যারোর মাথা ভেতর দিকে, মানে কোডকে ইংগিত করছে।

আহমদ মুসা দেখাল এ্যারোটি সকলকে। বলল, 'দুচীপসের দুকোডের মধ্যে সম্পর্ক রয়েছে। যে চীপসের এ্যারো বাইরের দিককে ইংগিত করছে, সেটা প্রথম ব্যবহার করতে হবে এবং যে চীপসের এ্যারো ভেতরমুখি হয়ে কোডকে ইংগিত করছে সেটা দ্বিতীয়, একে প্রথমটার পরে ব্যবহার করতে হবে।'

হাসি ফুটে উঠল ভিক্টর রাইয়ার মুখে। বলল, 'আপনার রহস্যভেদী জ্ঞান অতুলনীয়। এখন বাকি থাকল বর্ণমালাগুলোর অর্থ উদ্ধার।'

হঠাৎ আহমদ মুসার চোখ মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। কিন্তু পরক্ষণেই নিজেকে সামলে নিয়ে সে স্বাভাবিক হয়ে গেল। তারপর চীপসগুলো ক্রসে পুরে পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'রহস্য উদ্ধার যখন শুরু হয়েছে, তখন শেষও শীঘ্রই হয়ে যাবে ইনশাআল্লাহ।'

কথা শেষকরে একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'না এখানে আর দেরি নয়। আপনারা আহত। চলুন আমরা যাই। যাবার সময় নিচের ফ্লোরটা একটু দেখে যেতে হবে।

বলেই তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তুমি আগে চলবে সাবধানে, দেখে-শুনে। শত্রু লুকিয়ে থাকতে পারে সুযোগের অপেক্ষায়। আর পেছন দিকটা দেখার দায়িত্ব আমার।'

নির্দেশের সাথে সাথেই ষ্টেনগান হাতে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল হাসান তারিক।

ভিক্টর রাইয়া ও সোফিয়া সুসানও হাঁটতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করেই আবার থমকে দাঁড়াল। বলল, 'দাঁড়াও হাসান তারিক।'

দাঁড়িয়ে পড়ল সবাই।

'হাসান তারিক, ডেভিড ডেনিমের মৃতদেহ রেখে যাওয়া যাবে না। তুলে নিয়ে সাগরে ডুবিয়ে রাখতে হবে, অথবা অন্য কোথাও লুকাতে হবে যাতে তার মৃতদেহ কেউ না পায়।'

'কেন? এর কি প্রয়োজন? সবার মৃতদেহই তো থাকছে।' আহমদ মুসা কথা শেষ করতেই বলে উঠল সোফিয়া সুসান।

'তার লাশ এখানে থাকলে আজর ওয়াইজম্যান অবশ্যই জেনে যাবে যে, ডেভিড ডেনিমের গলায় ক্রসটা নেই, তখন সে অবশ্যই সন্দেহ করতে পারে যে, দুটি কোড নাম্বার শত্রুর হাতে পড়ে গেছে। তার ফলে এই কোড দিয়ে আর কোন লাভ হবে না।' বলল আহমদ মুসা।

সোফিয়া সুসানের বিমুগ্ধ দৃষ্টি আহমদ মুসার উপর। বলল, 'কিন্তু একথাও তো মনে করতে পারে টাকার লোভেই কেউ ক্রসটা নিয়ে গেছে।'

'টাকার লোভ থাকলে এতগুলো মানিব্যাগ তারা নেয়নি কেন? তাছাড়া আজর ওয়াইজম্যান জানে যারা এই লড়াই করেছে, তারা টাকার জন্যে লালায়িত নয়।' আহমদ মুসা বলল।

'ধন্যবাদ।' বলল সোফিয়া সুসান। অসীম মুগ্ধতায় আলোকিত সোফিয়া সুসানের গোটা চেহারা।

'আমারও ধন্যবাদ গ্রহণ করুন আহমদ মুসা। আপনাকে যতই দেখছি, ততই অভিভূত হয়ে পড়ছি।' ভিক্টর রাইয়া বলল।

ভিক্টর রাইয়া যখন কথাগুলো বলছিল, তখন এদিকে কান না দিয়ে আহমদ মুসা এগিয়ে গিয়ে ডেভিড ডেনিমের লাশ কাঁধে তুলে নিচ্ছিল।

ছুটে এল হাসান তারিক।

‘আপনি জানেন ভাইয়া, এ ধরনের ভার বইতে আমার খুব ভাল লাগে।’ বলে আহমদ মুসার হাত থেকে ডেভিড ডেনিমের লাশ ছিনিয়ে নিয়ে তা নিজের কাঁধে তুলে নিল।

সোফিয়া সুসান তার আহত হাত দিয়েই একটা ষ্টেনগান তুলে নিল এবং গুলীর ম্যাগাজিনটা পরীক্ষা করল। তারপর বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘এবার মি. হাসান তারিকের দায়িত্ব আমি পালন করব।’

বলে সামনে এগিয়ে সবার সামনে সে হাঁটতে লাগল।

‘ধন্যবাদ সুসান। তুমি সত্যিই একজন কমান্ডো।’ বলল আহমদ মুসা।

‘ভুলে যাচ্ছেন বোধ হয় যে, আপনি আহমদ মুসা। সাধারণ কারও জন্যে আপনার মুখ থেকে এতবড় প্রশংসা মানায় না।’

‘এটা প্রশংসা নয়, সত্যের স্বীকৃতি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনার এই কথা এবং সবকিছু আমার কাছে স্বপ্ন মনে হচ্ছে। ভয় হচ্ছে স্বপ্ন না আবার ভেঙে যায়।’ আবেগে গলাটা কাঁপল সুসানের।

বলেই দ্রুত চলতে শুরু করেছে সুসান।

সবাই চলতে শুরু করল।

আহমদ মুসাও।

৪

সান্তাসিমা উপত্যকার পাশে হাইওয়ে থেকে একটু নেমে গাড়ি দাঁড়িয়ে পড়ল।

গাড়ির ড্রাইভিং সিট থেকে প্রথমে নামল হাসান তারিক।

আহমদ মুসাও নামল তার পরে পাশের সিট থেকে।

'ঠিক এখান দিয়েই সুলিভানের গাড়িকে রাস্তায় উঠতে দেখেছিলাম।' বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা চারদিকে তাকাল। দেখল, তারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছে সেখান থেকে বড় গাছ পালা মুক্ত একটা করিডোর এঁকে-বেঁকে সামনে এগিয়ে গেছে। তার দুপাশেই ঝোপ-ঝাড় ও গাছ-পালা। পাথরে-মাটিতে মেশানো ভূমি। ঘাসে ঢাকা।

'সুলিভান নিশ্চয় গাড়িটা সড়ক থেকে দেখা যাবে এমন জায়গায় পার্ক করেনি। মনে হয় যতটা পেরেছে ভেতরে নিয়েছে। এখন দেখ, গাড়ি যাওয়ার চিহ্নটা খুঁজে পাওয়া যায় কিনা। তাহলে কিছুটা অন্তত পরিষ্কার হবে যে, কেন সে এখানে এসেছিল? এদিকে তাদের নতুন কোন আস্তানা আছে কিনা।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই গাড়ির চাকার চিহ্ন খুঁজতে লাগল। যে গাড়ি সুলিভান ব্যবহার করেছিল তা বড় গাড়ি না হলেও আমেরিকান কারটির ওজন কম নয়। এ ওজনের চাপে কচি ঘাস যে থেতলে যাবে, পাতা ছিঁড়ে যাবে, কচি গাছগুলো ভেঙে যাবে, তা খুবই সাধারন দৃশ্য।

আহমদ মুসারা এই চিহ্নই সন্ধান করতে লাগল।

অবাক হলো তারা সন্ধান করতে গিয়ে। দেখল, ঘাসে ঢাকা করিডোরটার মাঝামাঝি লম্বা-লম্বি গোটা জায়গারই ঘাস অনেকটা থেতলানো, পাতা ছেঁড়া এবং কচি গাছও মাঝে মাঝে পিষ্ট হওয়া। বিস্ময়ের ব্যাপার হলো, থেতলানো ও ছেঁড়া

কোন ঘাস বা কচি গাছ মরে শুকিয়ে গেছে, কোনটা আবার থেতলানো ও ছেঁড়া হলেও ঐভাবে মরে যায়নি। বিস্মিত আহমদ মুসা বিষয়টার দিকে হাসান তারিকের দৃষ্টি আকর্ষণ করল।

ভ্রুকুঞ্চিত হলো হাসান তারিকের। বলল, 'ঠিক বলেছেন ভাইয়া। বিষয়টা এতক্ষণ আমি খেয়াল করিনি। এটা একটা বিরাট ব্যাপার। এর অর্থ হলো, শুধু সুলিভানের গাড়ি নয়, এ ধরনের গাড়ি এখানে আগেও এসেছে। হয়তো বার বারই এসেছে।'

ভাবছিল আহমদ মুসা। বলল, 'আর সুলিভানদের মত গাড়ি বার বার আসার অর্থ হলো, সামনে এমন কিছু আছে, যেখানে গাড়িগুলো এসেছে।'

'ঠিক বলেছেন ভাইয়া। কিন্তু প্রশ্ন হলো, সান্তাসিমা উপত্যকার পাথুরে জেটি ছাড়াও তাদের আর কোন ঘাঁটি কি এদিকে আছে, কেলভিনের কথায় কিন্তু এটা বুঝা যায়নি।' বলল হাসান তারিক।

'সান্তাসিমার এ পাশটাকে সান্তাসিমা উপত্যকার বাইরে ধরছ কেন?' আহমদ মুসা বলল।

'তাও হতে পারে।'

'চল, গাড়ির এ ট্রাক ধরে আমরা এগিয়ে যাই।'

বলে হাঁটা শুরু করল আহমদ মুসা।

হাসান তারিকও চলল পাশাপাশি।

যতই সামনে, মানে উত্তরে এগুতে লাগল তারা, ততই এঁকে-বেঁকে অনেক ঝোপ-ঝাড় পাশ কাটিয়ে এগিয়ে যাওয়া ঘাসের করিডোরটায় ছোট-খাট আগাছা ও গাছ-গাছড়ার সংখ্যা বাড়তে লাগল। এখানে গাড়ি যাতায়াতের ট্রাকটা আরও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে।

বিস্ময় বাড়তে লাগল আহমদ মুসা ও হাসান তারিকের। জংগলের মধ্যে এভাবে গাড়ি নিয়ে আসার রহস্য কি! রহস্য কি না বুঝলেও কোন একটা বড় ব্যাপার আছে, সে বিষয়ে তারা নিশ্চিত হলো।

একটা পাহাড়ের বড় টিলার গোড়ায় এসে তাদের এই যাত্রা শেষ হয়ে গেল। দেখল, টিলাটার গোড়ায় এসে গাড়ি চলার সেই ট্রাকটা শেষ হয়ে গেছে।

আহমদ মুসারা থমকে দাঁড়াল সেখানে।

চারদিকে তাকাল আহমদ মুসা।

'ভাইয়া উপকূল কিন্তু খুব বেশি দূরে নয়।' বলল হাসান তারিক।

'কিন্তু সামনেটা আরও উঁচু হয়ে উঠেছে। সান্তাসিমা উপত্যকার মত ভূমি হঠাৎ নিচু হয়ে উপকূলের সমান্তরাল হয়ে যায়নি।' আহমদ মুসা বলল।

'হ্যাঁ ভাইয়া। আমার মনে হয় সামনের পাহাড়টা সাগর থেকে উঠে এসেছে। সেখানে হয়তো আমরা কোন নাব্য উপকূল পাব না।' বলল হাসান তারিক।

'আমরা উপকূলে যাচ্ছি না হাসান তারিক। গাড়ির লোকরা কোথায় এসেছিল সেটা খুঁজছি। আমার ধারণা এটা ওদের উপকূলে যাবার কোন রাস্তা নয়। মিনি-সাবের নোঙরের জন্যে তারা যে সান্তাসিমার পাথুরে জেটিটাকেই ব্যবহার করে, সেটা তো সেদিন আমরা নিজেদের চোখেই দেখিছি।' আহমদ মুসা বলল।

'এই জংগলে তাহলে তারা কেন আসবে?' বলল হাসান তারিক।

ভাবছিল আহমদ মুসা। বলল এক সময় সে উৎসাহিত কণ্ঠে, 'খেয়াল করেছ হাসান তারিক, সেদিন মিনি-সাব যখন সান্তাসিমা জেটিতে এসেছিল, সে সময়টাতেই সুলিভান এই জংগলে বা এই এলাকায় ছিল।'

'ভাইয়া তাহলে আপনি বলতে চাচ্ছেন, মিনি-সাব নোঙর করা ও সুলিভান এখানে আসার মধ্যে একটা যোগসূত্র আছে।' হাসান তারিক বলল।

'যোগসূত্র না থাকলে ঠিক এ সময় সুলিভান এখানে এসেছিল কেন?' স্বগত প্রশ্ন আহমদ মুসার।

'জেটিতেই তো আমরা লুকিয়ে ছিলাম। সুলিভান তো সেখানে যায়নি।' বলল হাসান তারিক।

'হতে পারে সুলিভান বা মিনি-সাব আমাদের অবস্থান টের পেয়েছিল। সুলিভানও সেখানে যায়নি এবং মিনি সাবও জেটিতে নোঙর করেনি।' বলে মুহূর্ত খানেক থামল আহমদ মুসা। তারপর আবার বলে উঠল, 'কিন্তু এমন কিছু ঘটার অর্থ হলো, সুলিভান আমাদের অবস্থান টের পেয়েছিল। যদি তা পেয়ে থাকে,

তাহলে সংগে সংগে তা ডেভিড ডেনিমদের জানাবার কথা। কিন্তু ডেভিড ডেনিমদের কথা বার্তায় এমন কিছু আঁচ করা যায়নি।'

'আমরা বিরাট ধাঁধায় পড়ে গেলাম ভাইয়া। কোনটাকে সত্য বলে গ্রহণ করব'। বলল হাসান তারিক।

'সুলিভানদের গাড়ি এখানে বার বার আসে এটাকেই সত্য বলে গ্রহণ করব। এস, কেন এসেছিল এ সত্যটা বের করি, তাহলে সবকিছুই পরিষ্কার হয়ে যাবে।' বলে আহমদ মুসা মনোযোগ নিবিষ্ট করল তার চারপাশে। বুঝার চেষ্টা করল, গাড়ি থেকে নেমে কোন দিকে গেছে।

এ সময় হাসান তারিক একটু পুব দিকে এগিয়ে ঝুঁকে পড়ে একটা কচি চারা হাতে তুলে নিয়ে আহমদ মুসাকে দেখিয়ে বলল, 'দেখুন এ চারা গাছটা গোড়া ভেঙে পড়েছিল, অনেকখানি শুকিয়ে গেছে।'

'আহমদ মুসার মুখ আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'চল আমাদের ডান দিকেই এগুতে হবে।'

একটু এগিয়ে আহমদ মুসা দেখল, একটা পাথর তার জায়গা থেকে উপড়ে উল্টে আছে। আহমদ মুসা হাসান তারিককে পাথরটা দেখিয়ে বলল, 'আমরা ঠিক পথেই এগুচ্ছি হাসান তারিক।'

আহমদ মুসারা এইভাবে ছোট-খাট চিহ্ন অনুসরণ করে টিলাটার দক্ষিণ পাশ হয়ে পূব পাশ ঘুরে উত্তর পাশে গিয়ে পৌছল। টিলাটার উত্তর পাশে একটা অগভীর উপত্যকা। উপত্যকাটার পরেই একটা পাথুরে পাহাড়। পাহাড়টার নিচের দিকটা জংগলে ঢাকা হলেও উপরের অংশ অনেকটাই নাংগা, সলিড পাথরের। মাঝে মাঝে গাছ আছে।

আহমদ মুসারা চিহ্ন ধরে পাথুরে পাহাড়টারও উত্তর প্রান্তে গিয়ে পৌছল। সামনে তাকাতেই দেখতে পেল পাহাড়ের গোড়ায় একটা আগের মতই অগভীর, কিন্তু সংকীর্ণ উপত্যকা। উপত্যকার পরেই উঁচু হয়ে উঠেছে একটা উচ্চভূমি এবং ছাদের আকারে তা কিছুটা এগিয়ে গেছে। তার পরেই সাগর।

নিচের সংকীর্ণ উপত্যকাটা ঘন গাছ-পালায় ঢাকা। জংগলের উপর চোখ পড়তেই একটা বিষয়ের প্রতি তার দৃষ্টি দারুণভাবে আকৃষ্ট হলো। দেখল,

অনেকগুলো গাছের মধ্যে দাঁড়ানো একটা দেবদারুর মত সোজা লম্বা হয়ে ওঠা গাছের মাথাটা ভাঙা। ভাঙা মাথাটা ঝুলে আছে। ভাঙা অংশটা শুকিয়ে গেছে।

আহমদ মুসার মুখটা উজ্জ্বল হয়ে উঠল। গাছের ভাঙা মাথাটা হাসান তারিককে দেখিয়ে বলল, 'আমার মনে হয় ওটা একটা সংকেত হাসান তারিক।'

'আপনি মনে করেন, কেউ ডালটা ভেঙে রেখেছে?' হাসান তারিক বলল।

'আমার তাই মনে হয়।' বলল আহমদ মুসা।

'ঝড় বা অন্য কোন কারণেও তো ভাঙতে পারে?' হাসান তারিক বলল।

'দেখ, গাছটার পূব, পশ্চিম ও উত্তর সব দিকেই গাছের প্রাচীর। দক্ষিণ দিকটা ফাঁকা। কিন্তু এদিকে আবার পাহাড়ের প্রাচীর। সুতরাং এই অবস্থায় অপেক্ষাকৃত ছোট গাছটা এইভাবে ভাঙতে পারে না।' বলল আহমদ মুসা।

'যুক্তিটা ঠিক ভাইয়া।' হাসান তারিক বলল।

'চল ওদিকে দেখি ব্যাপারটা কি?' বলল আহমদ মুসা।

বলে আহমদ মুসা পাহাড় থেকে উপত্যকার দিকে নামতে শুরু করল।

সাথে হাসান তারিকও।

উপত্যকায় নেমে এল আহমদ মুসারা।

উপত্যকার তলাটা ঘন আগাছায় ভরা।

'ভাইয়া এখানেও লোক চলাচলের চিহ্ন পাওয়া যাচ্ছে।' হাসান তারিক বলল।

'কিন্তু হাসান তারিক একটা জিনিস দেখ, পেছনে আমরা যেমনটা দেখে এসেছি, এখানকার ঘাস ও আগাছা সে রকম দলিত-মথিত নয়। এখানে চলাফেরা হয়েছে খুব সাবধানে।' বলল আহমদ মুসা।

'কারণ বোধ হয় এই যে, এখানে ওদের আগমন ওরা লুকাতে চেয়েছে। কিন্তু কেন?'

'ব্যাপারটা মনে হয় ঠিকানা লুকাবার মত। আমরা হয়তো ওদের গুরুত্বপূর্ণ কোন কিছুর কাছাকাছি পৌছে গেছি।' আহমদ মুসা বলল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই চারদিকে সতর্কভাবে চোখ বুলাতে লাগল। কিন্তু দৃষ্টি আকর্ষণের মত কোন কিছুই কোথাও দেখল না।

‘চল আমরা মাথা ভাঙা গাছটার দিকে আগাই।’ আহমদ মুসা বলল।

গাছের গোড়ায় পৌছার আগেই গাছের উত্তর পাশে গাছের নিচেই গাছ-আগাছার একটা বৃত্ত তার দৃষ্টি আকর্ষণ করল। বৃত্তটার বহিঃসীমা অস্পষ্ট হলেও বৃত্তটা চারপাশের জংগল থেকে আলাদা হয়ে গেছে তা একটু সতর্ক দৃষ্টিতেই চোখে পড়ে। বৃত্তের ভেতরের ঘাস-আগাছার জংগল প্রাকৃতিকভাবে বিন্যস্ত নয়, পরিকল্পিতভাবে সাজানো। এই পার্থক্যই বৃত্তকে আলাদা করেছে।

আহমদ মুসা বৃত্তটা দেখাল হাসান তারিককে।

বিস্মিত কণ্ঠে হাসান তারিক বলল, ‘উপরে গাছের ডাল ভেঙে রাখা, নিচে জংগলের একটা ম্যান-মেড বৃত্তের নিশ্চয় একটা অর্থ আছে ভাইয়া।’

আহমদ মুসা কোন জবাব দিল না। এগুলো গাছের গোড়ায় বৃত্তটার দিকে।

হাসান তারিকও।

বৃত্তটার পাশে পৌছতেই হাসান তারিক বলে উঠল, ‘বৃত্তটাকে এখন কিন্তু ভাইয়া চারদিক থেকে জংগল এলাকা থেকে আলাদা করা যাচ্ছে না।’

‘হ্যাঁ তাই হয়। শিল্পীদের এক শ্রেণীর ছবিকে কাছ থেকে দেখালে তার কোন আকার বুঝা যায় না। কিন্তু দূর থেকে দেখলে আকার পরিষ্কার হয়ে ওঠে। এ ব্যাপারটাও সে রকম। এ বৃত্তটাকে অন্য মানুষের চোখ থেকে লুকাবার জন্যে এটা একটা কৌশল।’ বলেই আহমদ মুসা বৃত্তের চারদিকটা দেখতে লাগল।

মাটির উপর ঝুঁকে পড়ে পরীক্ষা করতে গিয়ে আহমদ মুসা দেখল, ‘বাইরের সাথে বৃত্তের প্রান্ত বরাবর ফাটল এবং তার সাথে কিছুটা আলগা মাটিও ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা।

ব্যাপারটা হাসান তারিকেরও নজরে পড়েছিল। সে বিস্মিত। বলল সে আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘ভাইয়া মনে হচ্ছে যেন বৃত্ত একটা আলগা জিনিস।’

‘তোমার চিন্তায় আরেকটা বিষয়ও যোগ কর। দেখ বৃত্তের প্রান্ত ধুলি ধূসরিত হলেও খুব শক্ত। যেন সিমেন্টে তৈরী । তার অর্থ প্রান্তটা প্রাকৃতিক নয় বিশেষভাবে তৈরী করা হয়েছে।’ বলে উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা। তার কপাল কুঞ্চিত। ভাবছে আহমদ মুসা।

হাসান তারিকও উঠে দাঁড়িয়েছে। তারও চোখে-মুখে বিস্ময়।

আহমদ মুসা আবার ঘুরে এল বৃত্তটার কাছে। বলল, 'বৃত্তটাকে ম্যানহোলের ঢাকনার মত কিছু বললে কেমন হয়?'

চোখ কপালে তুলল হাসান তারিক। তার মানে জংগল-ঢাকা এই গোটা বৃত্তটা সরানো যাবে?'

'প্রান্ত বরাবর আলগা মাটি দেখে মনে হচ্ছে এটা উঠেছে-নেমেছে।' আহমদ মুসা বলল।

'কিন্তু কিভাবে সম্ভব? কেনইবা উঠবে? এই জংগলে এমন বিদঘুটে জায়গায় কি থাকতে পারে?' হাসান তারিক বলল।

আহমদ মুসা ভাবছিল। তাকিয়েছিল পূব দিকে। বলল, 'আমরা সান্তাসিমা পাথুরে জেটির প্রায় সমান্তরালে দাঁড়িয়ে আছি। এখান থেকে পাথুরে জেটিটা কতগজ হবে হাসান তারিক?'

হাসান তারিক পূব দিকটা একটু ভাল করে দেখে বলল, 'ভাইয়া আমরা তো পাথুরে জেটিটার পাশেই দাঁড়িয়ে আছি। পাথুরে জেটির পশ্চিম পাশে যে পাথুরে দেয়াল দেখেছি, যাকে আমরা পাহাড় ভেবেছি, সেটা আমাদের সামনের উচ্চভূমির দেয়াল। আমাদের এখান থেকে সে দেয়ালের দূরত্ব বিশ-পঁচিশ গজের বেশি হবে না।'

আহমদ মুসার মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বলল, 'এই বৃত্তটা যদি কোন ঢাকনা জাতীয় কিছু হয়, তাহলে আমার মনে হচ্ছে এই হাইল্যান্ডের নিচে কোন স্থাপনা তৈরী করা হয়েছে যার সাথে পাথুরে জেটির সম্পর্ক আছে।'

হাসান তারিক সংগে সংগে কথা বলল না। তার চোখে-মুখে আনন্দ ও বিস্ময়ের সমাহার। পরে ধীরে ধীরে বলল, 'তাহলে ভাইয়া, সান্তাসিমা উপত্যকার এই আসল ঘাঁটি। এখানে ঢোকার পথও তাহলে এই বৃত্ত-মুখটাই।'

বলে একটু থেমেই আবার বলা শুরু করল হাসান তারিক, 'বৃত্তটা একটা ঢাকনা হলে বাইরে খোলার একটা পথ অবশ্যই থাকবে। সেটাই এখন আমাদের দেখা দরকার ভাইয়া।'

‘হ্যাঁ, এটা কোন ঢাকনা হলে তা খোলার উপায় তো অবশ্যই থাকবে।’ বলে আহমদ মুসা বসে পড়ল। বৃত্তের উপর আবার চোখ বুলাতে লাগল। কিন্তু চারদিক ঘুরেও সন্দেহ করার মত কিছু পেল না। আহমদ মুসা নিশ্চিত যে, কোন ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থা ছাড়া এ ধরনের দৈত্যাকার ঢাকনা উঠানো নামানো সম্ভব নয়। ইলেক্ট্রনিক ব্যবস্থার সে ধরনের কৌশল খুঁজে পেল না আহমদ মুসা।

কিন্তু মাথা ভাঙা গাছটার বরাবরে এসে আহমদ মুসা বৃত্তের বাইরে আগাছার ভেতর আলগা মাটির একটা অস্পষ্ট লাইন দেখতে পেল। আগাছার মধ্যে এ ধরনের আলগা মাটি অস্বাভাবিক।

আহমদ মুসা দুহাতে আগাছা দুদিকে সরিয়ে ভালো করে দেখল আলগা মাটির লাইনটাকে।

আলগা মাটির এ লাইনটি শুরু হয়েছে বৃত্তের প্রান্তের সাথে লেগে থাকা বাইরের মাটির প্রায় কোনা থেকে। আর শেষ হয়েছে গাছের গোড়ায় গিয়ে। আহমদ মুসা মাটির ট্রাকটি অনুসরণ করে গাছের গোড়ায় গিয়ে পৌছল।

ঘাস ও আগাছার ভিড়ে গাছের গোড়াটা দেখাই যায় না।

আহমদ মুসা আলগা মাটির লাইন সোজা গাছের জায়গাটার আগাছার ফাঁক দিয়ে তাকাল গাছের গোড়ার দিকে। দেখতে পেল মাটি থেকে পাঁচ-ছয় ইঞ্চি উপরে গাছের গোড়ার একটা জায়গা চার বর্গ ইঞ্চি আকারে গোল করে কাটা এবং মাটি থেকে কাটা পর্যন্ত জায়গাটা গাছের পাতা দিয়ে ঢেকে দেয়া।

আহমদ মুসা ডান হাতে জংগল ফাঁক করে রেখে বাঁ হাত দিয়ে পাতাগুলো সরিয়ে ফেলল। সংগে সংগেই তার নজরে পড়ল গাছের গা বেয়ে মাটি থেকে উঠে আসা একটা বিদ্যুতের তার।

দুচোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল আহমদ মুসার। কাটা অংশটা ধরে টান দিল। হাতের সাথে কাটা অংশটা উঠে এল।

কাটা অংশটা ছিল ঢাকনার মত লাগানো। ঢাকনা তুলতেই দেখা গেল প্লাষ্টিকের একটা ক্ষুদ্র সুইচ বক্স। সুইচ প্যানেলের একটা প্রান্ত নীল, অন্য প্রান্তটা লাল। সুইচটা নীল প্রান্তে টেনে দেয়া আছে।

আহমদ মুসা সোজা হয়ে দাঁড়াল।

পেছনেই দাঁড়িয়েছিল হাসান তারিক। হাসান তারিকও দেখতে পেয়েছিল সবকিছু।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াতেই হাসান তারিক বলে উঠল, 'ভাইয়া, সত্যিই আমরা ঠিক জায়গায় এসে গেছি। এখানে সুইচ টিপেই এই দৈত্যাকার ঢাকনাটা খোলা যাবে।'

'হ্যাঁ হাসান তারিক। সুইচটা নীল প্রান্ত থেকে লাল প্রান্তে আনলেই সিঁড়ি বা গুহা মুখের ঢাকনাটা খুলে যাবে। কিন্তু আমি ভাবছি হাসান তারিক, এটা দরজা খোলার সুইচ, না দরজা খোলার জন্যে সংকেত পৌছাবার সুইচ।' চিন্তা জড়িত কণ্ঠে বলল আহমদ মুসা।

'যেটাই হোক ভাইয়া, সুইচ টিপলে দরজা খুলে যাবে।' বলল হাসান তারিক।

'তা ঠিক। কিন্তু এটা দরজা খোলার সংকেত হলে, দরজার মুখেই লোক থাকবে আমাদের স্বাগত জানানোর জন্যে।'

'এর পরেও তো আমাদের সামনে এগুতে হবে ভাইয়া।' হাসান তারিক বলল।

'হ্যাঁ হাসান তারিক তৈরী হও। রিভলবারটা হাতে নাও। ঢাকনাটার প্রান্তে গিয়ে দাঁড়াও। আমি সুইচ টিপছি।'

বলে আহমদ মুসা হাত বাড়াল সুইচের দিকে। আর বাম হাত দিয়ে পকেট থেকে তুলে নিল মেশিন রিভলবার। অন্যদিকে হাসান তারিক পকেট থেকে রিভলবার তুলে নিয়ে ছুটল ঢাকনার প্রান্তে।

আহমদ মুসা সুইচ বক্সের সাদা বোতামটাকে টেনে আনল নীল প্রান্ত থেকে লাল প্রান্তে।

সংগে সংগে শীষ দেয়ার মত একটা শব্দ হলো।

আহমদ মুসা তাকাল বৃত্তাকার ঢাকনার দিকে। দেখল বৃত্তাকার ঢাকনা নিচে নেমে যাচ্ছে। ফুট দুয়েক নামার পর ঢাকনাটা দ্রুত পাশে সরে গেল।

আহমদ মুসা দৌড়ে গিয়ে হাসান তারিকের পাশে দাঁড়াল। দেখল, তারা একটা সিঁড়ির মুখে দাঁড়িয়ে। সিঁড়ির গোড়াটা একটা আলোকিত ঘরে। পাথুরে মেঝের একটা ঘর ওটা।

আহমদ মুসা সিঁড়িতে পা রেখে বলল, 'আমি নামছি, তুমি এস।'

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই তরতর করে সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেল।

আহমদ মুসারা পা রাখল ঘরে। চতুষ্কোণ একটা ঘর। পাথুরে মেঝে, পাথুরে ছাদ। পাশের দেয়াল ছোট-বড় পাথর গেঁথে তৈরী। ঘরে জানালা নেই, একটি দরজা। ঘরটা শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত। ঘরে কোন আসবাবপত্র নেই। তবে সিঁড়ির পেছনের দেয়ালে অনেকগুলো বাক্স সাজিয়ে রাখা।

'বাক্সগুলো একটু দেখা দরকার।' ফিসফিস করে বলল আহমদ মুসা ।

সংগে সংগেই হাসান তারিক ছুটল বাক্সগুলোর দিকে।

পকেট থেকে ছুরি বের করে একটা বাক্সের উপরের কভারটা কেটে ফেলল।

বাক্সে বই ভর্তি।

একটা বই হাতে তুলে নিল আহমদ মুসা। নজর বুলাল শিরোনামের উপর ঃ 'বাইফেইথ ইসলামিষ্টস আর টেররিষ্ট'। ইংরেজী ভাষার এ গ্রন্থ লিখেছেন ' এ গ্রুপ অব ইউরোপীয়ান পিপল।' প্রকাশকের জায়গায় লেখা 'ক্রিশ্চিয়ান চ্যারিটি প্রেস, বেলফার্ষ্ট, উত্তর আয়ারল্যান্ড।' প্রকাশকের বক্তব্য যিনি দিয়েছেন, তার নাম 'মেরি ক্রিশ্চিয়ানা'। তার ঠিকানা লেখা হয়েছে 'রোম, ইটালী।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'বইটা লিখেছে, ছেপেছে ও ছড়াচ্ছে ইহুদীরা, কিন্তু দেখানো হচ্ছে বইটা খৃষ্টানরা লিখেছে, ছেপেছে এবং তাই তারাই প্রচার করছে।'

'নতুন কি ভাইয়া, ইহুদীবাদীরা খৃষ্টানবাদের ঘাড়ে বন্দুক রেখেই তো শিকার করে চলেছে।' হাসান তারিক বলল।

'এত বই এখানে কেন?' অনেকটা স্বগত প্রশ্ন আহমদ মুসার।

‘আমার মনে হয় ভাইয়া, বইগুলো এখানে আনা হয়েছে উত্তর আজোরসের দ্বীপগুলোর জন্যে।’

‘মনে হয় হারতাকেই ওরা উত্তর আজোরসের ঘাঁটি বানিয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তাহলে সাও তোরাহ কি?’ জিজ্ঞাসা হাসান তারিকের।

‘সাও তোরাহ ওদের ভয়াবহ এক জেলখানা, ঠিক আলেকজান্ডার সোলঝেনিৎসিনের ‘গোলাগ’ দ্বীপের মত।’

আহমদম মুসা কথা শেষ করেই এগুতে লাগল দরজার দিকে।

সাথে সাথে চলল হাসান তারিকও।

দরজাটা ষ্টিলের। দরজার এপারে হুক আছে, লক সিষ্টেমও রয়েছে। হুক খোলা। লক করা থাকতেও পারে, না থাকতেও পারে।

‘লক করা না থাকুক’ আহমদ মুসা কামনা করল।

ডান হাতে মেশিন রিভলবার ধরে বাম হাতে দরজার হাতলে চাপ দিল আহমদ মুসা। নিশব্দে ঘুরে গেল হাতল। সেই সাথে কিঞ্চিত সরে এল দরজা। লক করা নেই বুঝল আহমদ মুসা। পরক্ষণেই এক ঝটকায় খুলে ফেলল দরজা। মেশিন রিভলবার বাগিয়ে আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই দরজা থেকে মুখ বাড়িয়ে চারদিকে তাকাল।

দরজার বাইরে ওটা কোন ঘর নয়, একটা প্রশস্ত করিডোর। তার দুদিকেই ঘরের সারি।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই অনেকক্ষণ অপেক্ষা করল দরজায়। কিন্তু কাউকে দেখল না। এমনকি কোন দিক থেকে কোন সাড়াশব্দও পেল না।

‘আমার মনে হয়, এখন কেউ নেই। প্রয়োজনের সময়ই শুধু ওরা আসে হয়তো।’ ফিসফিসে কণ্ঠে বলল হাসান তারিক।

‘চল সার্চ করে দেখা যাক।’ বলে আহমদ মুসা সাবধানে পা ফেলল করিডোরে।

হাসান তারিকও করিডোরে নেমে এল।

‘চল আগে করিডোর ঘুরে সবটা দেখে আসি। তারপর সব সার্চ করা যাবে। আগে আমাদের দেখা দরকার মিনি-সাবমেরিনের সংযোগটা কিভাবে। এখন আমার মনে হচ্ছে, সেই রাতে দুটি মিনি সাবমেরিনকে জেটিতে আধাডোবা অবস্থায় অপেক্ষা করে চলে যেতে দেখেছিলাম। ওরা কিন্তু অপেক্ষা করে ফিরে যায়নি। কাজ সম্পন্ন করেই তারা চলে যায়। শেখুল ইসলামকে এক মিনি সাবমেরিন এসে রেখে যায়, পরের মিনি সাব মেরিনটা এসে তাকে নিয়ে যায়। পানির ভেতরে হস্তান্তরটা কিভাবে করেছিল সেটা আমাদের জানা দরকার।’

ফিস ফিসিয়ে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা হাসান তারিককে।

দরজা থেকে বের হবার পর হাতের ডান দিকে মানে দক্ষিণে করিডোরটা ছয়সাত গজের বেশি এগোয়নি। অতএব আহমদ মুসারা হাঁটছিল করিডোর ধরে উত্তর দিকে।

দু’পাশেই ঘর।

কয়েকটা ঘর পেরুতেই পূর্বমুখী আরেকটা করিডোরের সংযোস্থলে তারা গিয়ে পৌছল।

সেখান থেকে মূল করিডোরটা আরও উত্তরে এগিয়ে গেছে। আর পূবমুখী শাখা করিডোরটা পনের বিশ গজ পূবে গিয়েই শেষ হয়ে গেছে।

‘আমাদেরকে উত্তরেই এগুতে হবে।’ বলে আহমদ মুসা মূল করিডোর ধরে সামনে এগুল।

হাসান তারিকও তার পাশাপাশি হাঁটছিল।

আহমদ মুসারা ত্রিমুখী করিডোরের সংযোগস্থলের মাঝখানে এসে পৌছেছে, এ সময় চারদিক থেকে অনেকগুলো ফাঁস এসে তাদের জড়িয়ে ফেলল। ফাঁসগুলো তাদের গলা এবং হাতসহ বুক বরাবর দেহকে কঠিনভাবে বেঁধে ফেলল। আত্মরক্ষার কোন চেষ্টা করার আগেই মাটিতে আছড়ে পড়ে গেল তারা।

আহমদ মুসাদের উপর ফাঁস নিক্ষেপ করেছিল ছাদের চারদিকের ব্যালকনি থেকে। আহমদ মুসারা করিডোরে ঢোকার পর ঘর ও করিডোরের দিকেই শুধু নজর রেখেছে, উপরে তাকায়নি। উপরে ছাদের চারদিক ঘিরে ব্যালকনি। ব্যালকনির রেলিং-এ পর্দা টাঙানো। এরই আড়ালে লুকিয়ে ছিল ওরা

ছয়জন। প্রত্যেকের হাতেই ষ্টেনগান। কিন্তু ওরা গুলী করে চোখের পলকে শত্রু মারার চেয়ে ফাঁসিতে আটকে খেলিয়ে মারার মধ্যেই আনন্দ খুঁজে পেয়েছে।

ফাঁসিতে আটকে আহমদ মুসাদের মেঝেতে আছড়ে ফেলার পর ওরা ছয়জন লাফিয়ে নেমে এল মেঝেতে।

ওরা ফাঁস ধরে টেনে আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে ত্রিমুখী করিডোরের সংযোগ স্থলের উত্তর পাশের বড় একটা ঘরে নিয়ে এল।

ঘরটা অনেকটা মিডিয়া রুমের মত। অনেকগুলো লাল-কাল টেলিফোন, ফ্যাক্স, টিভি ও কম্পিউটারে সজ্জিত ঘরটা। বসার জন্যে সোফা-চেয়ারও আছে অনেকগুলো।

ঘরে ঢুকিয়েই একজন মোবাইল নিয়ে কোথাও কল করল। সংযোগ হতেই টেলিফোনকারী লোকটি শরীরটা সামনে বেঁকিয়ে মাথা নিচু করে বিনীত কণ্ঠে বলল, 'এক্সিলেন্সি, আমাদের এই ঘাঁটিতে দুজন লোক প্রবেশ করেছিল। আমরা তাদের ধরে ফেলেছি। আমাদের নির্দেশ নিয়ম অনুসারে ওদের খুন করাই একমাত্র শাস্তি। তবু মনে হলো আপনাকে জানিয়ে তবেই কিছু করা দরকার। আপনি নির্দেশ করুন।'

ওপারের কথা শুনে লোকটি বলল, 'হ্যাঁ দুজনেই বিদেশী।'

কথঅ শেষ করে ওপারের কথঅ শুনল। শুনেই তার দুচোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল। বলল, 'সাংঘাতিক এক্সিলেন্সি, আমরা তো এতটা ভাবিনি। আমরা ভালোভাবে ওদের বেঁধে রেখেছি।'

ওপারের কথা শুনল আবার সে। তারপর বলল, 'ঠিক আছে এক্সিলেন্সি। বুঝতে পেরেছি। আপনি যেভাবে বলেছেন, সেভাবেই ওদের রাখব। আপনারা কখন আসছেন? এখনি যাত্রা করছেন? ঠিক আছে এক্সিলেন্সি। আমরা হুশিয়ার থাকব।'

কথা শেষ করে মোবাইল অফ করে রেখে দিয়ে উঠে দাঁড়াল লোকটা। তার চোখে হিং¯্রর দৃষ্টি। সে তার লোকদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'জানো এই দুজন লোক আমাদের অসংখ্য লোককে খুন করেছে। আমাদের কর্তারা যাদের হন্যে হয়ে খুঁজছেন, সেই আহমদ মুসা এরা হতে পারে। মিনি-সাব নিয়ে কর্তারা

এখনি যাত্রা করছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যে এসে যাবেন। এখন এদের ব্যাপারে আমাদের খুব সাবধান থাকতে হবে।'

লোকটি থেমেই আবার বলে উঠল, 'তোমরা ওদের সব অস্ত্র কেড়ে নিয়েছ তো?'

একজন উত্তরে বলল, 'হ্যাঁ, ওদের কাছে আর কিছুই নেই।'

'ঠিক আছে, এখনই ওদের দুপা বেঁধে ফেল, দুহাত যেভাবে দেহের ফাঁসে বাঁধা পড়েছে, সেটাকে আরও শক্ত করো। ওদের চোখ বেঁধে ফেল এবং মুখও আটকে দাও টেপ দিয়ে। বলে লোকটি আহমদ মুসার দিকে এগিয়ে এল। বলল, 'আমরা তোমাদের শিকার বানাতে পারলাম না। তোমরা যাদের শিকার তারা আসছে। তোমরা আমাদের ডেভিড ডেনিম, সুলিভান, কেলভিনসহ বহুলোককে হত্যা করেছ। তার ফল তোমাদেরকে তিল তিল করে ভোগ করতে হবে।'

কথা শেষ করেই হেসে উঠল লোকটি। বলল, 'তোমরা বোকার মত ঢুকেছিল এ ঘাঁটিতে। মনে করেছিলে বোধ হয় তোমাদের চেয়ে বুদ্ধিমান আর কেউ নেই। কিন্তু জানতে না তোমরা, গাছের সুইচে চাপ দেবার সংগে সংগে শুধু সিড়ির দরজাটাই খুলে যায়নি ভেতরে এলার্মও বেজে উঠেছিল। সংগে আমাদের এই টিভিতে তোমাদের ছবি ভেসে উঠেছিল। টিভি ক্যামেরা লুকানো ছিল বৃত্তাকার ঢাকনার কৃত্রিম গাছ-গাছড়ার মধ্যে। আমরা ভেতরে তোমাদের জন্যে ফাঁদ পেতে বসেছিলাম। ফাঁদে তোমরা পরিকল্পনা মোতাবেকই ধরা পড়েছ। এখানে কেউ ঢুকলে তার জন্যে মৃত্যু ছাড়া দ্বিতীয় আর কোন পথ থাকে না। এতক্ষণ তোমরা লাশ হয়ে যেতে, কিন্তু তোমাদের মৃত্যুটা লেখা আছে আরও উপরের কর্তাদের হাতে। তার আগে তোমাদের নিয়ে নাকি অনেক কাজ আছে।'

কথা শেষ করে হঠাৎ সে চমকে উঠার মত সোজা হয়ে দাঁড়াল। বলল একজনকে লক্ষ্য করে, 'ভেতরের সুইচ টিপে সিঁড়ির দরজা কি বন্ধ করে দেয়া হয়েছে?'

ওরা পাঁচজন আহমদ মুসা ও হাসান তারিককে বাধার কাজে ব্যস্ত ছিল। হাত-পা ওদের নতুন করে বাঁধা হয়ে গিয়েছিল। চোখ-মুখ বাঁধতে যাচ্ছিল ওদের। নেতা লোকটির কথা শুনে ওরা পাঁচজনই অপরাধীর মত উঠে দাঁড়াল। বলল

একজন, ‘আমরা এদের ধরে সোজা এখানে নিয়ে এসেছি। ভুলেই গেছি আমরা সিঁড়ির দরজার কথা।’

বলে এ লোকটিসহ আরও একজন ঘর থেকে বেরিয়ে ছুটল সিঁড়ি ঘরের দিকে।

আহমদ মুসা লোকটির টেলিফোন আলাপ শুনে এবং আজর ওয়াইজম্যানদের কেউ তাদেরকে এখান থেকে নিয়ে যাবার জন্যে আসছে জানতে পেরে খুশি হয়ে উঠেছিল। সে মনে মনে প্রার্থনা করছিল তাদেরকে যেন সাও তোরাহ দ্বীপে নিয়ে যাওয়া হয়। বন্দী হয়ে যাওয়ার মধ্যে ঝুঁকি আছে, কিন্তু আরও মন্দের চেয়ে এটা তো ভালো। বলল আহমদ মুসা লোকটিকে লক্ষ্য করে, ‘তোমার কর্তারা আমাদের কোথায় নিয়ে যেতে চান? তোমাদের কর্তারা থাকেন কোথায়? তোমাদের কর্তারা আমাদের এত ভয় করেন? আর তোমাদের এত দূর্বল ভাবেন যে, আমাদের সাথে কথা বললেই তোমাদের আমরা পটিয়ে ফেলব?’

লোকটি কোন কথা বলল না। যে চেয়ার থেকে উঠে এসেছিল সেই চেয়ারে গিয়ে বসল।

আহমদ মুসাই আবার কথা বলল, ‘তোমাদের কর্তারা বলছেন, আমরা তোমাদের অনেক লোককে হত্যা করেছি। কিন্তু তোমরা নিশ্চয় জান, বাড়িতে ডাকাত পরলে ডাকাতকে হত্যা করা অপরাধ নয়, কিন্তু ডাকাতরা যদি হত্যা করে সেটা অপরাধ। তোমাদের কর্তারা কত লোককে খুন করেছে, কত লোককে সাও তোরাহতে এনে পশুর মত নির্যাতন করছে তা তোমাদের অবশ্যই জানার কথা।’

ক্রোধে জ্বলে উঠল চেয়ারে বসা লোকটা, কিছু বলতে যাচ্ছিল আহমদ মুসাদের পাশে দঁড়ানো লোকদের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু তার আগেই ওদের একজন বলে উঠল, ‘সিঁড়ির দরজা বন্ধ হওয়ার শব্দ তো এখনো আমরা পেলাম না। দেখে আসি ওরা কি করছে।’

‘তাই তো, এতক্ষণ ওদের ফেরার কথা।’ বলল একজন।

‘যাও তোমরা দুজন ওদিকে। হাওয়া খেতে দেখলে ঘাড় ধরে নিয়ে এস।’ উত্তরে বলল চেয়ারে বসা লোকটি।

নির্দেশ পেয়ে দুজন বেরিয়ে গেল ঘর থেকে।

চেয়ারে বসা লোকটি কাল টেলিফোনটা টেনে নিয়ে একটা টেলিফোন করা নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়ল।

মিনিট তিনেক কেটে গেল তার টেলিফোন কলে।

টেলিফোন রেখেই ভ্রুকুঞ্চিত করে লোকটা আহমদ মুসার পাশে দাঁড়ানো অবশিষ্ট লোকটিকে উদ্দেশ্য করে বলল, 'ওরা কি শুরু করল? আরও কিছু জরুরী কাজ আছে। ওরা দেরি করছে কেন? যাও ডাক ওদের।'

লোকটি বেরিয়ে গেল।

দুমিনিটেও যখন কেউ ফেরত এল না, তখন চেয়ারে বসা লোকটি অগ্নিমূর্তি হয়ে উঠে দাঁড়াল। চিৎকার করে উঠল, 'সব অপদার্থের দল। সবাইকে পিটিয়ে আজ লাশ করে দেব।' বলে সে ষ্টেনগানটা তুলে নিয়ে দরজার দিকে হাঁটা শুরু করল।

কিন্তু দরজার মুখোমুখি হতেই তার দুচোখ ছানা বড়া হয়ে গেল। কাল প্যান্ট, কাল সার্ট ও কাল হ্যাট পরা দুজন লোক দরজায় যমদূতের মত দাঁড়িয়ে।

কিন্তু প্রথম দেখার চমক কাটিয়ে উঠেই লোকটি তার ষ্টেনগান তুলছিল দরজার দাঁড়ানো আগন্তুকদের উদ্দেশ্যে।

কিন্তু আগন্তুক দুজনের দুহাত বিদ্যুত বেগে উঠে এল এবং এক সাথেই গুলী বর্ষিত হলো তাদের দুই রিভলবার থেকে।

লোকটির ষ্টেনগান মাঝপথেই থেমে গেল এবং বুকে একসাথে দুই গুলী খেয়ে ছিটকে পড়ল তার দেহটা দরজার এক পাশে।

দরজা থেকে কালো মূর্তি দুজন ঘরে ঢুকল। দুজনেই এসে দাঁড়াল আহমদ মুসাদের পাশে। তারপর দুজনেই একসাথে মাথার হ্যাট খুলে হেসে উঠল। বলল আহমদ মুসাদের লক্ষ্য করে, 'আপনাদের এভাবে দেখতে মজাই লাগছে।'

আহমদ মুসাও হাসল। বলল, 'পাঁচ কুমির ছানাকে দুই দুই এক করে তোমরা যে গ্রাস করলে তাও আমাদের মজা দিয়েছে। এখন বল সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস, ওদের কাউকেই বাঁচিয়ে রাখনি কিছু জানার জন্যে?'

‘স্যরি মি. আহমদ মুসা, ওদের মুখ বন্ধ করতে হলে ওদের না মেরে উপায় ছিল না।’ বলল সোফিয়া সুসান।

‘তার মানে এখানেও কাউকে জীবিত পাওয়া গেল না।’ বলল আহমদ মুসা।

পলা জোনস আহমদ মুসাদের বাঁধন কাটা শুরু করে দিয়েছিল। সোফিয়া সুসানও তার সাথে যোগ দিল।

বাঁধন মুক্ত হয়ে আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। বলল, ‘সিঁড়ি মুখটা নিশ্চয় বন্ধ করে দেয়া হয়নি এখনও?’

‘জি না, হয়নি। আমরা সে চেষ্টা করিনি। তার সময়ও হয়নি।’ বলল সোফিয়া সুসান।

‘হাসান তারিক তুমি যাও দরজাটা বন্ধ করে এস। সিঁড়ির শেষ ধাপের উপরের ধাপে সুইচ দেখতে পাবে।’ নির্দেশ দিল আহমদ মুসা।

‘জি ভাইয়া।’ বলে হাসান তারিক উঠে গেল।

আহমদ মুসাও এগুল নিহত লোকটার সেই মোবাইলের দিকে। মোবাইলটি নিয়ে আহমদ মুসা ‘কল প্রেরণ’ উইনডোটা বের করল। আহমদ মুসার উদ্দেশ্য, কিছুক্ষণ আগে লোকটা তার যে কর্তাদের সাথে কথা বলল, তাদের অবস্থান কোথায়? সাও তোরাহ, না অন্য কোথাও। কিন্তু বের হলো একটা মোবাইল নাম্বার। আহমদ মুসা জিজ্ঞেস করল পলা জোনসদেরকে যে মোবাইল নাম্বার দেখে এলাকার পরিচয় জানা যাবে কিনা।

কথা বলে উঠল সোফিয়া সুসান। বলল, ‘না সম্ভব নয় জনাব। আজোরস দ্বীপপুঞ্জের মোবাইলগুলো সেন্ট্রালি এ্যালোট করা।’

মিনিট খানেক না যেতেই হাসান তারিক ফিরে এল। বলল, ‘হ্যাঁ ভাইয়া দরজা বন্ধ করেছি।’

বলেই তাকাল হাসান তারিক পলা জোনসের দিকে। বলল, ‘ছুরি দিয়ে আপনারা কাবু করেছেন পাঁচজনকে!’

‘এক সাথে তো নয় তিনবারে। গুলী করা সম্ভব ছিল না অন্যেরা সাবধান হবে এই ভয়ে। অসুবিধা হয়নি। সোফিয়া সুসান তো কমান্ডো। সেই কাজ করেছে আমি সাথে ছিলাম।’ পলা জোনস বলল।

‘আমরা ধরা পড়ার কথা কি আপনারা জেনেছিলেন?’ বলল হাসান তারিক।

‘জেনেছিলাম নয়, দেখেছিলাম।’ পলা জোনস বলল।

‘আপনারা কি আমাদের পেছনে পেছনেই ভেতরে ঢুকেন?’ বলল হাসান তারিক।

‘হ্যাঁ। তবে ততটা পেছনে, যতটা পেছনে থাকলে আপনাদের চোখে পড়া থেকে বাঁচা যায়। আপনারা করিডোরে ঢোকার পর আমরা সিঁড়ি ঘরে নেমে আসি।’ পলা জোনস বলল।

‘আমার বিস্ময় লাগছে, আহমদ মুসা ভাইকে না জানিয়ে এমন সিদ্ধান্ত আপনারা নিলেন কি করে!’ অনেকটা স্বগতকণ্ঠে বলল হাসান তারিক।

‘আমরা এসেছি ঈশ্বরের নির্দেশে। মি. আহমদ মুসা অবশ্যই আমাদের মাফ করবেন।’ বলল সোফিয়া সুসান। তার ঠোঁটে এক টুকরো হাসি।

আহমদ মুসা মোবাইলটা রেখে দিয়ে একটা চেয়ারে বসেছিল। তার মুখেও হাসি ফুটে উঠল। বলল, ‘ঈশ্বরের নির্দেশে আসলে আহমদ মুসার কাছে মাফ চাওয়ার প্রয়োজন কি?’

‘ঈশ্বরেরই তো নির্দেশ নেতার আনুগত্য করতে হবে।’ বলল সোফিয়া সুসান।

‘আমি আপনার নেতা হলাম কবে?’ আহমদ মুসা বলল। তার কণ্ঠে কৃত্রিম বিস্ময়ের সুর।

‘আপনি হননি, আপনাকে নেতা বানিয়েছি। আর এই আনুগত্য আমার একান্তই পারসোনাল ব্যাপার।’ বলল সোফিয়া সুসান। তার চোখে-মুখে একটা ঔজ্জ্বল্য।

‘ভাইয়া, সোফিয়া সুসান শুধু যে এক বাপের এক মেয়ে তা নয়। আপনি জানেন না হারতা ও পাশের নেসকুইন দ্বীপের সবচেয়ে দীর্ঘদিন রাজত্বকারী

আলতামোরা রাজবংশের একমাত্র মেয়ে। সে যা ইচ্ছা করে তাই করে থাকে। সুখের জীবন বাদ দিয়ে কমান্ডো বাহিনীতে সে যোগ দিয়েছে নিজের জেদেই। সে আমাকে জোর করে সাথে নিয়ে এসেছে ভাইয়া।'

'না, এবার জেদের বশে নয়, ঈশ্বরের নির্দেশ পেয়ে এসেছে ও।' হেসে বলল আহমদ মুসা।

একটু থেমেই আবার বলে উঠল, 'তোমাদের দুজনকেই ধন্যবাদ। এখন কাজের কথায় আসি।'

বলে একটু থামল আহমদ মুসা।

একটু ভাবল। তারপর শুরু করল, ওরা মিনি-সাব নিয়ে আমাকে ও হাসান তারিককে নিতে আসছে। কতক্ষণে ওরা পৌছবে জানি না। ওদের মধ্যে আজর ওয়াইজম্যান থাকবে বলে মনে হয় না। তবে তাদের লোকরাই আসছে। আমাদের জন্য এটা একটা মহা সুযোগ। আমরা যদি ওদের মিনি-সাব দখল করতে পারি, তাহলে সাও তোরাহ পৌছা অনেক সহজ হয়ে যাবে। কিন্তু এ জন্যে অনেকগুলো কাজ আমাদের করতে হবে। প্রথমত মিনি সাবের সাথে কিভাবে এই ঘাঁটির সংযোগ হবে, কোন পথে কিভাবে মিনি-সাব থেকে এখানে নামার ব্যবস্থা হবে তা আমরা জানি না, দ্বিতীয়ত ওদের সন্দেহমুক্ত ভাবে কিভাবে এই ঘাঁটিতে নিয়ে আসা হবে এবং তৃতীয় কাজটা হলো মিনি-সাবটা দখল করা। তৃতীয় কাজটা অবস্থার বিচারে করা হবে, কিন্তু প্রথম দুটো কাজ নিয়ে আমাদের অনেক ভাবতে হবে। এই ভাবনার জন্যে আমি তোমাদের আহ্বান জানাচ্ছি।'

থামল আহমদ মুসা।

কথা বলে উঠল হাসান তারিক, 'ওদের কথা থেকে বুঝা গেছে ক্লোজ সার্কিট ক্যামেরার মাধ্যমে বাইরের দৃশ্য মনিটর করা হয়। সুতরাং আমরা বন্দী অবস্থায় ওদের যে আলোচনা শুনেছি এবং টিভি মনিটরিং-এর মাধ্যমে যা আমরা দেখব তার ভিত্তিতে প্রাথমিক যোগাযোগের কাজ হয়তো করা যাবে। কিন্তু ওদের মনে যাতে সন্দেহের সৃষ্টি না হয় এ জন্যে ওদেরকে মিনি-সাব থেকে ঘাঁটির ভেতরে আনার কাজটা কিভাবে স্বাভাবিক করা যাবে সেটা নিয়ে আরও ভাবতে

হবে। কিন্তু প্রথমত ঘাঁটি অনুসন্ধান করে দেখা প্রয়োজন কোন ক্লু পাওয়া যায় কিনা, সাহায্য পাওয়া যেতে পারে এমন কিছু পাওয়া যায় কিনা।'

'ঠিক বলেছ, চল সার্চটা শুরু করা যাক।'

বলেই উঠে দাঁড়াল আহমদ মুসা।

ঘর থেকে বেরিয়ে যাওয়ার আগে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনসকে বলল, 'তোমরা টিভি মনিটরিং এবং ফ্যাক্স ও টেলিফোনগুলোর উপর নজর রাখ।'

আহমদ মুসারা ঘাঁটির প্রতিটি ঘর সার্চ করল। প্রয়োজনীয় তথ্য গুলো সংগ্রহ করল। অবশেষে তারা উত্তর প্রান্তের প্রশস্ত করিডোরটি দিয়ে একটা তালাবদ্ধ ঘরের সামনে এসে দাঁড়াল। আহমদ মুসা পকেট থেকে ষ্টিলের একটা তার বের করে তালাটা খুলে ফেলল।

বেশ বড় ঘর।

ঘরের পূব দেয়ালের দিকে তাকিয়ে তারা বিস্মিত হলো। দেয়ালে পাঁচ ফুট উঁচু ও চার ফুঁট প্রস্তের একটা কাঠামো। ঠিক প্লেন বা স্পেসশীপের দরজার মত।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজন দুজনের দিকে তাকাল। দুজনেরই চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে আনন্দে।

প্রথম আহমদ মুসা কথা বলল, 'কি বুঝছ হাসান তারিক?'

'মিনি সাবমেরিন ও ঘাঁটির মধ্যেকার গ্যাংওয়ের এটা এপাশের দরজা ভাইয়া।' আনন্দের সাথে বলল হাসান তারিক।

'আলহামদুলিল্লাহ, এক রহস্যের উন্মোচন হলো হাসান তারিক। দরজাটা যন্ত্র নিয়ন্ত্রিত তা বুঝাই যাচ্ছে। ঐ দেখো দরজার পাশে ডিজিটাল প্যানেল দেখা যাচ্ছে। এসো দেখি।' কথাগুলো বলে আহমদ মুসা দরজার দিকে হাঁটতে লাগল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনে দরজার পাশের ডিজিটাল প্যানেলের মুখোমুখি দাঁড়াল। ডিজিটাল প্যানেলে অনেকগুলো পয়েন্ট। প্রথম পয়েন্টে লাল আলো দপদপ করে জ্বলছে। উপরে লেখা ডিসি (D.C)। দ্বিতীয়

পয়েন্টের উপর লেখা জি ডব্লিউ মিসফিটেড (G.W. missfitted) এবং চতুর্থটিতে ডিও (D.O)। ডিও পয়েন্টের সাথেই একটা ডিজিটাল কি বোর্ড।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক দুজনেই প্যানেলের উপর চোখ বুলাচ্ছিল। আহমদ মুসা বলে উঠল, 'প্রথম পয়েন্টটায় লাল আলো জ্বলছে। উপরের D.C-এর অর্থ নিশ্চয় 'ডোর ক্লোজড' মানে 'দরজা বন্ধ'। দরজা বন্ধ থাকারই লাল সংকেত দিচ্ছে পয়েন্টটা। কিন্তু অন্যগুলোর অর্থ বের কর হাসান তারিক।'

'পরবর্তী দুপয়েন্টের সমাধান করছি ভাইয়া। 'জি ডব্লিউ মিসফিডেট' অর্থ হলো গ্যাংওয়ে-মিসফিডেট'। এর অর্থ মিনি-সাব থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাংওয়ে এই দরজার সাথে ঠিকভাবে ফিট হয়নি। তৃতীয় পয়েন্টের 'জি ডব্লিউ ফিটেড' অর্থ গ্যাংওয়েটি দরজার সাথে ঠিকভাবে ফিট হয়েছে। আর.............।' হাসান তারিক কথা শেষ করতে পারলো না।

কথার মাঝখানে আহমদ মুসা বলল, 'তার মানে মিনি-সাব থেকে বেরিয়ে আসা গ্যাংওয়ে ঠিকভাবে ফিট হলে তৃতীয় পয়েন্টে আলো জ্বলবে, আর ফিট না হলে দ্বিতীয় পয়েন্টে জ্বলবে।'

'ঠিক ভাইয়া। কিন্তু চতুর্থ পয়েন্ট D.O-এর অর্থ কি হতে পারে?'

'শুরুতে দেখছ দরজা বন্ধ। তারপর দেখলে গ্যাংওয়ে ঠিকভাবে লাগল, এখন কি করতে হবে?' বলল আহমদ মুসা সরাসরি উত্তর না দিয়ে।

হেসে উঠল হাসান তারিক। বলল, 'তার মানে D.O-ডোর ওপেন-দরজা খোলা।'

হাসান তারিক হাসলেও আহমদ মুসার মুখে ফুটে উঠেছে চিন্তার ছায়া। বলল, 'হাসান তারিক ডোর অপেন হবে ডিজিটাল লকে। ডোর ওপেনের জন্যে সঠিক ডিজিটাল কোড খুঁজে পাওয়াই হবে এখন আমাদের প্রধান সমস্যা।'

বলে ঘনিষ্ঠভাবে ডিজিটাল প্যানেল দেখার জন্যে আহমদ মুসা এগুলো প্যানেলের শেষ পয়েন্টটার দিকে।

হাসান তারিকও এগুলো পয়েন্টটার দিকে।

ডিজিটাল লকের উপর চোখ বুলাতেই কপাল কুঞ্চিত হয়ে উঠল আহমদ মুসার। ডিজিটাল লকে কতকগুলো জিরো অংকের সাথে শুরুতে কয়েকটা

বর্ণমালাও যুক্ত আছে। সব মিলিয়ে ডিজিটাল লকটা দাঁড়ায় ‘FAMS 00654123’

ডিজিটাল লকটার উপর চোখ বুলাতেই আহমদ মুসার মনে হলো যে কোথাও এ ধরনের সংখ্যা সে পড়েছে।

হঠাৎ তার মনে পড়ল ডেভিড ডেনিমের লকেট থেকে পাওয়া দুটি চীপসের কথা। দ্রুত সে জ্যাকেটের ভেতরের এক গোপন পকেট থেকে বের করল চীপস দুটি। দুটি চীপসে চোখ বুলিয়ে একটি ডান হাতে তুলে ধরে বলল, ‘হাসান তারিক সমাধান হয়ে গেছে। দেখ এই চীপসের বর্ণমালা ‘FAMS’-এর সাথে ডিজিটাল লকের বর্ণমালা মিলে গেছে। তার মানে এই চীপসের ডিজিট কোড দিয়ে গ্যাংওয়ের এই দরজা খোলা যাবে। এখন শুধু জিরো চীপসের অংকগুলো টাইপ করলেই আমরা দরজা খুলতে পারব।’

হাসান তারিকও চীপসটা হাতে নিয়ে দেখল এবং বলে উঠল, ‘আলহামদুলিল্লাহ। আল্লাহ আমাদেরকে অভাবনীয়ভাবে সাহায্য করেছেন ভাইয়া।’

‘ঠিক তাই হাসান তারিক। আমরা ভাবিনি এবং চাইওনি যে, সুসান ও পলা জোনসরা এখানে আসবে। ঠিক সময়ে দেখ তারা এসে গেছে। তার ফলে নাটকের দৃশ্যটা পাল্টে গেল। ঘটনার হুইল এখন আমাদের হাতে।’

হাসান দ্বিতীয় চীপসটার দিকে ইংগিত করে বলল, ‘দ্বিতীয় চীপসে যে কোন নাম্বার সেটাও কি এখানেই লাগবে? আপনি বলেছিলেন একটা আগে, অন্যটা পরে ব্যবহার করতে হবে।’

‘আগে ও পরের অর্থ এই নয় যে, দুটা কোড একই লকে ব্যবহার হবে। আমি জানি না। তবে কোডের প্রথম চারটি বর্ণমালা থেকে স্পষ্ট প্রথমটার মত দ্বিতীয়টাও আজর ওয়াইজম্যানের ওয়ার্ল্ড ফ্রিডম আর্মির সাও তোরাহ দ্বীপের কোন কিছুর কোড।’ বলল আহমদ মুসা।

‘সা তোরাহ দ্বীপ কি করে বুঝা গেল ভাইয়া?’ জিজ্ঞাসা হাসান তারিকের।

আহমদ মুসা দুটো চীপস হাসান তারিকের সামনে তুলে ধরে বলল, ‘প্রথমটার অর্থ যেমন ‘Freedom Army Mini-Sub’ (FAMS), তেমনি দ্বিতীয়টার অর্থ হলো ‘Freedom Army Sao Torah’ (FAST) ।’

‘ধন্যবাদ ভাইয়া, বুঝেছি। সাও তোরাহের কোড চীপসটা নিশ্চয় এই কোডের মতই গুরুত্বপূর্ণ হবে।’ বলল প্রসন্ন মুখে হাসান তারিক।

হাসান তারিক কথা শেষ করতেই তারা তাদের পেছনে পায়ের শব্দ শুনতে পেল।

বোঁ করে তারা দুজনেই ঘুরে দাঁড়াল।

দেখল পলা জোনস দৌড়ে আসছে। তার চোখে উত্তেজনা।

আহমদ মুসার সাথে চোখাচোখি হতেই সে বলে উঠল, ‘ভাইয়া, টিভি স্ক্রিনে মিনি-সাবের পেরিস্কোপ দেখা যাচ্ছে। এদিকেই আসছে।’

‘গুড নিউজ। চল দেখি।’ বলে আহমদ মুসা ছুটতে শুরু করল।

তার পেছনে হাসান তারিক ও পলা জোনসও দৌড়াতে শুরু করল।

টিভি মনিটরিং-এ বসেছিল সোফিয়া সুসান। আহমদ মুসারা পৌছতেই সোফিয়া সুসান একটু পাশে সরে গিয়ে টিভির ছবি ওদের সামনে নিয়ে এল। আহমদ মুসারা দেখল, তারা যেমন আগে দেখেছিল ঠিক সেভাবেই মিনি-সাব পাথুরে জেটির পশ্চিম প্রান্তে এসে ভিড়ছে।

ভিড়ল মিনি সাবমেরিনটা।

পেরিস্কোপ ধীরে ধীরে উপরে উঠতে লাগল।

মিনি সাবমেরিনটি ভেসে উঠছে।

আধা-ভাসা অবস্থায় মিনি-সাব স্থির হয়ে গেল।

এরপর কি ঘটবে, আহমদ মুসাদের কি করণীয় এসব নিয়ে রুদ্ধশ্বাস অপেক্ষা আহমদ মুসাদের।

অপেক্ষার জবাব পেয়ে গেল আহমদ মুসারা। তারা দেখল, মিনি-সাব থেকে গ্যাংওয়ে বেরিয়ে তাদের এ ঘাঁটির দিকে আসছে।

আহমদ মুসা দ্রুত হাসান তারিককে বলল, ‘হাসান তারিক তুমি গেটে যাও। আমি দেখি কয়জন ও কারা মিনি-সাব থেকে গ্যাংওয়েতে নামছে এখানে

আসার জন্যে। তাদের সাথে কি অস্ত্র থাকবে, থাকবে কিনা সেটাও দেখা যাবে। সেটা হিসাবে রেখেই আমাদের এগুতে হবে। আমি দরজা খোলার ঠিক আগের মুহূর্তে আসব।'

হাসান তারিক উঠে দাঁড়িয়ে ছুটল গ্যাংওয়ের গেটের দিকে।

পল পল করে সময় বয়ে চলল।

আহমদ মুসা দেখল, মিনি-সাবমেরিনের 'নোজ' এর পেছনে যেখানে সাধারণত ক্রুদের কেবিন থাকে। সেখান থেকে গ্যাংওয়ে বেরিয়ে ধীরে ধীরে এগিয়ে আসছে। গ্যাংওয়ে দেখা যাচ্ছে, কিন্তু গ্যাংওয়ের বাইরেটা দেখা যাচ্ছে, ভেতরটা নয়। 'ভেতরে টিভি ক্যামেরা সেট করা নেই' বুঝতে পারল আহমদ মুসা। আশার গুড়ে বালি পড়ল তার। ভেবেছিল ভেতরটা যদি দেখা যায়, তাহলে কাজ সহজ হয়ে যাবে। তা হলো না।

এই সময় টেবিলের মোবাইলটা বেজে উঠল।

এ রকম একটা টেলিফোনের আশংকা করছিল আহমদ মুসা মিনি-সাব থেকে। তাহলে কি মিনি-সাব এরই টেলিফোন এটা? কথা বলতে গিয়ে যদি ধরা পড়ে যায়। টেলিফোন কি সে ধরবে, নাকি ধরবে না। না ধরলে সাবমেরিনের ওরা সন্দেহ করতে পারে। উভয় সংকট। করবে কি সে? ইতিমধ্যে টেলিফোনে তিন বার রিং হয়েছে। এখনি না ধরলে হয়তো লাইন কেটে দিতে পারে। শেষে কথা বলার ঝুঁকিই নিল আহমদ মুসা।

হঠাৎ আহমদ মুসা কাশতে শুরু করল। কাশতে কাশতে টেলিফোন ধরল আহমদ মুসা। টেলিফোন ধরে ওপার থেকে ভারী কণ্ঠের 'হ্যালো' সম্বোধন শুনেই আহমদ মুসা কাশি পীড়িত ভাঙা গলায় বলে উঠল, 'স্যরি, আমি বেগিন এক্সিলেন্সি। হঠাৎ কাশিতে................।'

ওপার থেকে কথায় বাধা দিয়ে বলে উঠল, 'ও.কে। আমরা আসছি। সব ঠিক আছে তো?'

সেই কাশির মধ্যে গলা সামলাতে, সামলাতে বলে উঠল আহমদ মুসা, 'ইয়েস এক্সিলেন্সি।'

'থ্যাংকস। আসি।' বলল ওপার থেকে।

‘ওয়েলকাম এক্সিলেন্সি।’ বলেই ধপ করে চেয়ারে বসে পড়ল। বলল, ‘আমরা ধরা পড়তে পড়তে বেঁচে গেছি।’

সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস টেলিফোনে আহমদ মুসার কথা শুনছিল। তার চোখে-মুখে উৎকণ্ঠা। আহমদ মুসা মোবাইল রাখতেই সোফিয়া সুসান বলল, ‘কথা কি মিনি সাবমেরিন থেকে কেউ বলল মি. আহমদ মুসা?’

‘হ্যাঁ সুসান।’ আহমদ মুসা বলল।

‘বুঝলেন কি করে যে বেঁচে গেলেন?’ বলল সোফিয়া সুসান।

‘কাশির ক্যামোফ্লেজ দিয়ে আমি আমার কণ্ঠকে আড়াল করতে পেরেছি বলে মনে হয়। আমাকে সে চিনতে পারেনি বলেই আমি মনে করছি।’ আহমদ মুসা বলল।

‘খুশির খবর ভাইয়া। তবে ভাইয়া, ওদের চেয়ে ধড়িবাজ দুনিয়ায় কেউ নেই, এটা আপনি জানেন।’ বলল পলা জোনস।

‘ধন্যবাদ পলা। তোমরা দুজন মনিটরিংটা পাহারা দাও। আমি গ্যাংওয়ের গেটে যাচ্ছি।’

বলে আহমদ মুসা ছুটল গেটের দিকে।

সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস দুজনে টিভি স্ক্রীণের দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করল।

অল্পক্ষণের মধ্যেই তারা টিভি স্ক্রীনে দেখল, গ্যাংওয়ে এসে ফিট হচ্ছে ঘাঁটির প্রবেশ দরজার চারদিকের এয়ারটাইট প্যানেলের সাথে। পরক্ষণেই তাদের নজরে পড়ল, গ্যাংওয়ের মুখ থেকে এয়ারটাইট ঢাকনা সরে যাচ্ছে। ঢাকনা সরে যাওয়ার সাথে সাথে তাদের নজরে পড়ল ৬ জন তিন তিন করে গ্যাংওয়ের দুপাশে ঘাঁটির দরজার দিকে ষ্টেনগান বাগিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। আর মাথায় হ্যাট পরা সুবেশধারী দীর্ঘকায় একজন লোক হাত নেড়ে তাদেরকে নির্দেশ দিয়ে এগোচ্ছে গ্যাংওয়ের মুখে ঘাঁটির দরজার দিকে। তারও হাতে রিভলবার। রিভলবার সমেত হাতটা সে কোটের পকেটে ঢুকাল।

সোফিয়া সুসানের মুখ কালো হয়ে উঠেছে। বলল সে পলা জোনসকে, রিভলবারধারী লোকটি হাত নেড়ে যে নির্দেশ দিল তার ছয়জন লোককে, তার অর্থ হলো দেখামাত্র গুলী করতে হবে।'

উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছে পলা জোনস। বলল, 'তাহলে এদিকের সব ব্যাপার ওরা জানতে পেরেছে। কিন্তু কিভাবে?'

'কিভাবে আমি জানি না। হতেও পারে আমরা যেমন ওদের দেখছি, ওরাও তেমন আমাদের দেখছে। বলল সুফিয়া সুসান।

'সর্বনাশ, ভাইয়াদের সাবধান করা দরকার।' বলল দ্রুতকণ্ঠে পলা জোনস।

দ্রুত উঠে দাঁড়াল সোফিয়া সুসান। বলল, 'পলা তুমি এদিকটা দেখ। আমি ওদের কাছে যাচ্ছি।' বলে সোফিয়া সুসান দৌড়ে ঘর থেকে বের হয়ে গেল।

ছুটল সে গ্যাংওয়ের গেটের দিকে।

সোফিয়া সুসান যখন গেট রুমের দরজায় পৌছেছে, তখন দেখল গ্যাংওয়ের মুখের গেট দেয়ালের ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হয়ে যাচ্ছে। গেটের এক পাশে দাঁড়ানো আহমদ মুসা ও হাসান তারিক উন্মুক্ত হয়ে উঠছে গ্যাংওয়ের মুখে দাঁড়ানো লোকদের উদ্যত ষ্টেনগানের সামনে। দেখামাত্র গুলীর মোকাবিলা করার মত প্রস্তুতি আহমদ মুসাদের নেই।

'সামনে গুলী মি. আহমদ মুসা।' বলে চিৎকার দিয়ে উঠে কমান্ডো সোফিয়া সুসান নিজের মাথাটাকে নিচে ঠেলে দিয়ে পা দুটোকে মেঝের সমান্তরালে তীরের মত ছুড়ে দিল গ্যাংওয়ের গেটের দিকে। গুলীর এক পশলা বৃষ্টি বয়ে গেল তার দেহের তিন ফিট উপর দিয়ে।

সোফিয়া সুসানের তীর বেগে ছুটা দেহ গিয়ে সুবেশধারী নেতা লোকটিসহ গ্যাংওয়ের মাঝখানে ক্লোজ হয়ে আসা দুজন ষ্টেনগানধারীকে আঘাত করল। তারা তিনজনই পড়ে গেল। তাদের দেহ সুসানের দেহের উপর দিয়ে সামনে ছিটকে পড়েছিল।

সোফিয়া সুসানের দেহ স্থির হয়েছিল পড়ে যাওয়া তিনজনের পায়ের দিকটায় এসে। ওদের হাত থেকে ছিটকে পড়া একটা ষ্টেনগান সে হাতের কাছে পেয়ে গিয়েছিল।

ওদিকে সোফিয়া সুসানকে নতুন করে টার্গেট করার জন্য গ্যাংওয়ের অন্য চারজন ষ্টেনগানধারী ফিরে দাঁড়াচ্ছিল। ঠিক সময় দরজার পাশে দাঁড়ানো আহমদ মুসারাও তাদের মেশিন রিভলবার থেকে গুলী বর্ষণ শুরু করেছে।

আর সোফিয়া সুসানও ষ্টেনগান পেয়ে শুয়ে থেকেই গুলী বর্ষণ শুরু করল।

দুআক্রমণের মাঝে পড়ে প্রতিআক্রমণের সময় মিনি-সাবের ষ্টেনগানধারীরা পেল না। ওদের সাতটি লাশই গ্যাংওয়ের মেঝেতে গড়াগড়ি দিতে লাগল।

সোফিয়া সুসান উঠতে যাচ্ছিল এসময় গ্যাংওয়ের মিনি-সাব প্রান্ত থেকে পায়ের শব্দ পেল সে।

ষ্টেনগানের ট্রিগারে হাত রেখে বোঁ করে দেহটা ঘুরিয়ে নিল সোফিয়া সুসান। দেখল, তিনজন বেরিয়ে এসেছে মিনি সাব থেকে গ্যাংওয়েতে। তাদের এক জনের হাত খালি অন্য দুজনের হাতে দুটি ষ্টেনগান। তারা মনে হয় পরিস্থিতি আঁচ করার চেষ্টা করছিল। তাদের ষ্টেনগানের ব্যারেলগুলোও নামানো ছিল। সোফিয়া সুসানকে ষ্টেনগান হাতে ঘুরে দাঁড়াতে দেখেই তারা তাদের ষ্টেনগান তুলল সোফিয়া সুসানকে লক্ষ্য করে। কিন্তু তাদের ষ্টেনগানের নল যখন উঠে আসছিল সোফিয়া সুসানকে লক্ষ্য করে, সে সময় সোফিয়া সুসানের ট্রিগার চাপা হয়ে গিয়েছিল। এক ঝাঁক গুলী বেরিয়ে গিয়ে গ্রাস করেছিল ওদের তিনজনকে।

উঠে বসল সোফিয়া সুসান।

তার পেছনে এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা এবং হাসান তারিক।

'ধন্যবাদ সুসান। বুঝলাম, তোমাদের আজোরস দ্বীপের কমান্ডো ট্রেনিং খুবই উন্নতমানের।' গম্ভীর কণ্ঠে আহমদ মুসা বলল।

'কেন একথা বলছেন?' সোফিয়া সুসান বলল।

‘বলছি কমান্ডো সোফিয়া সুসানের কাজ দেখে। সত্যি সুসান, ওরা আমাদের সন্দেহ করেছে সেটা বুঝিনি। তাই ওদের তাৎক্ষণিক আক্রমণের জন্যে আমাদের প্রস্তুতি ছিল না। ওদের ঠেকাবার জন্যে সত্যি তুমি দুঃসাহসের কাজ করেছো। তোমাকে ধন্যবাদ সুসান।’

‘আজোরসের কমান্ডোদের প্রতি আপনার এ স্বীকৃতির জন্যে আপনাকে ধন্যবাদ। আসলে আমার কোন কৃতিত্ব নেই। টিভি স্ক্রীনে আমি ওদের দেখে বুঝেছিলাম যে ওরা ‘শুট এ্যাট সাইট’-এর প্রস্তুতি নিয়েছে। এ জন্যেই আমি ছুটে এসেছিলাম।’ বলল সোফিয়া সুসান।

এ সময় পলা জোনস এসে দাঁড়াল সোফিয়া সুসানের পাশে। তার চোখে-মুখে নতুন উত্তেজনা। বলল সে দ্রুতকণ্ঠে, ‘মিনি-সাব কন্ট্রোল রুমের আউটার প্যানেলে রেড লাইট ব্লিপ করছে। তার মানে মিনি-সাবের ভেতরে ইমারজেন্সি ঘোষণা করা হয়েছে। অন্যদিকে মোবাইলে অবিরাম কল আসছে প্রকৃত ঘটনা জানতে চেয়ে। কোন কলেরই জবাব দিচ্ছি না। আমার মনে হয় এই অবস্থায় মিনি-সাব সরে পড়ার চিন্তা করতে পারে।’

‘ঠিক বলেছ পলা। পরবর্তী কাজ আমাদের সাবমেরিন দখল করা। সময় নষ্ট করা যাবে না। এস তোমরা।’

বলে গ্যাংওয়ে ধরে হাঁটতে লাগল আহমদ মুসা। তার পাশে হাসান তারিক। পেছনে পাশাপাশি হাঁটছে পলা জোনস ও সোফিয়া সুসান।

মিনি সাবমেরিনের প্রবেশ দরজার কাছাকাছি এসে দাঁড়াল আহমদ মুসা। সবাই তার দুপাশে এসে দাঁড়াল। বলল আহমদ মুসা নিচু কণ্ঠে সবাইকে লক্ষ্য করে, ‘ভেতর থেকে আর আক্রমণ আসছে না। এর অর্থ দুটি হতে পারে। এক. ভেতরে কমব্যাটে আসার ফাইটিং লোক নেই, আছে নিছক কয়েকজন ক্রু। দুই. এ হতে পারে যে ফাইটিং লোক থাকলেও সংখ্যায় কম আছে। তারা ভেতরে অবস্থান নিয়েছে চোরাগোপ্তা আক্রমণের জন্যে। এ দুটি বিষয় সামনে রাখার পর তৃতীয় যে বিষয়টি আমাদের বিবেচনায় রাখতে হবে, সেটা হলো ওদের কনট্রোল রুমের টিভি মনিটরিং-এ আমাদের অবস্থান তারা দেখতে পাচ্ছে। তবে আশার কথা মনিটরিং রেজাল্ট প্রয়োজন অনুসারে পৌছাতে পারবে না তার লোকদের

কাছে। এই অবস্থায় আমাদের প্রথম কাজ হবে সাবমেরিন কনট্রোল হাতে নেয়ার জন্যে কনট্রোল রুম দখল করা। কনট্রোল রুম নিয়ন্ত্রণ দখল করার পর কনট্রোল রুম নিয়ন্ত্রণ করবে হাসান তারিক। সাবমেরিন সম্পর্কেও বিশেষজ্ঞ হাসান তারিক। আমি তার সাথে থাকব। আগের মতই রিয়ার গার্ড হিসাবে কাজ করবে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করল।

সোফিয়া সুসান বলল, 'ধন্যবাদ মি. আহমদ মুসা। তবে আমার মনে হয় তেমন কোন ফাইটিং ষ্ট্রেংথ ওদের এখন নেই।'

'আমারও তাই মনে হয়। WFA-এর লোকদের শক্তি থাকলে এতক্ষণ ভেতরে বসে থাকার মত ওরা নয়।' বলল পলা জোনস।

'ধন্যবাদ তোমাদের। এস আমরা এগোই, বলে আহমদ মুসা হাঁটতে শুরু করল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক পাশাপাশি হাঁটতে শুরু করেছে।

আহমদ মুসারা মিনি-সাবের দরজায় পৌছে গেছে। সোফিয়া সুসানরা ধীরে ধীরে পা ফেলে এগুতে লাগল।

আহমদ মুসা ও হাসান তারিক মিনি-সাবের দরজায় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে। তাদের নাক বরাবর সামনে একটা সিঁড়ি উপরে উঠে গেছে। তাদের সামনে দিয়ে মিনি-সাবের একটা করিডোর লম্বালম্বি প্রসারিত। আহমদ মুসার মেশিন রিভলবার বাম দিকে করিডোর বরাবর এবং হাসান তারিকের রিভলবার ডান দিকে করিডোর বরাবর উদ্যত।

হাসান তারিকের একটু ডানে সিঁড়িরও ডান পাশে ক্রুদের কক্ষ। তাদের কক্ষের পাশেই টর্পেডো রুম। তার পরেই ব্যাটারী সেলগুলোর জন্যে নির্ধারিত জায়গা। তার পরেই সোনার ডোম (ঝড়হধৎ ফড়সব)। আর সিঁড়ির বাম পাশে সাবমেরিনের গোটা মাঝ অংশ জুড়ে যুদ্ধ সাবমেরিনের যেখানে থাকে ব্যালষ্টিক মিসাইল বা ইলেক্ট্রনিক যুদ্ধাস্ত্র ও নিউক্লিয়ার চুল্লী, সেখানে দেখা যাচ্ছে প্যাসেঞ্জার কেবিনসমূহ। প্যাসেঞ্জার কেবিনগুলোর পরেই রয়েছে মেশিনারী রুম ও ইঞ্জিন রুম। সবশেষে রয়েছে প্রপেলার অংশ।

চারদিকে চোখ বুলাবার পর হাসান তারিকই প্রথম কথা বলল, 'ভাইয়া সিঁড়ি দিয়ে উঠে গেলেই কনট্রোল রুম।'

'ঠিক আছে, চল কনট্রোল রুমে।' আহমদ মুসা বলল।

'নিচের কক্ষগুলো একবার সার্চ করলে হয় না?' বলল হাসান তারিক।

'এটা সুসানদের জন্যে থাকল। কক্ষগুলোতে কেউ যদি থাকে, তাহলে ওদের আমাদের পিছু নিতে দাও, নিশ্চিন্তে।' আহমদ মুসা বলল।

আর কোন কথা না বলে হাসান তারিক এগুলো সিঁড়ির দিকে এবং দ্রুত ও বিড়ালের মত নিঃশব্দে উপরে উঠতে লাগল।

আহমদ মুসা একটু দূরত্ব রেখে হাসান তারিকের পেছনে উঠতে লাগল।

সিঁড়ি যেখানে শেষ হয়েছে, সেখানে প্রশস্ত একটি ল্যান্ডিং স্পেস। তাকে একটা মিনি করিডোরের অংশও বলা যায়। করিডোরটার বাম মাথায় একটা দরজা। দরজা খোলা। তাতে খাট পাতা দেখা যাচ্ছে। আর ডান প্রান্তটি 'সেইলে'র গায়ের একটা বন্ধ দরজায় গিয়ে শেষ হয়েছে।

কনট্রোল রুমের দরজা খোলা। হাসান তারিক ল্যান্ডিং-এ উঠে মুহূর্ত অপেক্ষা না করে কনট্রোল রুমে প্রবেশ করল।

প্রশস্ত কনট্রোল রুম।

ঘরে কাউকে দেখতে পেল না।

হাসান তারিক দ্রুত এগুলো তিন দিক জুড়ে থাকা কনট্রোল প্যানেলের মাঝখানের বড় স্ক্রীনটার দিকে যেখানে ফুটে উঠার কথা গোটা সাবমেরিনসহ সবগুলো ঘর ও স্থানের দৃশ্য। স্ক্রীনটা অফ করা।

হাসান তারিক স্ক্রীনের সুইচ বোর্ডটার উপর ঝুঁকে পড়তেই দরজার পাশের একটা ষ্টিল আলমারির আড়াল থেকে একজন লোক বিড়ালের মত নিঃশব্দে বেরিয়ে এল হাসান তারিকের দিকে রিভলবার তাক করে।

হাসান তারিকের সমস্ত মনোযোগ স্ক্রীন ও সু্ুইচ প্যানেলের দিকে নিবদ্ধ থাকায় কিছুই আঁচ করতে পারল না।

রিভলবারধারী, একজন তরুণ, এগিয়ে গিয়ে তার রিভলবারের নলটা হাসান তারিকের মাথায় চেপে ধরে বলল, 'হাত উপরে তুলুন, না হলে গুলী করব।'

হাসান তারিক হাত উপরে তুলল।

আহমদ মুসা ততক্ষণে কনট্রোল রুমের দরজায় পৌছে গেছে। তার নজরে পড়ল দৃশ্যটা।

কিন্তু সংগে সংগেই ঘরে না ঢুকে একটু সময় চারদিকে দেখার জন্যে যে আর কোন শত্রু আশে-পাশে লুকিয়ে আছে কিনা। সন্দেহজনকত কিছু দেখল না সে। তারপর আহমদ মুসাও নিশব্দে কনট্রোল রুমে প্রবেশ করল এবং সেও রিভলবারধারীর মাথায় তার মেশিন রিভলবারের ভারী নল চেপে ধরে বলল, রিভলবার ফেলে দিয়ে হাত তুলে দাঁড়াও।

কিন্তু আহমদ মুসাও খেয়াল করেনি যে তারা সিঁড়ি দিয়ে উপরে ওঠা শুরু করলে টর্পেডো মেশিনারিজ রুম থেকে দুজন রিভলবারধারী দ্রুত বেরিয়ে এসে আহমদ মুসার পিছু নিয়েছিল নিশব্দে।

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার সাথে সাথেই ওরা ল্যান্ডিং-এ গিয়ে পৌছেছিল। তাদের একজন দ্রুত রিভলবার তুলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে।

আহমদ মুসা শেষ মুহূর্তে টের পেয়েছিল, পেছনে পায়ের শব্দ টের পেয়েই বিদ্যুত গতিতে বসে পড়ল। ততক্ষণে ট্রিগার টিপে ফেলেছিল পেছনের রিভলবারধারী। বুলেটটি গিয়ে আঘাত করল হাসান তারিকের পেছনে দাঁড়ানো রিভলবারধারী যুবকটার ডান কাঁধে।

রিভলবার পড়ে গেল আহত যুবকটার হাত থেকে। আর্তনাদ করে উঠে সেও বসে পড়ল।

পেছনের দুরিভলবারধারী কিছুটা অপ্রতিভ হয়ে পড়েছিল তাদের গুলী তাদের লোককে হিট করায়। কিন্তু পরক্ষণেই তাদের রিভলবার তাক করেছিল আহমদ মুসাকে। আহমদ মুসার মেশিন রিভলবারের ব্যারেল ঘুরে আসছিল তাদের দিকে।

কিন্তু তাদের রিভলবার থেকে গুলী বেরুবার আগেই তাদের পেছন থেকে দুটি রিভলবার এক সঙ্গে গর্জে উঠার শব্দ উঠল। তার সাথে সাথে ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ানো দুজন রিভলবারধারী মাথায় গুলী খেয়ে পড়ে গেল।

সিঁড়ি থেকে গুলী দুটো করেছিল সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস। তারা আহমদ মুসাকে অনুসরণকারী দুজনকে ফলো করে উপরে উঠে আসছিল।

গুলী করেই ল্যান্ডিং-এ উঠে এল সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস।

হাসান তারিকের পেছনের যুবকটি গুলীবিদ্ধ হওয়ার পর আহমদ মুসা তার দিকে নজর রেখেছিল। ল্যান্ডিং-এ দাঁড়ানো দুজনকে মাথায় গুলী খেয়ে পড়ে যেতে দেখে লোকটি তার বাম হাত উপরে তুলে অনামিকার গোল্ড রিংটি কামড়ে ধরতে যাচ্ছিল। সংগে সংগে আহমদ মুসা তার বাম হাত টেনে নিয়ে আংটিটা খুলে নিয়ে বলল, 'তোমার বসরা তাদের স্বার্থ সিদ্ধির জন্যে তোমাকে মারতে চায়, কিন্তু আমরা মানুষের কল্যাণের জন্যে তোমার বেঁচে থাকা এখন জরুরী মনে করি।'

যুবকটির উদ্দেশ্যে কথা কয়টি বলেই আহমদ মুসা তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তুমি কনট্রোল রুমটা বুঝে নাও।'

তারপর সোফিয়া সুসানদের উদ্দেশ্য করে বলল, 'তোমাদের ধন্যবাদ। আগের মতই ঠিক সময়ে এসে পড়েছিলে। সুসান, এখন তোমরা দুজন গোটা সাবমেরিনটা চেক করে এস। আমি ততক্ষণে এর আহত জায়গাটা পরীক্ষা করি। রক্ত বন্ধের ব্যবস্থা করতে হবে।'

আহমদ মুসাকে ধন্যবাদ দিয়ে সিঁড়ি দিয়ে নামার জন্যে ঘুরে দাঁড়াল সোফিয়া সুসান। 'চল পলা' বলে সিঁড়ি দিয়ে নামা শুরু করল সোফিয়া সুসান।

ওদিকে হাসান তারিক কনট্রোল রুমের রিডিং শুরু করেছে।

আহমদ মুসা মনোযোগ দিল লোকটির দিকে। তার গায়ের জামাটা ছিঁড়ে ফেলে তার ডান কাঁধটাকে উন্মুক্ত করল।

আহমদ মুসা জায়গাটা পরীক্ষা করে বলল, 'সুসংবাদ তোমার জন্যে ক্ষতটা খুব গভীর নয়। বুলেটটাও ভেতরে নেই। গোশত তোমার কিছু ছিঁড়ে নিয়ে গেলেও বড় কষ্ট থেকে তোমাকে বাঁচিয়ে দিয়ে গেছে।' হাসিমুখে হাল্কা সুরে কথাগুলো বলল আহমদ মুসা।

যুবকটি আহমদ মুসার দিকে তাকাল। তার চেহারায় কিছু বিস্ময়। এমন নির্দোষ হাসি ও অন্তরঙ্গ কথা সে এমন শত্রুর কাছ থেকে বোধ হয় আশা করেনি। পরে সে চোখ নামিয়ে নিল এবং গম্ভীর কণ্ঠে বলল, ‘আমি বাঁচতে চাই না মরতে চাই। আমার কাছে কিছু পাবেন না। বাঁচিয়ে লাভ নেই। বেঁচে গেলেও আমি নিজেকে এখন মৃত বলে মনে করছি।’

‘বাঃ সুন্দর কথা বলতো! যাক, এখন বল তোমাদের ফাষ্ট এইডের সরঞ্জাম কোথায়?’ আহমদ মুসা বলল।

যুবকটি মাথা ঘুরিয়ে দরজার পাশে একটা আলমিরার মাথার উপর দেয়ালের সাথে হুক দিয়ে আটকানো একটা বাক্স দেখিয়ে দিল।

আহমদ মুসা বাক্সটি নামিয়ে এনে খুলে দেখল ঔষধপত্রসহ ফাষ্ট এইডের সবরকম সরঞ্জাম প্রচুর পরিমাণে আছে।

কাজে লেগে গেল আহমদ মুসা।

যথাসম্ভব কম কষ্ট দিয়ে অত্যন্ত যতেœর সাথে আহত জায়গাটা পরিষ্কার করে ব্যান্ডেজ বেঁধে দিল এবং ঔষধও খাইয়ে দিল। তারপর হাসান তারিককে দিয়ে লোকটির কামরা থেকে জামা আনিয়ে তাকে পরিয়ে দিল।

লোকটার চোখে-মুখে বিস্ময়। সুযোগ পেলেই চোরা চোখে আহমদ মুসাকে বুঝতে চেষ্টা করছে সে। জামাটা পরে নেবার পর সে বলে উঠল, ‘আপনি কি ভুলে গেছেন আমি আপনার শত্রু?’

যুবকটি বয়সে একেবারে তরুণ।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘তোমার আরও একটা পরিচয় আছে। তুমি মানুষ। এই পরিচয়ে আমরা আদমের সন্তান হিসেবে পরস্পর ভাই।’

‘গ্যাংওয়েতে যে দশজনকে হত্যা করেছেন এবং এই যে ল্যান্ডিং-এ দুজন নিহত হলো, তারা সবাই তো আদমের সন্তান, আপনাদের ভাই।’ বলল তরুণটি।

‘অবশ্যই। কিন্তু ওদের হত্যা না করলে ওরা আমাদের হত্যা করতো। আত্মরক্ষার্থেই এই হত্যা না করে উপায় ছিল না। ওরা আদমের সন্তান বটে, কিন্তু কুসন্তান।’ আহমদ মুসা বলল।

‘কিন্তু ওরা আপনার ঘরে যায়নি। আপনারাই এখানে কয়েকজন লোককে হত্যা করে অনধিকার প্রবেশ করেছেন।’ লোকটি বলল।

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘ক্রিমিনাল, কিডন্যাপারদের ঘরে প্রবেশের জন্যে অনুমতি নিতে হয় না এবং এটা অনধিকার চর্চা নয়।’

‘ক্রিমিনাল, কিডন্যাপার কারা?’ বলল যুবকটি।

‘সাও তোরাহ দ্বীপ একটা দোজখখানা তা তুমি জান না? জান না সেখানে শত শত নিরপরাধ লোককে বন্দীশালায় রেখে অকথ্য নির্যাতন চালানো হচ্ছে। আজর ওয়াইজম্যানদের এই নিপীড়নের রাজত্ব গোটা দুনিয়া ব্যাপী বিস্তৃত, তা তুমি জান না?’ আহমদ মুসা বলল। আবেগ এসে ভারী করেছিল তার কণ্ঠ।

বিস্ময়ে বিস্ফোরিত হয়ে গেল যুবকটির চোখ। বলল, ‘কিন্তু আমরা তো জানি যাদেরকে ওখানে রাখা হয়েছে তারা সবাই বড় বড় ক্রিমিনাল।’

‘কয়েক দিন আগে শাইখুল ইসলাম আহমদ মুহাম্মাদ নামে একজন প্রৌঢ় ব্যক্তিকে তোমরা সাও তোরাহ দ্বীপে নিয়ে গেছ, তাকে কি ক্রিমিনাল মনে হয়েছে তোমার কাছে?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

সংগে সংগে কথা বলল না যুবকটি। আত্মস্থ হওয়ার মত সে মাথা নত করল। একটু পরে বলল, ‘না তাঁকে ক্রিমিনাল মনে হয়নি। তিনি একজন ধর্মনেতা। অমন প্রশান্ত চেহারার লোক ক্রিমিনাল হয় না।’

‘সাও তোরাহ দ্বীপে যাদের আটকে রাখা হয়েছে, তাঁরা তাঁর মতই প্রশান্ত চিত্তের মানুষ। তুমি মনে করতে পার, সাও তোরাহ হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পের নতুন সংস্করণ।’ আহমদ মুসা বলল।

মুখটি চুপসে গেল যুবকটির। বলল, ‘কিন্তু ওদের সাথে আপনাদের সম্পর্ক কি? আপনারা কেন এই হত্যাকান্ড ঘটালেন এখানে প্রবেশ করে?’ বলল যুবকটি।

‘আমরা সাও তোরাহ দ্বীপের বন্দীদের মুক্ত করতে চাই। তাদের মধ্যে আমাদের কয়েকজন বন্ধু রয়েছেন। এই উদ্দেশ্যে সাও তোরাহ যাবার জন্যেই আমরা এই মিনি-সাব দখল করেছি।’ আহমদ মুসা বলল।

ভয় ও আতংকে পাংশু হয়ে উঠল যুবকটির মুখ। বলল, 'সর্বনাশ তেরসিয়েরা দ্বীপের সেই লোকরাই কি আপনারা, যারা হারতায় আমাদের ইমানুয়েল, কেলভিন ও সুলিভানদের খুন করেছেন?'

একটা ঢোক গিলল যুবকটি। তারপর আবার শুরু করল, 'আপনারা সাও তোরাহ থেকে বন্দীদের উদ্ধার করবেন কি করে, আপনাদেরই তো প্রাণে বাঁচা দায়। যে কোন মূল্যে আপনাদের শেষ করা হবে!'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'তোমাদের আজর ওয়াইজম্যান এই চেষ্টা করছেন। আর আমরা চেষ্টা করছি সাও তোরাহ থেকে বন্দীদের উদ্ধার করতে। জেনে রাখ, আমাদের 'ন্যায়'-এর সংগ্রামই জয়ী হবে।'

'আমরা ইহুদীরাও ন্যায়ের জন্যে লড়াই করছি। হিটলারের কনসেনট্রেশন ক্যাম্পে আমরাই গণহত্যা ও নির্যাতনের শিকার হয়েছি। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে আবার আমাদের বিপদের মুখে ফেলা হয়েছে।' বলল যুবকটি।

'কিন্তু হিটলারের নির্যাতন ইহুদীদের সক্রিয় অংশকে আজ হিটলার বানিয়েছে, মানুষ বানায়নি। ফিলিস্তিনে ইসরাঈলের আচরণ এটাই প্রমাণ করে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইহুদীরা 'রাম-রাজত্ব' করার সুযোগে বিশ্বাসঘাতক বিভীষণের মত আচরণ করেছে। সাও তোরাহতে আজর ওয়াইজম্যান যা করছে, তার পেছনে কোন ন্যায়-নীতি কাজ করছে?' বলল আহমদ মুসা। গম্ভীর কণ্ঠ তার।

যুবকটি সংগে সংগে কথা বলল না। একটু ভাবল। তারপর বলল, 'আপনি যা বললেন তা একটা গ্রুপের জন্যে প্রযোজ্য হতে পারে, সব ইহুদীর ক্ষেত্রে নয়।'

'কিন্তু এই ইহুদী গ্রুপই আজ ইহুদীদের পরিচালনা করছে। সব জেনেও ইহুদীরা কেউ তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়নি। যেমন সাও তোরাহতে যে অমানুষিকতা ও বর্বরতা চলছে তার প্রতিবাদ দূরে থাক সহযোগিতা করছ তোমরা অনেকে।'

যুবকটিকে খুব অপমানিত ও বিব্রত দেখাল। বলল, 'সাও তোরাহ সম্পর্কে আপনি যা বললেন, তা সত্য বলে এখনও আমি জানি না।' তার কণ্ঠে ক্ষোভ।

'তোমার নাম কি?' জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘এ্যারন।’ বলল যুবকটি।

‘এ্যারন, অপরাধমূলক কাজ হয় গোপনে, কিন্তু বিচার হয় প্রকাশ্যে। আজর ওয়াইজম্যান যাদের বন্দী করে সাও তোরাহ নিয়ে গেছে, তারা যদি ক্রিমিনাল হয়, তাহলে তাদের নিয়ে এত রাখ ঢাক কেন? কেন তাদের দুনিয়ার সব চোখের আড়ালে জন-মানবহীন এক দ্বীপে এনে রাখা হয়েছে? কেন এমনকি তোমরাও তাদের সম্পর্কে জান না? আলেকজান্ডার সোলজেৎসিনের লেখা ষ্ট্যালিনের গোলাগ দ্বীপের কথা জান। সে গোলাগ দ্বীপের সাথে সাও তোরাহ দ্বীপের কোন পার্থক্য আছে?’ বলল আহমদ মুসা।

এ্যারন তৎক্ষণাত কিছু বলল না। চোখ বন্ধ করে ভাবছিল। একটু পর চোখ খুলে বলল, ‘আচ্ছা বলুন তো আপনার বন্ধুদেরকে কেন এখানে ধরে আনা হয়েছে?’

‘আমাদের সাত বন্ধুদের সকলেই সত্য-সন্ধানী গোয়েন্দা। ফ্রান্সে তাদের গোয়েন্দা ফার্ম আছে। আন্তর্জাতিক সন্ত্রাসীদের পাকড়াওয়ে তাদের সাফল্যের জন্যে দুবার তারা ইউরোপীয় গোল্ড মেডেল পেয়েছে। সবশেষে তারা কাজ করছিল নিউইয়র্কের ‘লিবার্টি’ ও ‘ডেমোক্র্যাসি’ টাওয়ার ধ্বংসের সত্য উদঘাটনে। মনে করা হয় তারা তাদের কাজ প্রায় সম্পূর্ণ করে ফেলেছিল। অমূল্য সব দলিল-দস্তাবেজ সম্পর্কে দুনিয়াবাসী যাতে জানতে না পারে, সত্য যাতে প্রকাশ না পায় এজন্যেই আজর ওয়াইজম্যান সাত গোয়েন্দাকে গ্রেফতার করেছে এবং তাদের ফার্ম সমূলে ধ্বংস করে দিয়েছে।’ আহমদ মুসা বলল।

রাজ্যের বিস্ময় এসে জমা হয়েছে এ্যারনের চোখে-মুখে। বলল, ‘আজর ওয়াইজম্যান কেন এটা করবেন? তার কি স্বার্থ এতে?’

‘তাদেরই তো স্বার্থ! টুইনটাওয়ার তো তারা মানে ইহুদীবাদীরাই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি মাফিয়া চক্রের যোগসাজসে ধ্বংস করেছে।’

এ্যারনের চোখ বিস্ময়ে ছানাবড়া হয়ে উঠল। বলল, ‘আপনি কি বলছেন? গত বিশ বছরের প্রতিষ্ঠিত একটা সত্যকে আপনি পাল্টে দিতে চান?’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘না, ওরা বিশ বছর ধরে চালু ভুয়া ইতিহাস মুছে দিয়ে সত্যিকার ইতিহাস মানুষকে জানাতে চেয়েছিল।’

বিস্ময়ের ঘোর এ্যারনের মুখ থেকে এখনও কাটেনি। আহমদ মুসা থামলেও সে কথা বলল না। ভাবছে সে। অনেকক্ষণ পর সে বলল, 'বলতে চান, বিশ বছর ধরে এতবড় একটা মিথ্যা চালু আছে?'

'শুধু চালু আছে নয় এ্যারন, সে মিথ্যা ঢেকে রাখার জন্যে আজর ওয়াইজম্যানরা আবার জঘন্য অন্যায়ও করছে।' আহমদ মুসা বলল।

এ্যারন উত্তরে কিছু বলল না। নিরব হয়ে গেল।

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল। মনোযোগ দিল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'কনট্রোল প্যানেল ষ্টাডি তোমার হলো?'

'হ্যাঁ ভাইয়া। মোটামুটি দেখা হয়ে গেছে।' বলল হাসান তারিক।

'যুদ্ধ সাবমেরিন থেকে এই প্যাসেঞ্জার সাবমেরিনের খুব কি পার্থক্য আছে?' আহমদ মুসার জিজ্ঞাসা।

'কিছু আছে। সেটা মাত্র কিছু যোগ কিছু বিয়োগের ব্যাপার। নতুন কোন টেকনলজি এখানে নেই।'

'কাজ শুরু করো হাসান তারিক। গ্যাংওয়ে গুটিয়ে নাও। আর..........।'

আহমদ মুসা কথা শেষ করতে পারলো না। কনট্রোল রুমে প্রবেশ করল সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস। দরজায় পা দিয়েই সুসান বলে উঠেছিল, 'মি. আহমদ মুসা ঈশ্বরকে ধন্যবাদ। গোটা সাবমেরিন শত্রুমুক্ত। এখানে এখন শাসন শুরু হতে পারে।'

'আল-হামদুলিল্লাহ। তোমাদেরকে ধন্যবাদ সুসান এই বিজয়ে অগ্রগামী ভূমিকা পালনের জন্যে।' বলে আহমদ মুসা তাকাল পরিপূর্ণভাবে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনসের দিকে। বলল, 'সুসান, পলা আমরা এখন সাও তোরাহ যাত্রা করব। তার আগে তোমাদের নামতে হবে সাবমেরিন থেকে।'

বিস্ময় ফুটে উঠল সোফিয়া সুসান ও পলা জোনসের চোখে-মুখে। কয়েক মুহূর্ত তারা যেন কথা বলতে পারলো না। একটু সময় নিয়ে প্রথম কথা বলে উঠল সোফিয়া সুসান, 'দেখুন আমি একজন মেয়ে হিসাবে এখানে আসিনি, এসেছি একজন কমান্ডো হিসাবে। আর পলা জোনস এসেছে একজন গোয়েন্দা অফিসার হিসাবে। আমরা সাও তোরাহ যাবার জন্যে প্রস্তুত। আপনি নামতে নির্দেশ দিলে

আমরা নির্দেশ অমান্য করব। এই আজোরসে আমরা মেজবান, আর আপনারা মেহমান। মেজবানকে ঘর থেকে বের করে দেবার অধিকার মেহমানের নেই।'

বলে একটু থামল সোফিয়া সুসান। তারপর আবার বলা শুরু করল, 'আমিও কিছু জানতাম। পলার কাছ থেকেও আপনাদের নৈতিকতা-সংস্কৃতি সম্পর্কে আরও কিছু শুনেছি। আমি আপনাকে নিশ্চয়তা দিচ্ছি আপনাদের সংস্কৃতি আমরা মেনে চলব। আমরা সাবমেরিনকে দুভাগে ভাগ করে নিচ্ছি। নিচের জগতটা আমাদের আর উপরটা আপনাদের। কোন আদেশ দেয়ার দরকার হলে ইন্টারকম ব্যবহার করবেন। অথবা ডেকে নির্দেশ দেবেন। আমরা উপরে আসবো না।

গম্ভীর হয়ে উঠেছিল আহমদ মুসার মুখ। বলল, 'সংস্কৃতির প্রশ্ন তো আছে সুসান। তাছাড়াও একটা বিপদের মধ্যে তোমাদের জড়াতে চাইনি। তোমরা জড়িত হওয়া মানে আজোরস জড়িত হওয়া। আমি আজোরসকে জড়িত করতে চাচ্ছিলাম না।'

'আজর ওয়াইজম্যানদের ইতিমধ্যে জানা হয়ে গেছে আজোরস সরকারের সিদ্ধান্তের সাথে আমাদের কোন সম্পর্ক নেই। আর থাকলেও ক্ষতি কি? আজোরস জড়িত হবে না কেন? মিথ্যা কথা বলে আজোরস সরকারের কাছ থেকে সাও তোরাহ লীজ নিয়ে সেখানে তারা জঘন্য অপরাধমূলক কাজ করে যাচ্ছে। এর শুধু প্রতিবাদ নয় প্রতিকার হওয়া দরকার। প্রতিকারের জন্যেই এই মিশনে আমরা অংশ নিতে চাই।' বলল সোফিয়া সুসান।

'হাসান তারিক, তুমি কি প্রস্তুত? তোমার সামনে কি সাও তোরার রুট ম্যাপ আছে?'

'আমি প্রস্তুত। তবে রুট ম্যাপ আমার সামনে নেই। কম্পিউটারে পাওয়া যেতে পারে। মি. এ্যারনের কাছে এ ব্যাপারে আমরা সাহায্য চাইতে পারি।' হাসান তারিক বলল।

আহমদ মুসা কিছু বলার আগেই এ্যারন বলে উঠল, 'সাও তোরাহ যাত্রা করে লাভ নেই। সেখানে আপনারা প্রবেশ করতে পারবেন না, এমনকি সাও তোরাহতে নোঙর করতেও পারবেন না।' তার চোখে উদ্বেগের প্রকাশ।

‘কেন প্রবেশ করা যাবে না? কেন নোঙর করা যাবে না?’ জিজ্ঞাসা আহমদ মুসার।

‘নোঙরের স্থান খুঁজে পাবেন না। তাদের কৌশল ও প্রতিরোধ ডিঙিয়ে প্রবেশ করাও অসম্ভব।’ বলল এ্যারন।

ভ্রুকুঞ্চিত হয়েছে আহমদ মুসার। একটু ভাবল। তারপর বলল, ‘নোঙরের কোন সারফেস জেটি নেই। এই সান্তাসিমা উপত্যকায় নোঙরের মত ওখানেও আন্ডার ওয়াটার নোঙরের ব্যবস্থা আছে এই তো? আন্ডার ওয়াটার এর সেই ব্যবস্থা খুঁজে পাওয়া যাবে না এই তো?’

বিস্ময় এ্যারনের চোখে-মুখে। বলল, ‘ও গড, আপনি সাংঘাতিক লোক। আপনি ঠিক ধরে ফেলেছেন। তবে সান্তাসিমা উপত্যকা থেকে ওখানকার প্রটেকশন ও প্রতিরোধ ব্যবস্থা অনেক অনেক বেশি হবে, তা আপনি নিশ্চয় বুঝবেন।’

‘আমরা সাও তোরাহ যাবই। ন্যায়-অন্যায়ের তোয়াক্কা না করে যদি তুমি আগের অবস্থানেই থাক, তাহলে তোমাকে মেরে ফেলা যাবে, কিন্তু তথ্য আদায় করা যাবে না, সাহায্য পাওয়া যাবে না, এটা আমি জানি। এর ফলে আমাদের অসুবিধা হবে, কিন্তু পিছু হটবো না। জয় অবশেষে আমাদেরই হবে।’ বলল আহমদ মুসা।

বলে একটু থেমেই আবার নির্দেশ দিল, ‘হাসান তারিক, তুমি গ্যাংওয়ে গুটিয়ে নিয়ে সাবমেরিন ষ্টার্ট দাও। কনট্রোল-কম্পিউটারে দেখ ‘সাও তোরাহ’ শিরোনাম অথবা FAST শিরোনামে সাও তোরার ম্যাপ ও রুটম্যাপ আছে কিনা।’

কাজে লেগে গেল হাসান তারিক।

অল্পক্ষণ পরেই আনন্দে চিৎকার করে উঠল, ‘ধন্যবাদ ভাইয়া, সাও তোরার ম্যাপ ও রুট দুটই পেয়ে গেছি FAST কোডে।’

এ্যারনের চোখ ছানাবড়া। বলল আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে, ‘স্যার, আপনি কি সবজান্তা। এই ‘কোড নাম্বার’ আপনি জানলেন কি করে?’

‘সবজান্তা নই, সত্য-সন্ধানী। এ কোডসহ দুটি কোড আমি পেয়েছিলাম ডেভিড ডেনিমের গলায় ঝুলানো খৃষ্টের ক্রস থেকে।’ বলল আহমদ মুসা।

‘খৃষ্টের ক্রসটাও আপনি ভেঙে দেখেছিলেন? সন্দেহ হয়েছিল কেমন করে স্যার?’ এ্যারন বলল রাজ্যের বিস্ময় চোখে নিয়ে।

‘ইহুদী ডেভিড ডেনিমের গলায় খৃষ্টের প্রতিকৃতি ঝোলানোটা অস্বাভাবিক হিসেবে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল।’ আহমদ মুসা বলল।

‘ধন্যবাদ আপনাকে। আপনার সাত বন্ধুর মত আপনিও দেখছি গোয়েন্দা।’ বলল এ্যারন।

এ্যারন থামতেই হাসান তারিক বলে উঠল, ‘বিসমিল্লা, ষ্টার্ট অন করলাম ভাইয়া।’

চলতে শুরু করল মিনি-সাবমেরিন।

‘মি. আহমদ মুসা, আমরা নিচে আমাদের জগতে চললাম। খাবার ডিপার্টমেন্ট নিচে আমাদের ওখানে। খাবার দেবার জন্যে উপরে আসার অনুমতি আছে তো?’

আহমদ মুসা একটু গম্ভীর হয়ে উঠল। বলল, ‘সুসান, আমাদের ধর্মে পর্দার ভিত্তিটা হলো মানুষের মানসিকতা। তারপর চোখের নিয়ন্ত্রণ। সবশেষে ফিজিক্যাল সেপারেশন। মানসিকতার ব্যাপার হলো, অবৈধ সকল চিন্তা থেকে মনকে পবিত্র রাখা। মানসিকতা যদি পবিত্র হয়, তাহলে চোখ আপনাতেই পবিত্র ও নিয়ন্ত্রিত হয়ে যায়। আর ফিজিক্যাল সেপারেশনের বিষয়টা হলো, বৈধ সম্পর্কহীন নারী ও পুরুষ পরস্পরকে নিরাপদ দূরত্বে রাখা। নিরাপদ দূরত্বে থাকলেও জীবন পরিচালনা ও সমাজ সম্পর্কের প্রয়োজনে তাদেরকে শালীনতা সহকারে কাছাকাছি আসতেই হয়। একে ইসলাম নিষিদ্ধ করেনি। নিষিদ্ধ করেনি বলেই তো মনকে পবিত্র ও চোখকে নিয়ন্ত্রিত রাখার শিক্ষা দেয়া হয়েছে। এখন চিন্তা করে দেখ সুসান খাবার নিয়ে আসা যাবে কিনা।’

সোফিয়া সুসানও গম্ভীর হলো। বলল, ‘আমি ও পলা মুসলমান নই। ঐ পবিত্রতা তো আমাদের উপর বর্তায় না।’

‘ইসলামের এ বিধানগুলো মানবিক, তাই সব মানুষের জন্যে। মুসলমান হওয়ার পরই শুধু ইসলামের বিধান মানতে হবে তা নয়। সব মানুষই ইসলামের

এ মানবিক ও কল্যাণকর বিধান মানতে পারে। অবশ্য ইসলামের এগুলো যারা মানে তাদেরকেই মুসলমান বলা হয়।’

সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস এক সাথে হেসে উঠল। বলল, ‘তার মানে ইসলামের বিধান মেনে নিয়ে আমরা মুসলমান হয়ে যাই।’

আহমদ মুসা একটু থামল। বলল, ‘আমি তা বলছি না। কিন্তু একে অপরকে ভালোর দিকে কল্যাণের দিকে ডাকবার অধিকার অবশ্যই আছে।’

‘কল্যাণের বিধান তো দুনিয়াতে একটা নেই মি. আহমদ মুসা।’ বলল সোফিয়া সুসান।

‘সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে জীবন্তটাকেই তো মানুষ গ্রহণ করবে।’ আহমদ মুসা বলল।

‘তার মানে বলছেন যে ইসলামই সবচেয়ে পূর্ণাঙ্গ, সবচেয়ে উৎকৃষ্ট এবং সবচেয়ে জীবন্ত।’ সুসানই আবার বলল।

‘আমি বললেই তুমি গ্রহণ করবে, মানুষ বিশ্বাস করবে তা নয়। তোমাকেই অনুসন্ধান করতে হবে এবং তোমার রায়ই তোমার কাছে চূড়ান্ত হবে।’

হাসিতে মুখ ভরে উঠল সোফিয়া সুসানের। বলল, ‘ধন্যবাদ। অনুসন্ধান করব। আশা করি আপনি সাহায্য করবেন। এখন আমরা চলি।’

বলে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস ঘুরে দাঁড়িয়ে নিচে নামতে শুরু করল।

বিস্ময়-বিমুগ্ধ চোখে এ্যারন আহমদ মুসাদের কথা শুনছিল। সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস নিচে নেমে যেতেই এ্যারন আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলে উঠল, ‘আপনাকে একটা কথা বলব?’

‘অবশ্যই।’ আহমদ মুসা বলল।

‘আপনি খুব সংবেদনশীল মনের একজন ভালো লোক। খুনো-খুনীর জগতে আপনার আসা ঠিক হয়নি।’

‘কি করব আজর ওয়াইজম্যানরাই তো আমাকে এ পথে নিয়ে এসেছে। দেখ, আমার বন্ধুদের বন্দী করে সাও তোরাহতে না আনলে, সাও তোরাহকে

মানুষের উপর বর্বর নির্যাতন চালানোর জেলখানায় পরিণত না করলে তো আমি এখানে আসতাম না।' বলল আহমদ মুসা।

এ্যারন কোন উত্তর দিল না। কিছুক্ষণ চুপ করে থাকার পর বলল, 'আরেকটি কথা, আমাদের ইহুদী ধর্ম সম্পর্কে আপনার মত কি?'

একটু হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'আমার মত না নেয়াই ভালো। তুমি খুশি হবে না আমার কথা শুনে।'

'না তবু আপনি বলুন। আমি বুঝতে পারছি, আপনি অনেক জ্ঞান রাখেন ধর্ম সম্পর্কে এবং আপনি কোন অসত্য কথা বলবেন না।' বলল এ্যারন একটু আবেগ জড়িত কণ্ঠে।

'দেখ, এ ব্যাপারে অনেক কথা বলার আছে। কিন্তু তোমাকে আমি একটা কথাই বলব। ইহুদী দর্শন এখন আর কোন ধর্ম পদবাচ্য নেই। এটা উৎকট এক সাম্প্রদায়িক ও রাজনৈতিক বিশ্বাসে পরিণত হয়েছে। ধর্ম তো মানুষের কল্যাণের জন্য খোদায়ী ব্যবস্থা। তাই ধর্মকে সব মানুষের জন্যে উন্মুক্ত থাকতে হয় যাতে সব মানুষ সে ধর্ম গ্রহণ করে উপকৃত হয়। কিন্তু ইহুদী ধর্ম তা নয়। অইহুদী কেউ ইহুদী ধর্ম গ্রহণ করে ইহুদী হয়ে যেতে পারে না, ইহুদী হতে হয় জন্মগতভাবে। সুতরাং ইহুদী ধর্ম এখন মানুষের ধর্ম নয়। আজর ওয়াইজম্যানদের মত ইহুদীবাদীরা ইহুদী ধর্মকে আধিপত্যবাদী এক রাজনীতিতে পরিণত করেছেন।' আহমদ মুসা বলল।

এ্যারন গভীর মনোযোগের সাথে আহমদ মুসার কথাগুলো শুনছিল। আহমদ মুসার কথা শেষ হলেও সে কোন কথা বলল না। তার চোখে শূন্য দৃষ্টি। একটা আত্মস্থভাব। যেন গভীর ভাবনায় ডুবে গেছে সে।

মিনি-সাব তখন অনেক পানির গভীরে।

চলছে মিনি-সাব।

হারতার উপকূল সমান্তরালে ছুটে চলছে মিনি-সাবটি।

আহমদ মুসা কথা শেষ করেই তাকাল হাসান তারিকের দিকে। বলল, 'তোমার ট্রাভেল প্ল্যান কি হাসান তারিক?'

‘সাও তোরাহ্ এখান থেকে তিনশ কিলোমিটার। মধ্যম গতিতে চলব। রাতে পৌছতে চাই সাও তোরাহ্ উপকূলে।’ হাসান তারিক বলল।

‘ঠিক আছে। আল্লাহ্ ভরসা।’

‘আমিন।’ বলল হাসান তারিক।

সাও তোরাহ দ্বীপের রাত ১২টা।

দ্বীপ জুড়ে নিকষ অন্ধকার, নিñিদ্র নিরবতা।

দ্বীপের পশ্চিম উপকূল বরাবর পাহাড়ের কালো দেয়াল। এই দেয়ালের মাঝখানে সংকীর্ণ একটা ফাটল। সমুদ্র থেকে ১০ গজ প্রশস্ত একটা খাড়ি পাহাড়ের দেয়ালকে দুপাশে রেখে দ্বীপের ভেতরে সিকি মাইলের মত ঢুকে গেছে। দুপাশের পাহাড় থেকে নেমে আসা গাছ-পালা খাড়িটাকে প্রায় ঢেকে দিয়েছে।

খাড়িটা যেখানে শেষ হয়েছে, সেখান থেকে আধা বর্গমাইলের একটা সমতলভূমির শুরু। ‘সমতলভূমিটা বড় বড় ঘাস ও গাছ-পালায় ঢাকা। তবে খাড়ি যেখানে, সেখান থেকে কয়েক একরের মত জায়গা একটু ভিন্নতর। এখানে বড় বড় ঘাস এবং ছোট ছোট গাছ-গাছড়া রয়েছে। ওভার ভিউ, এমনকি পাশে দাঁড়িয়ে দেখলেও কোন অস্বাভাবিকতাই নজরে পড়ে না। কিন্তু হাত দিয়ে স্পর্শ করলেই বোঝা যায় ঘাস ও গাছ-গাছড়া সবই কৃত্রিম। এটাই সাও তোরাহ দ্বীপে আজর ওয়াইজম্যানের জিন্দানখানা, যাকে দুনিয়ার দোজখ বানিয়ে রাখা হয়েছে কিছু মানুষের জন্যে। ত্রিতল এই জিন্দানখানাটিকে সর্বাধুনিক প্রযুক্তি ব্যবহার করে মোভেবল করা হয়েছে। সুইচ টিপলে তৃতীয় তলাটি মাটির উপরে চলে আসে। কিন্তু তাদের ছাদের উপর তখনও থাকে কৃত্রিম ঘাস ও গাছ-গাছড়ার বাগান। উপর থেকে দেখলে কিছুতেই বোঝা যাবে না যে, এর নিচে একটা স্থাপনা আছে। জিন্দানখানাটির একতলা ও দোতলা সবসময় মাটির নিচে থাকে। সুইচ টিপে আবার তৃতীয় তলাসহ সবটাই মাটির তলায় নিয়ে যাওয়া যায়।

ঠিক রাত ১২টায় কৃত্রিম ঘাসে ঢাকা চত্বরটির পূর্ব প্রান্তের কাছাকাছি জায়গার দুই বর্গগজ গোলাকৃতি একটা অংশ কয়েকফুট নিচে নেমে গেল, তারপর একপাশে অদৃশ্য হয়ে গেল। উন্মুক্ত হয়ে পড়ল একটা চলন্ত সিঁড়ি। সেই চলন্ত সিঁড়ি দিয়ে উঠে এল আজর ওয়াইজম্যানের অপারেশন চীফ বেন্টো বেগিন এবং

এই জিন্দানখানার আজরাঈলরূপী দানিয়েল ডেভিড, হাইম হারজেল এবং আইজ্যাক জোসেফ।

ওরা চারজন সিঁড়ি থেকে মাটিতে উঠে এসেই পুব আকাশের দিকে তাকাতে লাগল।

প্রথমে কথা বলে উঠল বেন্টো বেগিন, 'করভো দ্বীপ অতিক্রমের পরই গোপনীয়তার জন্যে হেলিকপ্টারের আলো নিভিয়ে দেয়া হবে। সুতরাং আলো দেখা যাবে না। শব্দ শোনা যাবার মত কাছাকাছি হেলিকপ্টারটি এখনও আসেনি।'

'তাই হবে। কিন্তু এখনই আমাদের নীল আলো দেখানো উচিত। না হলে হেলিকপ্টার দিক ভুল করতে পারে।' বলল আইজ্যাক জোসেফ।

বেন্টো বেগিন আইজ্যাকের কথায় সায় দিল এবং তার হাতের প্লাষ্টিকের লম্বা দ-টির বটমটা উপরে তুলে পকেট থেকে একটা নীল বাল্ব বের করে তাতে সেট করে দিল। তারপর দ-টির গায়ের একটা সুইচ টিপে দিতেই নীল আলো জ্বলে উঠল। দ-ের মাথায় নীল আলোটি নির্দিষ্ট নিয়মে জ্বলা-নিভা করতে লাগল।

দ-টি উর্ধে তুলে ধরল হাইম হারজেল।

দুমিনিটও যায়নি দক্ষিণ-পূর্ব দিক থেকে হেলিকপ্টারের শব্দ ভেসে এল।

খুশিতে উচ্ছল হয়ে উঠল চারজনই।

পাঁচ মিনিটের মধ্যে হেলিকপ্টারটি এসে ল্যান্ড করল ঘাসের সে চত্বরের উপর।

হেলিকপ্টার থেকে নেমে এল হাস্যোজ্জ্বল মুখে আজর ওয়াইজম্যান। তার হাতে সুন্দর একটি ব্রীফকেস। এসে সে প্রথমেই জড়িয়ে ধরল বেন্টো বেগিনকে। তারপর একে একে অন্য তিনজনকে। বলল, 'এখানে কোন কথা নয়। চল নিচে নেমে যাই।' বলে আজর ওয়াইজম্যান হাঁটতে শুরু করল সুড়ঙ্গের চলন্ত সিঁড়ির দিকে।

সবাই তাকে অনুসরণ করল।

চলন্ত সিঁড়ি তিন তলা হয়ে নেমে এল দুতলায় আজর ওয়াইজম্যানের অফিস কক্ষে।

আজর ওয়াইজম্যান তার রিভলভিং চেয়ারে বসে গা এলিয়ে দিল। সামনে বিরাট ওয়ার্কিং টেবিল।

ওরা চারজন আজর ওয়াইজম্যানের সামনের চেয়ারে জড়োসড়ো হয়ে বসল।

আজর ওয়াইজম্যানের চোখ বন্ধ। চেয়ারে দুলছে তার দেহটা। আনন্দ উপছে পড়ছে তার চোখ-মুখ দিয়ে। এমন আনন্দিত তাকে বহুদিন দেখা যায়নি।

চোখ বন্ধ রেখেই সে এক সময় বলে উঠল, 'আজ বিজয়ের দিন নয় বেন্টো, মুক্তির দিন আমাদের আজ। স্পুটনিকের উদ্ধার করা দলিলের সর্বশেষ যে কপি আমি হাইজ্যাক করে নিয়ে এলাম তা যদি প্রকাশ হয়ে পড়ত, তাহলে পৃথিবী আমাদের কাছে অবাসযোগ্য হয়ে উঠত। টুইনটাওয়ার ধ্বংসের যাবতীয় দায় মাথায় নিয়ে শুধু বিশ্ববাসীর অপরিসীম ঘৃণা নয়, গণহত্যার জন্যে আদালতের কাঠগড়ায় দাঁড়াতে হতো। পৃথিবীর সবার বিশ্বাস আমরা হারাতাম। কোথাও আমাদের স্থান হতো না। ফিরে যেতে হতো আমাদেরকে আবার অতীতের সেই অন্ধকার যুগে।'

থামল আজর ওয়াইজম্যান। আবেগের উত্তাপে তার চোখ-মুখ লাল হয়ে উঠেছিল। ভারী হয়ে উঠেছিল তার কণ্ঠ।

আজর ওয়াইজম্যানের সামনে বসা বেন্টো বেগিনদের চোখে-মুখেও ভয় ও উদ্বেগ। বেন্টো বেগিন বলল, 'টুইন টাওয়ার ধ্বংসের বিশ বছর পর এই দলিল তারা উদ্ধার করল কি করে?'

'ওরা সাতজন সত্যিই অসাধারণ প্রতিভাবান গোয়েন্দা।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

আজর ওয়াইজম্যান কথা শেষ করতেই তার টেলিকম কথা বলে উঠল। গলা সাংবাদিক বুমেদীন বিল্লাহর। বলল সে, 'শুনলাম এক্সিলেন্সি আপনি এসেছেন। আমি উদ্বেগের মধ্যে আছি। ইউরোপ থেকেই আপনার মিশন সম্পর্কে আমাদের জানানো উচিত ছিল আপনিই বলুন এক্সিলেন্সি।'

'আমি বলব না। তুমি এস বিল্লাহ এখনি।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

‘এক মিনিটের মধ্যেই দরজায় নক হলো। আজর ওয়াইজম্যান বলল, ‘এস বিল্লাহ।’

ঘরে ঢুকল বুমেদীন বিল্লাহ।

তাকে দেখেই আজর ওয়াইজম্যান চেয়ার থেকে উঠে দাঁড়াল।

বেন্টো বেগিন এগিয়ে আসছে। আজর ওয়াইজম্যানও তার দিকে এগুলো। আজর ওয়াইজম্যান বুকে জড়িয়ে ধরল বুমেদীন বিল্লাহকে এবং তাকে টেনে নিয়ে চেয়ারে বসাল। বলল বুমেদীন বিল্লাহকে লক্ষ্য করে, ‘তোমাকে অভিনন্দন বিল্লাহ। আমরা তোমার কাছে ঋণী। যেভাবে আছে বলেছিলে, সেভাবেই ব্যাংকের ভল্টে দলিলগুলো পেয়েছি। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ বিল্লাহ।’

বুমেদীন বিল্লাহর চেহারায় শান্ত ভাব। আজর ওয়াইজম্যান যতটা উদ্দীপ্ত, ততটা বুমেদীন বিল্লাহ নয়। বলল সে, ‘ওয়েলকাম এক্সিলেন্সি। কোন অসুবিধা তো হয়নি?’

‘অসুবিধা আর কি? আমরা বিরাট প্রস্তুতি নিয়ে গিয়েছিলাম। সাহায্য নিয়েছিলাম ইউরোপের সেরা ব্যাংক ডাকাত গ্রুপের। ব্যাংকের নৈশ সব প্রহরীকেই আমরা হত্যা করি। পথ রোধকারী ব্যাংকের সব দরজাই আমরা ‘ল্যাসার বীম’ দিয়ে নিঃশব্দে ধ্বংস করে দিয়েছি। লকার খুঁজে পেতেও আমাদের অসুবিধা হয়নি। তোমার দিক-নির্দেশনা ছিল একেবারে নির্ভূল। তোমাকে অসংখ্য ধন্যবাদ।’

আজর ওয়াইজম্যানের মোবাইল বেজে উঠেছিল। কথা শেষ করেই মোবাইলটা হাতে নিল। বলল, ‘গোল্ডা তুমি লাজেন থেকে বলছ? কি, খবর?’

লাজেন সাও তোরাহ থেকে ৭০ কিলোমিটার দক্ষিণের একটা দ্বীপের বন্দর নগরী। ওখানে WFA-এর একটা ষ্টেশন আছে। গোল্ডা মায়ার তার ষ্টেশন চীফ।

আজর ওয়াইজম্যান তার প্রশ্নের উত্তরে ওপারের কথা শুনছে। শুনতে শুনতে তার মুখ অন্ধকার হয়ে উঠল। শোনা শেষ করে আজর ওয়াইজম্যান শুধু বলল, ‘না গোল্ডা, তোমার হারতা যেতে হবে। আমি বিষয়টা নিয়ে ভাবছি।’

মোবাইল অফ করে টেবিলে রেখে দিয়ে বেন্টো বেগিনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'দেখছি, তেরসিয়েরা দ্বীপে আমাদের যে বিপর্যয় ঘটেছিল তার চেয়েও বড় বিপর্যয় ঘটল হারতায়। ইমানুয়েল, কেলভিন, সুলিভান ও ডেভিড ডেনিমরাসহ প্রায় অর্ধশত আমাদের লোক নিহত হওয়া ও ঘাঁটিগুলো ধ্বংস হবার পর অবশিষ্ট ছিল শুধু সান্তাসিমা উপত্যকার সাবমেরিন ঘাঁটিটা। সেটারও ভবিষ্যত অনিশ্চিত বেন্টো।' শুকনো কণ্ঠ আজর ওয়াইজম্যানের।

'ঘটনা কি এক্সিলেন্সি?' বলল বেন্টো বেগিন। তার কণ্ঠে উদ্বেগ।

'গোল্ডা জানাল, সান্তাসিমা উপত্যকার সাবমেরিন ঘাঁটিতে আহমদ মুসা ও তার সহকারী প্রবেশ করে ও বন্দী হয়। সান্তাসিমা থেকে সাবমেরিনে টেলিফোন করা হয় বন্দীকে ওখানে থেকে নিয়ে আসার জন্যে। মিনি-সাবটি তখন ছিল লাজেনে। গোল্ডা তখনই সেখানকার অপারেশন কমান্ডারের নেতৃত্বে ১২ জন লোক দিয়ে মিনি-সাব সান্তাসিমায় পাঠিয়ে দেয়। মিনি-সাব সান্তাসিমা ঘাঁটিতে নোঙর করা পর্যন্ত খবর পেয়েছে গোল্ডা। তারপর ছয়ঘণ্টা পার হলো কোন খবর নেই। না রেসপনস করছে সাবমেরিন থেকে, না কথা বলছে ঘাঁটি থেকে কেউ।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

বেন্টোও তার সাথী তিনজনের মুখও অন্ধকার হয়ে গেল উদ্বেগে। আর বুমেদীন বিল্লাহর চোখে-মুখে দপ করে এক ঝলক আলো জ্বলে উঠেই আবার নিভে গেল।

'কি ঘটতে পারে এক্সিলেন্সি? আহমদ মুসা কি.......।' কথা শেষ না করেই থেমে গেল বেন্টো বেগিন।

'সব কিছুই ঘটতে পারে সেখানে? আমাদের সান্তাসিমা ঘাঁটির লোকরা আহমদ মুসাকে ধরে রাখার সাধ্য রাখে না। আমি ভাবছি, সাবমেরিনটাও বোধ হয় আমাদের শেষ হয়ে গেল।' আজর ওয়াইজম্যান বলল।

'আমরা চেষ্টার ক্রুটি করিনি এক্সিলেন্সি। কিন্তু আহমদ মুসা আপদটাকে বাগে আনা গেল না। কেউ তার সামনে দাঁড়াতে পারছে না।' বেন্টো বেগিন বললল।

'আমাদের সর্বশ্রেষ্ঠ যোদ্ধা ও গোয়েন্দা প্রতিভা জেনারেল শ্যারন যার কাছে বার-বার পরাজিত হয়েছেন, যার ফলে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র আমাদের হাত থেকে বেরিয়ে গেল, সেই আহমদ মুসাকে তোমরা আটকাবে কি করে! আমাদের চরম দুর্ভাগ্য যে, তার আজোরসে আসা আমরা আটকাতে পারিনি। এখন আমার মনে হচ্ছে, সাও তোরাহ নিয়েই এখন আমাদের ভাবতে হবে।' বলেই আজর ওয়াইজম্যান তাকাল বুমেদীন বিল্লাহর দিকে। বলল, 'বিল্লাহ, কিছু বলবে তুমি?'

'এক্সিলেন্সি আমাকে পাঠিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন। আমি অবিলম্বে চলে যেতে চাই'। বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

আজর ওয়াইজম্যান মুখটা নিচু করল। পরক্ষণেই মুখ তুলে একটু হেসে বলল, 'সব মনে আছে বিল্লাহ। কিন্তু মিনি-সাবটা হঠাৎ নিখোঁজ হলো। আমি দেখছি। প্রথম সুযোগেই তোমাকে পাঠাবার ব্যবস্থা করব।'

'আরেকটা কথা এক্সিলেন্সি, তাদের দলিলগুলো যে এখন আর তাদের হাতে নেই, আপনি উদ্ধার করেছেন, এ খবরটা আমি কামাল সুলাইমানদের একটু দিতে চাই। তাদের বুঝাতে চাই যে, তাদের কানাকাড়ি মূল্যও এখন নেই।'

হাসল আজর ওয়াইজম্যান। বলল, 'হ্যাঁ এ মজাটা তুমি করতে পার। তার সাথে তাদের বলে দিও যে এক বিলিয়ন ডলারের চেক তোমার একাউন্টে জমা হয়ে গেছে।'

বুমেদীন বিল্লাহ হাসল। বলল, 'বেচারাদের কাটা ঘায়ে একেবারে নুনের ছিটা পড়বে।'

'ঠিক আছে বিল্লাহ। তুমি লাউঞ্জে গিয়ে বস। বেন্টো তোমাকে কামাল সুলাইমানদের কাছে নিয়ে যাবে।' বলল আজর ওয়াইজম্যান।

'ধন্যবাদ এক্সিলেন্সি।' বলে উঠে দাঁড়াল বুমেদীন বিল্লাহ। বেরিয়ে এল ঘর থেকে।

বাইরের ঘরটায় আজর ওয়াইজম্যানের পি.এ বসেন। বুমেদীন বিল্লাহ দেখল, পি.এ-এর ইন্টারকমটা খোলা। সে এই ইন্টারকম থেকেই আজর ওয়াইজম্যানের সাথে কথা বলেছিল। কিন্তু ইন্টারকম অফ করতে ভুলে গিয়েছিল। ইন্টারকমটা অফ করে দেবার জন্যে এগুলো টেবিলের দিকে। এই সময়

ইন্টারকম কথা বলে উঠল। গলা বেন্টো বেগিনের। সে বলল, ‘এক্সিলেন্সি এখন আমাদের কি করণীয়?’

বুমেদীন বিল্লাহ নিজের মনেই হাসল। তাহলে আজর ওয়াইজম্যানও ইন্টারকম অফ করে দেয়নি।

বুমেদীন বিল্লাহ ইন্টারকম অফ করার জন্য হাত বাড়িয়েও হাতটা টেনে নিল। তার কৌতুহল হলো, আজর ওয়াইজম্যান কি উত্তর দেয় দেখা যাক।

গলা শোনা গেল আজর ওয়াইজম্যানের। তিনি বলছেন, ‘সান্তাসিমার ঘটনা কোন দিকে গড়াচ্ছে আমি জানি না। মিনি-সাব যদি আহমদ মুসার হাতে যায়, তাহলে বিপজ্জনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। স্পুটনিকের দলিলগুলো পাওয়ার পর আমাদের বর্তমান প্রধান লক্ষ্যটা অর্জন হয়েছে। আপাতত সাও তোরাহতে আমাদের কাজ নেই।’

‘বন্দীদের স্থানান্তর?’ বলল বেন্টো বেগিন।

‘বন্দীরা যেখানে আছে, সেখানেই তাদের কবর হবে। আমরা যাবার সময় গ্যাস সিলিন্ডারের লকটা আনলক করে দিয়ে যাবো। আমরা দ্বীপটা ত্যাগ করার আগেই ওরা সবাই লাশ হয়ে যাবে।’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

‘এক্সিলেন্সি আমরা কি আজই দ্বীপ ছাড়ছি?’ বলল বেন্টো বেগিন।

‘হ্যাঁ, সূর্যোদয়ের আগেই।’ আজর ওয়াইজম্যান বলল।

আজর ওয়াইজম্যানের পরিকল্পনা শুনে উদ্বেগ-আতংকে পাংশু হয়ে উঠেছিল বুমেদীন বিল্লাহর মুখ। এমন কিছু ঘটবে বুমেদীন বিল্লাহ জানত, কিন্তু সেটা এত তাড়াতাড়ি ঘটবে এটা ভাবতে পারেনি। কোন প্রস্তুতিরও সময় তার নেই। তাহলে কি আজর ওয়াইজম্যানের পরিকল্পনাই সফল হবে!

পরক্ষণেই বুমেদীন বিল্লাহর মুখ কঠোর হয়ে উঠল। কিছু করতে হবে। কিন্তু কি করবে? টুইন টাওয়ারের দলিল আজর ওয়াইজম্যানের হস্তগত হওয়ার খবর কামাল সুলাইমানদের দেয়ার অজুহাতে সে তাদের কাছে এই সংকেত পৌছাতে চেয়েছিল যে, মুক্তির একটা উপায়ের লক্ষ্যে সে কাজ করছে, তারা যেন প্রস্তুত থাকে। কিন্তু এই কাজ করার আর সময় কোথায়? কিন্তু তবু তাকে কিছু করতে হবে।

উঠে দাঁড়াল বুমেদীন বিল্লাহ। তার আগে সে ইন্টারকম বন্ধ করে দিয়েছে।

বুমেদীন বিল্লাহ বেরিয়ে এসে ড্রইং রুমে বসল। চিন্তা তখন রকেটের গতিতে ঘুরপাক খাচ্ছে তার মাথায়। এই সময় হঠাৎ তার মনে পড়ল সেদিন সে বেন্টো বেগিনের ষ্টোর থেকে সিগারেটের লাইটার সাইজের একটা ল্যাসার কাটার চুরি করেছে। সেটা তার এখুনি দরকার।

ভাবনার সাথে সাথেই বুমেদীন বিল্লাহ ছুটল তার ঘরের দিকে। ঘরে গিয়ে সে লুকিয়ে রাখা ল্যাসার কাটারটা পকেটে পুরল। টেবিলে বসে দ্রুত একটা চিরকুটে লিখল, 'আহমদ মুসা সম্ভবত হারতা দ্বীপ থেকে এখন সাও তোরাহের পথে। কিন্তু অপেক্ষার সময় নেই। সাও তোরাহতে আগামীকালের সূর্যোদয় ঘটবে না। দ্রুত প্রস্তুত হোন।' লেখা শেষে চিরকুটটি মুড়ে ল্যাসার কাটারের প্যাকেটে ঢুকাল।

তারপর দৌড়ে ফিরে এল আজর ওয়াইজম্যানের ড্রইং রুমে। সে সময় বেন্টো বেগিনও ড্রইংরুমে প্রবেশ করল।

বুমেদীন বিল্লাহকে দেখেই বেন্টো বেগিন বলে উঠল, 'চলুন কামাল সুলাইমানদের কাছে। হাতে সময় খুব কম।'

'সময় কম কেন?' কৃত্রিম বিস্ময়ের সুরে বলে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ।

'জিনিসপত্র প্যাক করতে নামতে হবে এখনি। মূল্যবান ইলেক্ট্রনিক যন্ত্রপাতি তো ফেলে যাওয়া যাবে না। অবশ্য ওদের বলে দিয়েছি, ওরা সবকিছু গুটিয়ে নেয়া ও প্যাক করা শুরু করে দিয়েছে। চলুন।' বলে হাঁটা শুরু করল তিন তলায় ওঠার সিঁড়ির দিকে বেন্টো বেগিন।

'বুঝলাম না মি. বেগিন। কোথাও যাচ্ছেন নাকি? হাঁটতে হাঁটতে বলল বুমেদীন বিল্লাহ ঠোঁটে কৃত্রিম হাসি টেনে।

'সবই দেখতে পাবেন। আপনিও যাচ্ছেন। কয়েক ঘণ্টার মধ্যেই আমরা দ্বীপ ছাড়ছি।' বলল বেন্টো বেগিন।

'দলিলগুলো হস্তগত হয়েছে। আসল কাজ হয়েছে। আপাতত দ্বীপে কোন কাজ নেই।' একটু থেমে পুনরায় বলে উঠল বেন্টো বেগিন।

কৃত্রিম আনন্দ প্রকাশ করে বুমেদীন বিল্লাহ বলল, ‘তাহলে আজই যাত্রা করতে পারছি! অনেক ধন্যবাদ এ সিদ্ধান্তের জন্যে।’

তৃতীয় তলায় উঠে এল তারা।

তৃতীয় তলায় দুটি সিঁড়ি ঘর, একটা বিশাল ষ্টোর রুম বাদে গোটাটাই বন্দীদের ব্যারাক। দুটি সিঁড়ির একটি চলন্ত। চলন্ত সিঁড়িটি একতলার ল্যান্ডিং রুম, দুতলার আজর ওয়াইজম্যানের অফিস হয়ে তিন তলা দিয়ে ছাদে চলে গেছে। দ্বিতীয় সিঁড়িটি একতলার রক্ষী ব্যারাক থেকে দুতলার প্রশাসনিক অফিস হয়ে তিনতলায় চলে গেছে। তিনতলার এই সিঁড়ি ঘরেই বন্দী ব্যারাকে প্রবেশের বিশাল সিংহ দরজা। লোহার তৈরী।

বেন্টো বেগিন তালা খুলে বন্দীখানায় প্রবেশ করল।

বেন্টোর পেছনে পেছনে প্রবেশ করল বুমেদীন বিল্লাহ।

তিন তলার ছাদ প্রায় পনের ফিট উঁচু। কিন্তু বন্দীখানার ছাদ ৭ ফুটের বেশি নয়। এ ছাদের উপরে ৮ ফুট উঁচু বন্দীখানা আকারের বিশাল হলঘর নানা যন্ত্রপাতিতে ঠাসা। যন্ত্রপাতি অনেকগুলোর সাথেই বন্দীখানার সংযোগ আছে।

বন্দীখানার বন্দীদের সেল। সেল না বলে ওগুলোকে খাঁচা বলাই ভাল। তবে পাখির খাঁচার মত নয়। পাখির খাঁচা পাখির তুলনায় অনেকগুণ বড় হয়। কিন্তু বন্দীদের খাঁচা বন্দীদের চেয়ে ছোট।

বেন্টো বেগিন এগুলো কামাল সুলাইমানের খাঁচার দিকে।

কামাল সুলাইমানসহ সাত গোয়েন্দার খাঁচা একই সারিতে পরপর। কামাল সুলাইমানের পর ওসমান আব্দুল হামিদ। তারপর অন্যান্যরা।

বেন্টো বেগিন গিয়ে দাঁড়াল কামাল সুলাইমানের খাঁচার কাছাকাছি। বলল, ‘মি. বিল্লাহ যা বলার, তাড়াতাড়ি তা সেরে ফেল।’

বুমেদীন বিল্লাহ বেন্টো বেগিনকে ছাড়িয়ে কামাল সুলাইমানের খাঁচার একদম পাশে গিয়ে দাঁড়াল।

‘মি. বুমেদীন বিল্লাহ ইতিহাস রচনার কতদূর এগুলেন?’ খাঁচার ভেতরে জড়সড় হয়ে বসে থাকা কামাল সুলাইমান বলল বুমেদীন বিল্লাহকে। তার চোখে-মুখে তীব্র ঘৃণা ও বিদ্রুপ।

‘ইতিহাস সৃষ্টির শেষ অধ্যায়ে পৌছেছি। ব্যাংকের ভল্ট থেকে স্পুটনিকের টুইনটাওয়ার সংক্রান্ত সব দলিল-দস্তাবেজ আজর ওয়াইজম্যান আজ নিয়ে এসেছেন।’ বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

‘জাতির পরাজয়ের মধ্য দিয়ে আপনার বিশ্বাসঘাতকতার জয় হলো, এই হলো আপনার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়।’ কামাল সুলাইমান বলল।

‘হ্যাঁ মি. কামাল সুলাইমান, এটা আমার ইতিহাসের শেষ অধ্যায়, কিন্তু শেষ কথা নয়।’ বলে বুমেদীন বিল্লাহ বেন্টো বেগিনের দিকে ফিরে বলল, ‘চলুন, মি. ওসমান আব্দুল হামিদকে এবার সুখবরটা দেই।’

‘আসুন।’ বলে বেন্টো বেগিন ঘুরে দাঁড়িয়ে ওসমান আব্দুল হামিদের খাঁচার দিকে হাঁটতে লাগল।

এই সুযোগেরই অপেক্ষা করছিল বুমেদীন বিল্লাহ। সে দ্রুত পকেট থেকে ল্যাসার বীমের বক্সটি বের করে কামাল সুলাইমানের খাঁচায় ঢুকিয়ে দিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

কয়েক ধাপ এগিয়েই বুমেদীন বিল্লাহ বেন্টো বেগিনকে লক্ষ্য করে বলল, ‘একে একে বলা আর নয়। দাঁড়ান। আমার গলায় যথেষ্ট জোর আছে। একসঙ্গে সবাইকে জানিয়ে দেই। ’

বলে বুমেদীন বিল্লাহ দৌড়ে গিয়ে খাঁচাগুলোর মাঝ বরাবর এক জায়গায় গিয়ে চিৎকার করে উঠল, ‘সাত গোয়েন্দা শুনুন। টুইনটাওয়ার সম্পর্কিত আপনাদের সব দলিল এখন আজর ওয়াইজম্যানের হাতে। ব্যাংকের ভল্ট থেকে আজ তিনি এগুলো নিয়ে এসেছেন। আপনারা এখন এক বিগ জিরো। আজ রাতেই এক ইতিহাসের সমাপ্তি ঘটছে। নতুন ইতিহাস পর্যন্ত গুডবাই।’

বুমেদীন বিল্লাহ ও বেন্টো বেগিন বেরিয়ে এল বন্দীখানা থেকে।

ফিরে এল বুমেদীন বিল্লাহ তার ঘরে। দরজা লাগিয়ে দিয়ে সে আসন্ন পরিস্থিতির জন্যে নিজেকে প্রস্তুত করার কাজ শুরু করে দিল। খাটের ফোম তুলে ফেলে তার তলা থেকে কয়দিন ধরে আর্মস ষ্টোর থেকে চুরি করা ডজন দুয়েক রিভলবার বের করল। হ্যান্ড ব্যাগে পুরল সে রিভলবারগুলো।

সব ঠিকঠাক করে বিছানায় বসল সে। হাতঘড়ির দিকে তাকাল। দেখল রাত পৌনে একটা। রাত একটার দিকে বেরুবে সে। প্রধান কাজ হবে অস্ত্রগুলো কামাল সুলাইমানদের হাতে পৌছানো।

দেহটা একটু বিছানায় রাখল বুমেদীন বিল্লাহ। তার দরজায় নক হলো এসময়। বুমেদীন বিল্লাহ তাড়াতাড়ি উঠে হ্যান্ড ব্যাগটা আড়ালে সরিয়ে রেখে দরজা খুলে দিল। দরজা খুলতেই দরজার ফাঁকে আটকানো একটা কাগজ নিচে পড়ে গেল। কিন্তু দরজার বাইরে কাউকেই দেখল না।

বুমেদীন বিল্লাহ তাড়াতাড়ি কাগজটা তুলে নিয়ে দরজা লাগিয়ে দিল।

দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়েই কাগজটার ভাঁজ খুলল। একটা চিঠি। কয়েক লাইন লেখা। পড়ল সে, 'প্রিয় সাংবাদিক, আপনি যথেষ্ট বুদ্ধিমান। সবই বুঝার কথা। তবু বলছি, WFA সম্পর্কে বা তার লোকদের পরিচয় সম্পর্কে সামান্য কিছু জানে এমন বাইরের কোন ব্যক্তিকেই বাঁচতে দেয়া হয় না। আপনার সাবধান হওয়ার সময় চলে যাচ্ছে।'

চিঠিটা পড়ে ঠোঁটে একটা হাসি ফুটে উঠল বুমেদীন বিল্লাহর। স্বগতকণ্ঠে অস্ফুট স্বরে বলল, 'তুমি কে জানি না বন্ধু। আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন। তুমি জেনে রাখ বন্ধু, যে মুহূর্তে আমি আজর ওয়াইজম্যানের প্রস্তাবে রাজী হয়েছি, সে মুহূর্ত থেকেই আমি জানি তার কাজ শেষ হবার পর আজর ওয়াইজম্যান আমাকে বাঁচিয়ে রাখবে না। এমনিতেই তো তারা আমাকে মারতো, তাই আমি বাঁচার ও বাঁচাবার চেষ্টা করে মরতে চেয়েছি।'

আবার ঘড়ির দিকে তাকাল বুমেদীন বিল্লাহ। দেখল একটা বাজতে দশ মিনিট বাকি।

বিছানায় আবার গা এলিয়ে দিল বুমেদীন বিল্লাহ।

বুমেদীন বিল্লাহ ও বেন্টো বেগিন বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে যেতেই কামাল সুলাইমান ছোট ল্যাসার বক্সটি খুলে ফেলল। খুলতেই বেরিয়ে পড়ল

চিঠিটা। সেই সাথে নজর পড়ল লাইটার সাইজের ল্যাসার কাটারের উপর। দেখেই বুঝতে পারল ওটা ল্যাসার কাটার। চোখ দুটি তার উজ্জ্বল হয়ে উঠল আনন্দে। তাড়াতাড়ি খুলল চিঠিটা। পড়ল। চিঠিটা পড়ে আনন্দে নেচে উঠল তার মন। আহমদ মুসা সাও তোরাহ আসছে জেনে। কিন্তু চিঠির পরবর্তী কয়েকটি লাইন তাকে উদ্বিগ্ন করে তুলল। আগামীকাল সাও তোরাহতে সূর্যোদয় ঘটবে না-এর অর্থ তার কাছে পরিষ্কার যে, আজকের রাতই তাদের শেষ রাত। সূর্যোদয়ের আগেই তাদের হত্যা করা হবে। বাঁচার জন্যে চেষ্টা করার সময় খুব কম। দ্রুত তাদের এজন্যে প্রস্তুত হতে হবে। বুমেদীন বিল্লাহ তাদেরকে প্রস্তুত হবার জন্যেই ল্যাসার কাটার সরবরাহ করেছে। বিস্মিত হলো সে, টুইনটাওয়ার সংক্রান্ত দলিল আজর ওয়াইজম্যানদের হাতে তুলে দেয়ার মত সর্বনাশ করে আবার আমাদের বাঁচাবার চেষ্টা কেন? দলিলগুলো তার কাছে গুরুত্বপূর্ণ নয়। যাক। আল্লাহ যে সুযোগ দিয়েছেন তার সদ্ব্যবহার করা প্রয়োজন।

কামাল সুলাইমান তাকাল ওসমান আবদুল হামিদের দিকে। ওসমান আবদুল হামিদ কৌতুহলী চোখে তাকিয়েছিল কামাল সুলাইমানের দিকে। বুমেদীন বিল্লাহর ল্যাসার বক্সটি কামাল সুলাইমানের খাঁচায় দেবার সময় সে দেখেছিল।

কামাল সুলাইমান চিঠিটা ও ল্যাসার কাটার ওসমান আবদুল হামিদসহ সবাইকে দেখিয়ে ইংগিতে বলল, অবিলম্বে তাদের মুক্ত হতে হবে।

কামাল সুলাইমান কাজে লেগে গেল। হাত ও পায়ের চেইন ও বেড়ি কাটা কয়েক সেকেন্ডে হয়ে গেল। তারপর খাঁচার লক কেটে মুহূর্তেই খাঁচা থেকে বেরিয়ে এল।

খাঁচা থেকে বেরিয়ে কামাল সুলাইমান ল্যাসার কাটার ওসমান আবদুল হামিদকে দিয়ে এল। ওসমান আবদুল হামিদ মুক্ত হয়ে ল্যাসার কাটারটা দিয়ে এল তার পাশের আবদুল্লাহ আল ফারুককে।

এইভাবে দেড় ঘণ্টার মধ্যে ২০৭ জন বন্দীর সবাই মুক্ত হয়ে গেল।

সবাই মুক্ত হবার পর কামাল সুলাইমানরা সাতজন শেখুল ইসলাম আহমদ মুহাম্মাদকে সাথে নিয়ে পরামর্শ করল। কামাল সুলাইমান বলল,

'আমাদের বন্দীখানার ভেতরের সব দৃশ্য নিশ্চয় টিভি ক্যামেরার মাধ্যমে মনিটর করা হচ্ছে, তাই যে কোন সময় আমাদের উপর আক্রমণ হতে পারে। ওদিকে আহমদ মুসা সাও তোরাহতে কখন পৌছবে আমরা জানি না। এই অবস্থায় আমাদের করণীয় কি?'

কামাল সুলাইমানের সাথের ছয়জন একই ধরনের মত প্রকাশ করল যে, 'ওরা আক্রমণে আসার আগেই আমাদেরই আক্রমণে যাওয়া দরকার। যুদ্ধ করার মধ্যেই আমাদের বাঁচার সম্ভাবনা আছে। মরতে হলে যুদ্ধ করেই আমরা মরব।' শেখুল ইসলামও অনুরূপ মত প্রকাশ করল।

কামাল সুলাইমান অবশিষ্ট সবাইকে ডাকল। পরিস্থিতি বুঝতেই সবাই বলে উঠল, 'মরতে হলে যুদ্ধ করে আমরা মরব।'

অস্ত্র হিসেবে সবাই চেনগুলোকে কুড়িয়ে নিল।

কামাল সুলাইমানদের সাত জনের নেতৃত্বে ২০৭ জনকে ৭টি গ্রুপে ভাগ করা হলো।

ঠিক রাত দুটার সময় কামাল সুলাইমানের নেতৃত্বে প্রথম গ্রুপটি অগ্রসর হলো বন্দীখানার দরজার দিকে। তাদের পেছনে অন্য গ্রুপগুলো সারিবদ্ধভাবে অগ্রসর হলো দরজার দিকে।

কামাল সুলাইমান ল্যাসার বীম দিয়ে দরজার লক কেটে ফেলল।

কাটা শেষ ঠিক এই সময় দরজায় নক হলো। পরপর তিনবার নক করার শব্দ অন্যেরাও শুনতে পেয়েছে। কামাল সুলাইমানের ছয় বন্ধু এগিয়ে এল তার কাছে। ওসমান আবদুল হামিদ বলল ফিসফিসে কণ্ঠে, আমার মনে হয় আজর ওয়াইজম্যানের লোক হলে দরজায় নক না করে দরজা খুলে ফেলত। কারণ তাদের কাছে চাবি আছে। আমাদের কোন মিত্র মানে বুমেদীন বিল্লাহই নক করতে পারে। লেসার কাটার ব্যবহার করে আমরা মুক্ত হবো এবং আমরা দরজা খুলতে পারব, এটা শুধু সেই জানে। আর দেখ ঠিক সময়েই সে নক করেছে।'

ওসমান আবদুল হামিদের যুক্তি সবাই সমর্থন করল।

ঠিক এই সময় আবার সেই একই নিয়মে নক হলো দরজায়। পরপর তিনবার।

এবার কামাল সুলাইমানও সেই একই নিয়মে নক করল দরজায়। সংগে সংগে বাইরে থেকেও সে নিয়মে নক হলো।

কামাল সুলাইমান দরজা খুলে ফেলল।

দরজার বাইরে একটা ব্যাগ হাতে দাঁড়িয়ে বুমেদীন বিল্লাহ।

দরজা খুলে যেতেই সালাম দিল বুমেদীন বিল্লাহ কামাল সুলাইমানদের লক্ষ্য করে।

সালাম দিয়েই উত্তরের অপেক্ষা না করে কামাল সুলাইমানদের দিকে দুধাপ এগিয়ে ব্যাগটা তার দিকে তুলে ধরে বলল, 'এতে ২৪টি রিভলবার আছে।'

কামাল সুলাইমান ব্যগটি নিয়ে তাড়াতাড়ি ভেতরে ঢুকে গেল। তাড়াতাড়ি রিভলবারগুলো বণ্টন করে ফেলল।

তারপর দরজার বাইরে এসে বলল, 'মি. বিল্লাহ আমরা প্রস্তুত।'

এ সময় প্রচ- গুলী-গোলার শব্দ ভেসে এল।

উৎকর্ণ হলো বুমেদীন বিল্লাহ। বলল, 'এই শব্দ নিচ তলা থেকে আসছে। কি ব্যাপার আমি একটু শুনে আসি। আপনারা এখানেই দাঁড়ান।' উদ্বিগ্ন কণ্ঠ বুমেদীন বিল্লাহর।

বুমেদীন বিল্লাহ বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। ছুটল সে দোতলার দিকে।

দুতলার সিড়ির গোড়ায় সে দেখা পেল বেন্টো বেগিনের। বেগিনকে দেখেই বুমেদীন বিল্লাহ বলে উঠল, 'কি ঘটেছে নিচ তলায়? গোলাগুলী কেন?'

বুমেদীন বিল্লাহর প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে বেগিন বলে উঠল, 'আমি তোমাকে খুঁজছি। চল এক্সিলেন্সি তোমাকে ডেকেছেন।'

'কোথায় তিনি?' বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

'তিন তলার ছাদে, হেলিকপ্টারে। তুমি তাড়াতাড়ি ফিরতে চাচ্ছ তাই তোমাকে নিয়ে যাবেন তিনি।'

বলেই সে তার পেছনে দাঁড়ানো হাইম হারজেলকে বলল, 'তুমি বুমেদীন বিল্লাহকে এক্সিলেন্সির কাছে নিয়ে যাও। আমি আসছি।'

'আপনি কোথায় যাচ্ছেন?' বুমেদীন বিল্লাহ জিজ্ঞাসা করল বেগিনকে।

‘আমি তিন তলা থেকে আসছি। তুমি যাও।’ বলে সে সিঁড়ি ভেঙে উঠতে লাগল তিন তলার দিকে।

বুমেদীন বিল্লাহ হাইম হারজেলের পেছন পেছন চলন্ত সিঁড়ির দিকে চলল।

সিঁড়ির কাছাকাছি গিয়ে বুমেদীন বিল্লাহ থমকে দাঁড়াল। বলল হাইম হারজেলকে লক্ষ্য করে, ‘শুনুন, আমার একটু কাজ আছে। আমি আসছি।’

বাঘের মত ঘুরে দাঁড়াল হাইম হারজেল। তার হাতে রিভলবার। বলল, ‘মি. বিল্লাহ পেছন দিকে এক পা গেলে গুলী করব। নষ্ট করার মত এক সেকেন্ডও সময় নেই। আসুন।’

হাইম হারজেলের এই ব্যবহারে প্রথমে বিস্মিত হলেও বুমেদীন বিল্লাহ শীঘ্রই বুঝল যে সে কার্যত বন্দী এবং তাকে কোথায় নিয়ে যাচ্ছে তাও সে বুঝল।

বুমেদীন বিল্লাহ সামনে পা বাড়াল। হাইম হারজেল ফিরে দাঁড়িয়ে হাঁটতে শুরু করল।

শক্ত হয়ে উঠেছে বুমেদীন বিল্লাহর মুখ। পকেট থেকে রিভলবার বের করে গুলী করল হাইম হারজেলকে। মনে মনে বলল, এক তলায় কি ঘটছে তা এরা লুকাচ্ছে। ধরা পড়া থেকে রক্ষার জন্যে নিজেদেরকে নিজেরাই হত্যা করছে কি? বেন্টো বেগিন কেন তিন তলায় গেল তাও সে বুঝেছে। জীবনঘাতি গ্যাস ছেড়ে সে হত্যা করতে গেছে বন্দীদের। অন্যদিকে আজর ওয়াইজম্যান নিশ্চয় পালাচ্ছে। বুমেদীন বিল্লাহকে কেন হেলিকপ্টারে তুলতে চায় তাও তার অজানা নয়।

মাথায় গুলী খেয়ে হাইম হারজেল সিঁড়ির গোড়ায় আছড়ে পড়েছে।

বুমেদীন বিল্লাহ ছুটল তিন তলায় বন্দীখানায় উঠার সিঁড়ির দিকে।

বুমেদীন বিল্লাহ যখন তিন তলায় উঠার সিঁড়ির কাছাকাছি, তখন সে দেখল বেন্টো বেগিন তিন তলার সিঁড়ি থেকে বেড়ালের মত নিশব্দে নেমে এগুচ্ছে তার আর্মস রুমের দিকে। তার কানে মোবাইল ধরা, কথা বলছে সে। রিভলবার বাগিয়ে বুমেদীন বিল্লাহ এগুলো তার পেছনে। শুনতে লাগল সে বেগিনের কথা, ‘এক্সিলেন্সি স্যরি, আমি তিন তলার গ্যাস ট্যাংকের কাছে যেতে না পেরে যাচ্ছি

আর্মস ষ্টোরে, সেখানেও পটাসিয়াম সাইনায়েড গ্যাসের একটা ট্যাংক আছে। স্যার ওটার মুখটা খুলে দিয়েই আমি আসছি।'

একটু থেমে ওপারের কথা শুনেই বেগিন আবার বলে উঠল, 'ওরা কিভাবে বন্দীদশা থেকে মুক্ত হলো, কিভাবে বন্দীখানা থেকে বেরিয়ে এল কিছুই বুঝে আসছে না এক্সিলেন্সি।'

আবার নিরবতা। ওপারের কথার উত্তরেই সে আবার বলে উঠল, 'বুমেদীন বিল্লাহকে হাইম হারজেলের সাথে আপনার কাছে পাঠিয়েছি। বুঝতে পারছি না কেন এতক্ষণ পৌছল না? অবশ্য একটা গুলীর আওয়ার ওদিক থেকে পেয়েছি এক্সিলেন্সি।'

পুনরায় মুহূর্তের জন্যে একটু নিরব হয়েই আবার বলে উঠল, 'আপনি ভাববেন না এক্সিলেন্সি, সাইনায়েড গ্যাসের প্রসারণ গতিটা প্রথম দুতিন মিনিট কম থাকলেও পরে অত্যন্ত দ্রুত গতিতে ছড়িয়ে পড়ে থাকে। গোটা বিল্ডিং কভার করতে ১ মিনিটও লাগবে না। এ বিল্ডিং এর কোন মানুষ কোন পোকামাকড়ও বাঁচবে না এক্সিলেন্সি। আপনি নিশ্চিত থাকেন।'

মোবাইল তার নেমে এল কান থেকে। মোবাইল পকেটে রেখে আর্মস রুমের দরজার দিকে সে হাত বাড়াল। দরজায় ডিজিটাল লক। লকের ডিজিটাল বোর্ডের অংকগুলোর উপর দ্রুত তার তর্জনীর টোকা পড়তে লাগল।

পরবর্তী মুহূর্তেই তার হাতটা নেমে এল দরজার হাতলে।

লক খুলে দরজা এখন সে খুলছে। আতংকিত কম্পিত বুমেদীন বিল্লাহ আর সময় দিল না তাকে। তার তর্জনী চেপে ধরল তার রিভলবারের ট্রিগারে।

সেই একইভাবে মাথায় গুলী খেল বেন্টো বেগিন। দরজার উপরেই পড়ে গেল তার লাশ।

পাশেই সিঁড়িতে পায়ের শব্দ শুনে চোখের পলকে রিভলবার ঘুরিয়ে নিল। কিন্তু ট্রিগার টেপার আগেই দেখল কামাল সুলাইমানরা কয়েক জন রিভলবার হাতে নেমে আসছে।

বুমেদীন বিল্লাহ কিছু বলার আগেই কামাল সুলাইমান বলে উঠল, 'ধন্যবাদ মি. বিল্লাহ, এই বেগিন তিন তলায় গিয়েছিল। আমাদের টের পেয়েই

ফিরে এসেছে। আমরা ঠিক করলাম সে যখন আমাদের টের পেয়েছে এখন এর পিছু নেয়া দরকার।' কথাটুকু শেষ করেই আবার উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠল, 'নিচে কি ঘটেছে? কিছু জানতে পারলেন?'

'জানতে এসে প্রায় বন্দী হয়েছিলাম। আমাকে জোর করে একজন নিয়ে যাচ্ছিল তিন তলার ছাদে হেলিকপ্টারে তোলার জন্য আজর ওয়াইজম্যানের কাছে। আমি তাকে হত্যা করে এদিকে এসেই দেখতে পেলাম বেন্টো বেগিনকে। সে যাচ্ছিল আর্মস রুমে সাইনায়েড গ্যাসের ট্যাংক খুলে দিতে এ বিল্ডিং-এর সবাইকে সেকেন্ডের মধ্যে মেরে ফেলার জন্যে। আল্লাহ রক্ষা করেছেন'। বলল বুমেদীন বিল্লাহ।

কথা শেষ করে একটা দম নিয়েই আবার বলে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ, 'আজর ওয়াইজম্যানের কমব্যাট বাহিনীর ব্যারাক নিচ তলায়। ওদের সংখ্যা প্রায় পঞ্চাশের মত। আমি বুঝতে পারছি না ওদের কি হলো? উপরেও কেউ আসছে না।'

'বুঝা যাচ্ছে দুপক্ষের মধ্যে গোলাগুলী হচ্ছে। আহমদ মুসারা এসে পৌছল কিনা! চলুন ওদিকে যাই।' বলল কামাল সুলাইমান।

সম্বিত ফিরে পেল যেন বুমেদীন বিল্লাহ। উৎসাহের সাথে বলল, 'ঠিক, হতে পারে। বোধ হয় এই কারণেই আজর ওয়াইজম্যান পালাচ্ছে। আর নিচে কি হচ্ছে এ ব্যাপারটা চেপে যাচ্ছে।' এক তলার সিঁড়ির দিকে ছুটতে ছুটতেই কথাগুলো বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

বুমেদীন বিল্লাহর সাথে ছুটছিল কামাল সুলাইমানরা সবাই।

'সবাই শুয়ে পড়–ন, আজর ওয়াইজম্যানের সৈন্যরা ওরা...........।' সিঁিড়র ল্যান্ডিং-এর উপরে শুয়ে পড়তে পড়তে চিৎকার করে উঠল বুমেদীন বিল্লাহ।

কামাল সুলাইমানরাও শুয়ে পড়েছিল ল্যান্ডিং ও পেছনের করিডোরে।

সিঁড়ি থেকে এক ঝাঁক গুলী এল উপর দিকে। গুলীগুলো বুমেদীনদের মাথার উপর দিয়ে গিয়ে পেছনের দেয়ালে আঘাত করতে লাগল।

বুমেদীন বিল্লাহ ও কামাল সুলাইমানরাও হাত বাড়িয়ে সিঁড়ি লক্ষ্যে গুলী চালাতে শুরু করেছে।

দুপক্ষই আন্দাজে গুলী করছে।

গুলী চলতেই থাকল।

আজর ওয়াইজম্যানের পলায়নরত লোকদের ধাওয়া করে দুতলায় উঠার সিঁড়ির গোড়ায় পৌছতেই শুনতে পেল সিঁড়িতে গোলাগুলীর শব্দ।

আহমদ মুসা থমকে দাঁড়াল। তার হাতে ষ্টেনগান। সে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনসকে দাঁড় করাল হাতের ইশারায়। বলল, 'সিঁড়িতে দুপক্ষের মধ্যে গুলী হচ্ছে। বুঝা যাচ্ছে একপক্ষ আজর ওয়াইজম্যানের লোকরা কিন্তু অন্যপক্ষে কারা গুলী গুলী ছুড়ছে?'

বিস্মিত হলো আহমদ মুসা।

এটা একটা নতুন পরিস্থিতি।

এ পর্যন্ত সময়টা তাদের ভালই গেছে।

আহমদ মুসাদের কোনই অসুবিধা হয়নি সাও তোরাহ দ্বীপের মিনি-সাবের ল্যান্ডিং পোর্ট খুঁজে পেতে।

সাও তোরাহর পশ্চিম প্রান্তের সেই জংগল ঢাকা খাড়ি দিয়ে যখন মিনি-সাব প্রবেশ করছিল, তখন আহমদ মুসা এ্যারনকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'ধন্যবাদ এ্যারন, সত্যিই এই খাড়িটা খুঁজে পেতে কয়েক ঘণ্টা নয় কয়েক দিন হয়তো লেগে যেত। তোমাকে মোবারকবাদ।'

এ্যারন আহমদ মুসাদের একজন হয়ে গিয়েছিল। সাও তোরার সাগরে মিনি-সাব আসার পর এ্যারন বলেছিল আহমদ মুসাকে, শুধু আপনাদের সাহায্য নয় আহমদ মুসা, আপনার ধর্মও আমি গ্রহণ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছি। আপনারা আমার চোখ খুলে দিয়েছেন। মনে হচ্ছে, এই প্রথম আমি প্রকৃত মানুষ দেখলাম, যারা মানুষকে ভালোবাসে এবং নীতিবোধকে সবার উর্ধে স্থান দেয়।

মিনি-সাব রাত দেড়টায় ল্যান্ড করেছিল পোর্টে। মিনি-সাবের কনট্রোল রুম অপারেট করছিল এ্যারন। তার পাশে হাসান তারিক ও আহমদ মুসা।

পোর্টে ল্যান্ড করার পর মিনি-সাবের গ্যাংওয়ে গিয়ে সেট হয়েছিল পোর্টেল প্রবেশ-দরজায়। বলে উঠেছিল এ্যারন, 'মি. আহমদ মুসা সান্তাসিমায় দরজা খুলেছিলেন ভেতর থেকে, কিন্তু এখানে খুলতে হবে বাইরে থেকে। মনে করুন আমি নেই, এখন কি করবেন দেখতে চাই।'

আহমদ মুসা বলেছিল, 'সেটা দরজার ডিজিট দেখে বলব। কিন্তু তার আগে বল, আমরা টিভি স্ক্রীনে ভেতরের মনিটরিং পাচ্ছি না, ওরা ভেতর থেকে আমাদের দেখছে কিনা?'

চিন্তার প্রকাশ ঘটেছিল এ্যারনের চোখে-মুখে। ভাবছিল সে। একটু পর আহমদ মুসার দিকে তাকিয়ে বলেছিল, 'ব্যাপারটা রহস্যজনক। মনে হচ্ছে, ভেতরে মনিটরিং-এর কাজটাই বন্ধ আছে। এই কারণে আমরা ভেতরের কিছু দেখতে পাচ্ছি না। আমরা ভেতরের কিছু দেখতে না পেলে তারাও আমাদের কিছু দেখতে পাবে না। কিন্তু এ রকম তো হবার কথা নয়। এখানকার সেন্ট্রাল কনট্রোল খুবই শক্তিশালী। চব্বিশ ঘণ্টা খোলা থাকে।'

'ব্যাপারটা অবশ্য চিন্তার। কিন্তু আপাতত আমাদের জন্যে ভাল হয়েছে। আমরা নিশ্চিন্তে মুভ করতে পারব।' বলেছিল আহমদ মুসা।

কথা শেষ করেই ইন্টারকমের বোতাম টিপে সোফিয়া সুসানকে লক্ষ্য করে বলেছিল, 'সুসান তুমি ও পলা প্রস্তুত হয়ে গ্যাংওয়ের মুখে যাও। হাসান তারিক মিনি-সাবের দায়িত্বে থাকবে। আমি ও এ্যারন আসছি।'

ইন্টারকম থেকে ঘুরে তাকিয়েছিল আহমদ মুসা এ্যারনের দিকে। বলেছিল, 'এ্যারন তুমি নিচে গিয়ে আর্মস ষ্টোর থেকে আমাদের চারজনের অস্ত্র বাছাই কর। আমি আসছি।'

সংগে সংগে এ্যারন বেরিয়ে গেল।

এ্যারন চলে গেলে হাসান তারিক বলেছিল, 'ভাইয়া আপনার সাথে আমি গেলে ভালো হতো না?'

'হতো, কিন্তু মিনি-সাব ও কনট্রোল রুমের দায়িত্ব কাকে দিয়ে যাব। এ্যারনকে এই পরিমাণ বিশ্বাসের সময় এখনও আসেনি, তাছাড়া যোগ্যতাও

পরীক্ষা করে দেখা হয়নি। এই দায়িত্বে সুসানদেরও রাখা যায় না। সবকিছুর পরেও তারা মেয়ে মানুষ।’

‘ঠিক আছে ভাইয়া। আপনার সিদ্ধান্তই ঠিক।’ বলেছিল হাসান তারিক।

‘ধন্যবাদ হাসান তারিক। মিনিট দশেক দেখবে। এর মধ্যে যদি মনিটরিং কাজ শুরু না করে, তাহলে তুমি সশস্ত্র হয়ে গ্যাংওয়ের মুখে এসে দাঁড়াবে। ওরা পালাতে চাইলে মিনি-সাব দখল করা ওদের জন্যে অপরিহার্য হয়ে দাঁড়াবে। মিনি-সাব রক্ষা করা আমাদের জন্যে অপরিহার্য।’

বলেই আহমদ মুসা নিচে নামার জন্যে বেরিয়ে এসেছিল কনট্রোল রুম থেকে।

আহমদ মুসা এ্যারনকে সাথে নিয়ে গ্যাংওয়ের মুখে পৌছে দেখে সোফিয়া সুসান ও পলা জোনস গ্যাংওয়ের মুখে দুপাশে দুজন অবস্থান নিয়েছে।

‘ধন্যবাদ সুসান ও পলা। তোমরা গোটা রাস্তা আমাদের কিচেন সামলিয়েছ, এখন বেরুতে হবে লড়াই-এর ময়দানে। তোমাদের একজন আমার বাম, অন্যজন ডান হাত।’ সুসান ও পলা দুজনকে লক্ষ্য করে বলেছিল আহমদ মুসা।

সোফিয়া সুসান আহমদ মুসাকে লক্ষ্য করে বলেছিল, ‘অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। আহমদ মুসা আমাদের দায়িত্ব দেয়ার যোগ্য মনে করেছেন, এটা আমাদের জন্যে গৌরবের, বিশেষ করে আহমদ মুসার কিচেনের দায়িত্ব পাওয়া অপরিসীম আনন্দের। তবে সামনের কথা ভাবার আগে আমি জানতে চাচ্ছি টিভি মনিটরিং ভেতরের অবস্থা সম্পর্কে কি বলছে?’

‘মনিটরিং ডেড সুসান।’ বলেছিল আহমদ মুসা।

‘তাহলে ভেতরটা আমাদের জন্যে অন্ধকার, তাই কি?’ বলেছিল সোফিয়া সুসান।

‘হ্যাঁ তাই।’ আহমদ মুসা বলেছিল।

‘তাহলে জনাব, আমাদের কমান্ডো তত্ত্ব মোতাবেক অগ্রসর হওয়ার ষ্ট্রাটেজী আমাদের পাল্টাতে হবে।’ বলেছিল সোফিয়া সুসান।

‘কি রকম?’ বলেছিল আহমদ মুসা।

‘একটা হবে অগ্রবাহিনী, আরেকটা হবে মূল বাহিনী। যেমন আমি হবো অগ্রবাহিনী, আর আপনি অন্যদের সাথে হবেন মূলবাহিনী।’ সুসান বলেছিল।

‘তারপর?’ বলেছিল আহমদ মুসা।

‘অগ্রবাহিনী পরিস্থিতির সৃষ্টি করবে, আপনি পরিস্থিতির মোকাবিলা করবেন।’ বলেছিল আহমদ মুসা।

‘কিন্তু অগ্রবাহিনী যদি আমি হই?’ বলেছিল আহমদ মুসা।

হেসে উঠেছিল সোফিয়া সুসান। বলেছিল, ‘মুলবাহিনী তাহলে কে হবে? আমি ও পলা মূল দায়িত্ব পালনের অযোগ্য। আমরা ঘটনা সৃষ্টি করতে পারি, ঘটনা সামাল দেয়ার সামর্থ আমাদের নেই। এটা আপনি পারেন।’

গম্ভীর হয়েছিল আহমদ মুসা। বলেছিল, ‘অন্ধকারের এক অনিশ্চয়তার মধ্যে তোমাকে সবার আগে ঠেলে দেব কেমন করে?’

‘একা এবং আগে তো যাচ্ছি না। আপনি তো পেছনে থাকছেনই। সৃষ্ট ঘটনার নিয়ন্ত্রণ তো আপনাকেই নিতে হবে।’ বলেছিল সুসান।

‘সেটা ঠিক আছে। কিন্তু গুলীর মুখে তো তোমাকেই প্রথম গিয়ে পড়তে হবে।’ আহমদ মুসা বলেছিল।

‘না জনাব, বরং আমিই প্রথম গুলীর সুযোগ পাব। কারণ আমি আগেই পরিকল্পনা করব, কিন্তু ওদের কোন পরিকল্পনা থাকবে না। আমাকে দেখার পর ওরা সিদ্ধান্ত নেবে। কিন্তু ততক্ষণে আমার এ্যাকশন শুরু হয়ে যাবে। এজন্যেই কমান্ডোরা ঝুঁকি নিলেও তারা সব সময় সুবিধাজনক অবস্থানে থাকে।’ বলেছিল সোফিয়া সুসান।

হেসেছিল আহমদ মুসা। তারপর বলেছিল, ‘তুমি মনে-প্রাণে একজন রিয়েল কমান্ডো সুসান।’

‘ধন্যবাদ। আহমদ মুসার এই সার্টিফিকেট আমার জীবনের সবচেয়ে গৌরবজনক সঞ্চয়।’ বলেছিল সুসান। তার চোখ-মুখ উজ্জ্বল হয়েছিল অভাবিত এক আনন্দে।

‘বুঝতে পারছি না, কমান্ডো হিসেবে তুমি শপথ নিয়েছ দেশ রক্ষার জন্যে। কিন্তু এখন তুমি ঝুঁকি নিচ্ছ কোন স্বার্থে?’

আবেগ জড়িত এক মিষ্টি হাসি ফুটে উঠেছিল সুসানের ঠোঁটে। বলেছিল, 'সত্য ও ন্যায় দেশের চেয়ে বড়। কিন্তু তার চেয়েও বড় জীবনবাজী রাখা সত্য ও ন্যায়ের সংগ্রামীরা। তাদের পাশে থাকার যে গৌরব, তার চেয়ে বড় স্বার্থ আর কি আছে?' আবেগে ভারী সুসানের কণ্ঠ।

'সুসান, আল্লাহ তোমার মঙ্গল করুন।' বলে আহমদ মুসা তাকায় এ্যারনের দিকে। বলেছিল, 'দরজা এবার খুলতে হয় এ্যারন।'

'লকটা ডিজিটাল, আপনি একটু দেখুন জনাব।' বলেছিল এ্যারন।

একটু হেসেছিল আহমদ মুসা। বলেছিল, 'বুঝেছি এ্যারন, তুমি আমার টেষ্ট নিতে চাও।'

'না জনাব, এটা আমার একটা কৌতূহল।' বলেছিল এ্যারন একটু হেসে।

আহমদ মুসা দরজার সামনে গিয়ে দাঁড়িয়েছিল। দেখেছিল, ডিজিটাল লকের প্রথমে চারটি ইংরেজী বর্ণ, তারপর আটটি জিরো অং ক। প্রথম চারটি বর্ণ হলো, 'FAST'।

হাসল আহমদ মুসা। তার মনে পড়ে গেল তার পকেটের দ্বিতীয় কোড স্লিপটার কথা, যা ডেভিড ডেনিমের গলায় পাওয়া খৃষ্টের মূর্তির মধ্যে থেকে জানা গেছে। সে বুঝেছিল প্রথম কোড স্লিপের মত প্রথম চারটি বর্ণ 'FAST' এরপর কোড স্লিপে যে আটটা অংক বসান আছে তা দরজার ডিজিটাল জিরো অংকের জায়গাগুলোতে বসালেই দরজা খুলে যাবে, যেমন খুলেছিল সান্তাসিমার গ্যাংওয়ে মুখের দরজা।

আহমদ মুসা পকেট থেকে কোড স্লিপটি বের করে এ্যারনের হাতে দিয়ে বলে, 'ডিজিটাল লকের জিরো অংকগুলোর স্থানে এই ক্রমিক নাম্বারগুলো বসালেই দিলেই দরজা খুলে যাবে।'

এ্যারন কোড স্লিপের উপর একবার নজর বুলিয়ে বলে ওঠে, 'ঠিক। কোথায় পেলেন এই কোড নাম্বার? কি করে বুঝলেন এই কোড নাম্বারটি এই ডিজিটাল লকের?'

'ডিজিটাল অংকগুলোর আগে চারটি ইংরেজী বর্ণ হলো FAST, যার অর্থ 'Freedom Army Sao Torah' এই অর্থ থেকেই বুঝেছি সাও তোরাহতে ঢুকতে বা সাও তোরাহর কোথাও এই কোড কাজে লাগবে।

এ্যারনের চোখ দুটি আনন্দে উজ্জ্বল হয়ে উঠে। বরে, 'ধন্যবাদ আপনাকে। আজর ওয়াইজম্যানদের সাথে লড়ার সামর্থ আপনাদেরই আছে।'

বলে এগিয়েছিল সে দরজার দিকে। লকের ডিজিটাল প্যানেলে নক করার আগে ঘুরে দাঁড়িয়ে বলেছিল, 'আপনারা রেডি তো? দরজা কিন্তু পূর্ব থেকে পশ্চিম দিকের দেয়ালে ঢুকে যাবে।'

আহমদ মুসা ও সুসান এ্যারনের দেয়া ঘাঁটির ড্রইং-এ আরো একবার চোখ বুলায়। তারপর সুসান গিয়ে দরজার পূব পাশে দরজা ঘেঁসে দাঁড়ায় এবং আহমদ মুসা দাঁড়ায় দরজার পশ্চিম পাশে। আহমদ মুসার পাশে এসে দাঁড়ায় পলা জোনস। তাদের সকলের হাতে খাটো ব্যারেলের মিনি ষ্টেনগান।

ডিজিটাল প্যানেলে নক সম্পূর্ণ করেই এ্যারন ছুটে একপাশে চলে যায়।

দরজা পূব দিক থেকে পশ্চিম দিকে সরে যেতে থাকে। দেহটা পার করার মত দরজায় একটা ফাঁক সৃষ্টি হতেই সুসান মাথাটা পায়ের কাছে মেঝেতে ছুড়ে দিয়ে দেহটাকে কুন্ডলি পাকিয়ে নিয়ে ফুটবলের মত গড়িয়ে ভেতরে ঢুকে পড়ে।

দরজা তখন পর্যন্ত অর্ধেকও উন্মুক্ত হয়নি। সুসানের দেহের কুন্ডলি যেখানে গিয়ে খুলে যায়, সেখান থেকে গোটা গেটরুম তার নজরে পড়ে। সে দেখতে পায় দরজার পূব পাশে চেয়ারে বসা দুজন প্রহরী দরজা খুলতে দেখেই উঠে দাঁড়িয়েছে। কিন্তু তাদের ষ্টেনগান তখনও কোন দিককেই লক্ষ্য করে ওঠেনি।

সুসান দেহটা সোজ করেই গুলী করেছিল প্রহরী দুজনকে লক্ষ্য করে। বৃষ্টির মত গুলীর মুখে পড়ে ওদের দেহ ঝাঁঝরা হয়ে চেয়ারের উপরই থেকে যায়।

গুলী করেই সুসান গড়িয়ে দ্রুত বিপরীত দিকের দরজায় চলে গিয়েছিল। দরজার পরেই ড্রইং রুম। ড্রইংরুমের ওপাশের দরজা দিয়ে একটা করিডোর দেখা যাচ্ছিল। এ্যারনের দেয়া নক্সা অনুসারে করিডোরটা উত্তর দিকে গিয়ে পূব দিকে ঘুরেছে। তারপর দক্ষিণ দিকে ঘুরে দক্ষিণের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত পৌছেছে। এই

ঘুরানো করিডোরের দুপ্রান্তে সারিবদ্ধ ঘর। এখানেই রক্ষীদের এবং অতিথিদেরও থাকার জায়গা।

সুসান উঠে দাঁড়িয়ে ছুটেছিল করিডোরের দিকে। করিডোর ধরে দৌড়ে পশ্চিম-উত্তর কোণে যখন সে পৌছে, তখন দেখতে পায় পশ্চিমমুখী করিডোর দিয়ে বেশ কয়জন ছুটে আসছে।

ষ্টেনগান তোলার তখন সময় ছিল না। সুসান চোখের পলকে কোণের কক্ষটায় ঢুকে গেল এবং বন্ধ করে দিল দরজা। রক্ষীরা এসে দরজা ভাঙার চেষ্টা শুরু করে দিল।

আহমদ মুসা ও পলা জোনস ড্রইং রুমের দরজার কাছে এসে গিয়েছিল। দরজায় ধাক্কানো লোকগুলো তাদের ষ্টেনগানের মুখে পড়ে যায়। এক সাথেই গর্জে উঠেছিল দুজনের ষ্টেনগান। সুসানের কক্ষের সামনে লাশের স্তুপ পড়ে যায়।

ধীরে ধীরে সামান্য একটু দরজা খুলে সুসান সামনে পূব দিক থেকে আসা কিছু পায়ের শব্দ শুনেই পুরোটা দরজা খুলেছিল সে উদ্যত ষ্টেনগান হাতে।

দরজা খুলেই ট্রিগার চেপে ধরে সে। ওরা আট দশজন এগিয়ে আসছিল। গুলীর ঝাঁক গিয়ে ঘিরে ধরে ওদের। পূবমুখী উত্তর করিডোরের মাঝখানে ওরা লাশ হয়ে পড়ে যায়।

সুসান ঘর থেকে বের হয়।

ছোটে উত্তর করিডোর ধরে পূব দিকে। আবার অনেকগুলো পায়ের শব্দ কানে আসে তার। পূব-উত্তর কোণে পৌছে দেখে দক্ষিণ দিক থেকে পূব করিডোর ধরে ছুটে আসছে আরও দশ বারোজন রক্ষী।

তার বাম পাশে কোণের উপর দক্ষিণমুখী দরজার কক্ষটি খোলা দেখে সুসান। সুসান মাথা নিচে চালিয়ে এ্যাক্রোবেটিক কৌশলে দেহটা উল্টিয়ে ঘরের মধ্যে ছিটকে পড়ে। মাটিতে পড়েই সে পা দিয়ে লাথি মেরে দরজা বন্ধ করে দেয়। প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এক ঝাঁক গুলী এসে লোহার দরজাটায় ঝাঁপিয়ে পড়ে। অজ¯্রর লাথিও পড়তে শুরু করে দরজার উপর।

আহমদ মুসা, পলা জোনস ও এ্যারন পশ্চিম দিকের করিডোর ধরে ছুটে এসে করিডোরের পশ্চিম-উত্তর কোণে তারা থমকে দাঁড়ায় উত্তর-পূর্ব কোণে

সুসানের দরজার সামনে দাঁড়ানো রক্ষীদের দেখে এবং ষ্টেনগানের ব্যারেল লক্ষ্যে স্থির করে ট্রিগার চেপে ধরে আহমদ মুসা ও পলা জোনস।

শেষ মুহূর্তে রক্ষীরাও টের পেয়ে গিয়েছিল আহমদ মুসাদের। ওদের কয়েকজন তাদের ষ্টেনগান ঘুরিয়ে নিচ্ছিল। কিন্তু তাদের ষ্টেনগানের ঘুরে আসার আগেই গুলীর ঝাঁক গিয়ে ঘিরে ধরল ওদের সবাইকে। লাশের আরেকটা স্তুপের সৃষ্টি হলো উত্তর-পূব কোণে।

গুলী করেই আহমদ মুসারা ছুট দিয়েছিল পূব দিকে। যখন তারা উত্তর-পুব কোণে পৌছে তখন সুসানও বেরিয়ে আসে।

'সুসান মনে হচ্ছে তুমি তোমার কমান্ডো ট্রেনিং-এর ডেমোনেষ্ট্রেশন দিচ্ছ। কিন্তু এটা তোমার কমান্ডো ট্রেনিং নয়। এভাবে ঝুঁকি নেয়া ঠিক নয়। এখন..........।'

আহমদ মুসার কথার মাঝখানেই হঠাৎ সুসানের ষ্টেনগান বিদ্যুত বেগে দক্ষিণ লক্ষ্যে উঠে আসে এবং শুরু করে গুলী বৃষ্টি।

কথা বন্ধ করে আহমদ মুসা তাকায় পুবের করিডোর দিয়ে দক্ষিণ দিকে। দেখে করিডোরের দক্ষিণ প্রান্তে দুজন রক্ষী মাটিতে পড়ে কাতরাচ্ছে। আর অবশিষ্টরা দৌড়ে পশ্চিম দিকে আড়াল হয়ে গেল।

'ওখানেই দুতলা তিন তলায় উঠার সিঁড়ি মি. আহমদ মুসা।' বলছিল এ্যারন।

'চল সবাই।' বলে ছুটা শুরু করে দিয়েছিল আহমদ মুসা দক্ষিণে উপরে উঠার সিঁড়ির দিকে।

তারা পুব-দক্ষিণ কোণে পৌছে পশ্চিমে সিঁড়ির দিকে উঁকি দিয়েছিল। সংগে সংগে সিঁড়ির গোড়া থেকে ছুটে আসে গুলীর ঝাঁক।

সরে আসে আহমদ মুসারা।

তারপর তারা আড়ালে দাঁড়িয়ে তাদের চারটি ষ্টেনগানের ব্যারেল পশ্চিম দিকে বাড়িয়ে দিয়ে সিঁড়ি লক্ষ্য করে গুলী বৃষ্টি শুরু করে।

গুলী করতে করতেই তারা বেরিয়ে আসে আড়াল থেকে সিঁড়ির মুখে।

ওদিক থেকে কোন পাল্টা গুলী আর আসে না।

আহমদ মুসারা গুলী অব্যাহত রেখেই সিঁড়ির গোড়ায় নিরাপদ অবস্থানে চলে যায়।

আহমদ মুসারা তখন গুলী বন্ধ করে ইঞ্চি ইঞ্চি করে এগুচ্ছিল সিঁড়ির দিকে ওদেরকে প্রত্যক্ষ টার্গেটে আনার জন্যে। এই সময়ই সিঁড়ি ও সিঁড়ির উপর এলাকায় দুপক্ষের মধ্যে গোলা-গুলী শুরু হয়ে যায়।

কিছু অপেক্ষার পর আহমদ মুসা যখন নিশ্চিত বুঝল ঐ দুপক্ষের এক পক্ষ আজর ওয়াইজম্যান বিপক্ষে, তখন ধরে নিল, ওদিকে আজর ওয়াইজম্যানের বিরোধী যারা, তারা আহমদ মুসাদের মিত্র। তাদের দুপক্ষের উদ্দেশ্য আজর ওয়াইজম্যানদের লোকদের পরাজিত করা। হতে পারে ঐ পক্ষ বন্দীদের পক্ষে এবং আজর ওয়াইজম্যানের লোকদের আক্রান্ত হতে দেখে তারা কাজ শুরু করেছে।

আহমদ মুসা নির্দেশ দিল সুসানদের আক্রমণ শুরু করার জন্যে।

সিঁড়ির গোড়ায় আড়াল থেকে আহমদ মুসারা গুলী বর্ষণ শুরু করে দিল।

সিঁড়িতে লুকাবার কোন জায়গা ছিল না। অল্পক্ষণ পরেই সিঁড়ি থেকে ষ্টেনগানের আওয়াজ বন্ধ হয়ে গেল। উপর থেকে রিভলবারের আওয়াজও আর শোনা গেল না।

আহমদ মুসা গুলী বন্ধ করে সিঁড়ির গোড়ায় গিয়ে দাঁড়াল এবং চিৎকার করে বলে উঠল, 'সিঁড়িতে আজর ওয়াইজম্যানের কেউ বেঁচে নেই। উপরে কারা.........।'

আহমদ মুসার কথা শেষ হবার আগেই সিঁড়ির মুখে এসে দাঁড়াল বুমেদীন বিল্লাহ। চিৎকার করে উঠল, 'আহমদ মুসা ভাই, থ্যাংকস গড। তাড়াতাড়ি আসুন। আজর ওয়াইজম্যানের হেলিকপ্টার উড়ার কাজ শুরু করেছে। তাড়াতাড়ি আসুন।'

আহমদ মুসা বুমেদীন বিল্লাহকে সালাম দিয়ে বলল, 'আসছি বিল্লাহ।'

বলে দ্রুত সিঁড়ি ভেঙে উপরে উঠতে শুরু করল।

দুতলার ল্যান্ডিং-এ উঠে আসতেই বুমেদীন বিল্লাহ জড়িয়ে ধরল আহমদ মুসাকে।

আহমদ মুসার সাথে সুসানরাও উঠে এসেছিল।

‘চল বিল্লাহ, আজর ওয়াইজম্যানরা কোথায়?’

‘চলুন।’ বলে দুতলার চলন্ত সিঁড়ির দিকে দৌড়াতে শুরু করল বুমেদীন বিল্লাহ। তার পেছনে ছুটল আহমদ মুসা এবং অন্যান্য সবাই।

যখন তারা ছাদে উঠল দেখল আজর ওয়াইজম্যানের হেলিকপ্টার অনেক খানি উপরে উঠে গেছে।

হেলিকপ্টার থেকে একটা আলোর ফ্লাশ ঘুরে গেল আহমদ মুসাদের উপর দিয়ে। একটা উচ্চহাসির আওয়াজ ভেসে এল উপর থেকে। তার সাথে একটা উচ্চ কণ্ঠ, ‘আমার শূন্য ঘাঁটিতে জিরো কামাল সুলাইমানদের নিয়ে পরাজয়ের মহোৎসব করো। বিজয় আমার পকেটে। স্পুটনিকের দলিলগুলো নিয়ে গেলাম।’

কথা শেষ হলো।

কথা শেষ হবার সাথে সাথে আবার সেই উচ্চ হাসির শব্দ।

হেলিকপ্টার ধীরে ধীরে মিলিয়ে গেল আকাশের অন্ধকারে।

৭

সাও তোরাহ।

আজর ওয়াইজম্যানের অফিস কক্ষের পাশের বিশাল হল ঘর।

সত্যিই আনন্দের মহোৎসব চলছে।

চলছে মুক্ত আলোচনা। নানা কথা-বার্তা।

আহমদ মুসার ডান পাশে বসেছে হাসান তারিক। তারপর সুসানরা। আর বাঁ পাশে কামাল সুলাইমান ও তার ছয় সাথী। আহমদ মুসার সামনে মেঝেতে বসেছে বুমেদীন বিল্লাহ।

কথার এক পর্যায়ে কামাল সুলাইমান আহমদ মুসাকে বলল, 'জনাব, আমরা বিল্লাহর কাছে সব শুনেছি। পরের কাহিনী আপনার কাছে শুনলাম। আমরা আমাদের জাতি কৃতজ্ঞ আপনার কাছে।' আবেগে বাকরুদ্ধ হয়ে পড়েছিল কামাল সুলাইমানের কণ্ঠ।

আহমদ মুসা কামাল সুলাইমানের কথার কোন জবাব না দিয়ে কামাল সুলাইমান, ওসমান আবদুল হামিদসহ ওদের সাতজনের দিকে তাকিয়ে বলল, 'আপনাদের সাতজনের সম্মেলন আমাকে খুব আনন্দ দিয়েছে। মনে হয়েছে ইতিহাসের কামাল আতাতুর্ক, খলিফা দ্বিতীয় আবদুল হামিদ, মিসরের বাদশাহ ফারুক, লিবিয়ার বাদশাহ ইদরিস, ইন্দোনেশিয়ার আহমদ সুকর্ণ, পারস্যের রেজা শাহ পাহলবী প্রমুখ যেন পুনরায় ফিরে এসে অতীত থেকে শিক্ষা নিয়ে মুসলমানদের বর্তমানকে রক্ষার জন্যে ঐক্যবদ্ধ হয়েছেন।'

'কিন্তু আমরা পারলাম না জনাব। আমরা চেয়েছিলাম মুসলমানদের সন্ত্রাসী সাজানোর যে ষড়যন্ত্র তার মুখোশ খুলে ফেলতে। কিন্তু পারলাম না। যে ডকুমেন্টগুলো সংগ্রহ করেছিলাম আজর ওয়াইজম্যানরা তা পুরিয়ে ফেলেছে। একটা অংশ আমরা ব্যাংকের ভল্টে সরিয়ে রেখেছিলাম, সেটাও আজর

ওয়াইজম্যান আজ নিয়ে গেল। বুমেদীন বিল্লাহ আমাদের বাঁচিয়েছে, কিন্তু মেরেছে জাতিকে।'

হাসল আহমদ মুসা। বলল, 'না, মি. সুলাইমান। আজর ওয়াইজম্যান যে দলিলগুলো নিয়ে গেছে, সেটা একটা ডুপ্লিকেট অংশ। পূর্ণ কপিটা ম্যাডাম সুলাইমান অন্য একটি ব্যাংকে তার ভল্টে রেখেছেন।'

কামাল সুলাইমানসহ সাতজনই অপার বিস্ময় নিয়ে তাকাল আহমদ মুসার দিকে।

'আপনারা ধন্যবাদ দিন বিল্লাহকে। সে কিছু ডুপ্লিকেট কপি আজর ওয়াইজম্যানের হাতে তুলে দিয়ে সবাইকে বাঁচাবার একটা পথ বের করেছিল।' বলল আহমদ মুসা সাতজনকে লক্ষ্য করে।

'ধন্যবাদের পালা থাক। আজর ওয়াইজম্যান যে বিজয় পকেটে নিয়ে চ্যালেঞ্জ দিয়ে গেল, সে চ্যালেঞ্জের কি হবে?' বুমেদীন বিল্লাহ বলল।

বুমেদীন বিল্লাহর কথার উত্তরে কেউ কথা বলল না। সবাই চুপচাপ।

আহমদ মুসার ঠোঁটের কোণে এক টুকরো হাসি।

নিরবতা যখন খুবই বেসুরো হয়ে উঠল, তখন আহমদ মুসা মুখ খুলল। ধীরে ধীরে বলতে শুরু করল, 'আজর ওয়াইজম্যানের এই চ্যালেঞ্জ অনেক আগেই গ্রহণ করা হয়েছে। অপেক্ষা ছিল সাও তোরাহ থেকে কামাল সুলাইমানদের উদ্ধারের। এখন এদিকের কাজ শেষ। এখন আমি যাব রাজধানী পন্টে দিগায়। সেখান থেকে আমেরিকা।'

আহমদ মুসা একটু থামল। সোফায় সোজা হয়ে বসল। বলতে শুরু করল আবার, 'ম্যাডাম সুলাইমানকে ধন্যবাদ। তিনি স্পুটনিকের দলিলগুলোর ডুপ্লিকেট সেই সময়ই আমাকে দিয়েছিলেন। আমি পড়েছি দলিলগুলো। দলিলগুলো আসামীকে চিহ্নিত করেছে। কিন্তু বিচারের জন্যে প্রমাণ হাজির করেনি। এই কাজটাই এখন করতে হবে। বিশ বছর আগে টুইন টাওয়ার ধ্বংস হয়। কিন্তু এই ধ্বংসের ষড়যন্ত্র শুরু হয় বাইশ বছর আগে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের এক শহরে। ষড়যন্ত্রের যাত্রা যেখান থেকে শুরু, সেখান থেকেই সেই ধ্বংস টাওয়ারের নতুন কাহিনী তৈরীর যাত্রা শুরু করতে হবে।'

থামল আহমদ মুসা।

পিন পতন নিরবতা ঘরে। সবার দৃষ্টি আহমদ মুসার দিকে।

হাসান তারিক ও কামাল সুলাইমানদের মুখে আনন্দ। অন্যদের চোখে বিস্ময়।

পলা জোন্সের চোখে বেদনা।

সোফিয়া সুসানের চোখে উদ্বেগ।

নিরবতা ভাঙল কামাল সুলাইমান। বলল, ‘নতুন কাহিনী তৈরীর যাত্রায় আমরাও সাথী।’

হাসল আহমদ মুসা। বলল, ‘অবশ্যই। কিন্তু তার আগে স্পুটনিকের যাত্রা আবার শুরু কর।’

‘সন্ত্রাস বিরোধী সাংবাদিক হিসাবে আমি সফল। সুতরাং নতুন অভিযানে আমি আছি।’

‘সাও তোরাহ ঘটনার রিপোর্ট কেমন লেখ, সেটা দেখার পরই তুমি ছাড়পত্র পাবে।’ হেসে বলল আহমদ মুসা।

আহমদ মুসার কথা শেষ হতেই এ্যারন বলে উঠল, ‘পাশের ঘরে খাবার প্রস্তুত। আপনাদের সকলকে আমন্ত্রণ জানানো হচ্ছে।’

আহমদ মুসা উঠে দাঁড়াল।

সবাই উঠল।

পাশের ঘরের দিকে হাঁটা শুরু করে আহমদ মুসা হাসান তারিককে বলল, ‘গোটা ঘাঁটির সার্চ ঠিকমত হয়েছে তো? পুলিশ প্রধানের সাথে আলোচনা করেছি। পুলিশ আসছে। আমাদের সব কাজ তার আগেই শেষ করতে হবে।’

‘হ্যাঁ ভাইয়া। কামাল সুলাইমানদের সাথে আমিও সর্বক্ষণ ছিলাম। এখানে পাওয়া তথ্যগুলো নিয়ে খাবার পরেই আলোচনায় বসব।’ বলল হাসান তারিক।

আহমদ মুসা খাবার নিয়ে বসল এক কোণের এক টেবিলে।

সোফিয়া সুসান খাবার নিয়ে এসে আহমদ মুসার সামনে বসল।

আহমদ মুসা খাবার খাওয়া শুরু করেছে।

সোফিয়া সুসান মুখ নিচু করে বসে আছে। তার মুখ ভারী।

'খাও সুসান।' তাকিদ দিল আহমদ মুসা।

'আমি কমান্ডো ট্রেনিং-এর ডেমোনেস্ট্রেশন আর কখনও কোথাও দেব না। আমাকে আপনি সাথে নেবেন।' কণ্ঠে তার কান্নার সুর।

দুচোখ থেকে তার দুফোটা অশ্রু গড়িয়ে পড়ল।

'পাগল! তোমার চাকুরীও তো আছে।' বলল আহমদ মুসা। মুখে তার এক টুকরো হাসি।

'আহত হবার পর আমি ছয় মাসের ছুটি নিয়েছি। আমি..............।' কথা শেষ করতে পারলো না সুসান। ধীরে ধীরে তাদের টেবিলে এল শেখুল ইসলাম আহমদ মুহাম্মাদ। সে অসুস্থ।

শেখুল ইসলামকে স্বাগত জানাল আহমদ মুসা।

চোখ মুছল সোফিয়া সুসান।

পরবর্তী বই

ধ্বংস টাওয়ার

কৃতজ্ঞতায়ঃ Mahfuzur Rahman